বাছাই চর্যাপদ

২০১৭

নিভৃতে বেড়ে ওঠা, সেভাবেই পাঁচ পেরিয়ে যাওয়া। একান্ত নীরবে নিজের মত বেঁচে থাকা। আসলে এই পৃথিবীতে প্রত্যেকের কাজই নির্দিষ্ট। প্রখর গ্রীষ্মে শ্রান্ত পথিকের চাহিদা বটগাছের স্নিগ্ধ শীতল ছায়া অথচ পূজার পুষ্পপাত্রে দূর্বাঘাসই একমাত্র স্থানলাভ করার অধিকারী। ঠিক সেইরকমই প্রকৃতিতে আলোকদানের একচ্ছত্র অধিকারী সূর্য কিংবা চন্দ্র হলেও তাদের অবশ্যম্ভাবী অনুপস্থিতিতে মাটির প্রদীপই কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে। আমাদের চর্যাপদ ঠিক একইভাবে মাটির প্রদীপের অনুসারী। এই গ্রহে বাংলাভাষা চর্চা করেন এমন মানুষ অসংখ্য। তার মাঝে চলতে থাকে আমাদেরও চর্চা, অমাবস্যায় সূর্যাস্তের পরে চন্দ্রবিহীন রাত যখন ঘোর অন্ধকারে তখন এই ছোট্ট মাটির প্রদীপ একরত্তি 'চর্যাপদ' কিছুটা হলেও আলো দেখাবে আমাদের এটাই আশা।

২০১৭ সালের সেরা তিরিশটি লেখা সাজানো রইল এবারের বাছাই চর্যাপদে...

সূচীপত্র

কবিতা

নাইটস্কোপ	নবকলম	১৪
সেই ভীতু লোকটা	তৃতীয় পাণ্ডব	২৫
বিহঙ্গ, ওরে	শুভময় দাস	৩৬
ছুটকথা	নবকলম	৪৯
বেঁচে থেকে	দেবীস্মিতা দেব	১১২
শয়েক থেকেই কয়েক কথা	নবকলম	১৬৯
ক্ষত-কথা	শুভঙ্কর দাস	১৯৬

প্রবন্ধ

অন্ধকারের রাজত্ব	অতনু	৬
আবোল তাবোল মূর্খামি	হস্তিমূর্খ	২৭
বিদায় নেওয়া ও মুচকি হাসি	সৌরদীপ	১৭১
প্রযুক্তি ও তার ভবিষ্যৎ	সোহম	১৮৮

গল্প

ছোট গল্প	উজান মুখোপাধ্যায়	১২
জন্মদিন	দৃপ্ত বর্মন রায়	৩০
মিমিক্রি	যদুবাবু	৪৩
ঝরাপাতার কথা	সুব্রত চৌধুরী	৬০
দ্রোণাচার্য্য	তিয়াসা চ্যাটার্জি	৬৩
উপস্থিতি	তৃতীয় পাণ্ডব	১১৪
সময়টা চারটে চল্লিশ	দীপ্তজিৎ মিশ্র	১৫৬
মার্শাল ভুতো	দৃপ্ত বর্মন রায়	১৭৪
রসগোল্লা	সুব্রত চৌধুরী	২০৪

মুক্তগদ্য

গভীর রাতের ডায়েরি	উত্তরায়ন	১৮
নিকোনো উঠোনে ঝরে রোদ	যদুবাবু	৩২
র‍্যান্ডম দুঃখবিলাসিতা	শাক্যমুনি	৬২
ফেলুদার সাথে	অতনু	১৯৮

রম্যরচনা

রাঙিয়ে দিয়ে যাও	যদুবাবু	২০
আমার ইতিহাসশিক্ষা	হস্তিমূর্খ	৫২
কলকাতা-১০৩	যদুবাবু	১৬৪
হালখাতা	হযবরল	২০৭

ভ্রমণ

পাহাড়ের ডায়েরি	অতনু, বব, অনির্বাণ, পল্লব, শ্রীরূপা	১১৭

রান্নাবান্না

দিদার দুই রেসিপি	শ্রীরূপা	৩৯

অন্ধকারের রাজত্ব

অতনু

জানুয়ারী ৮, ২০১৭

কবি বলেছিলেন, *"বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি?"* প্রশ্নটা কোন জ্যোতির্বিদকে করা হলে তিনি জবাব দেবেন, "শতকরা পাঁচ ভাগ মাত্র"। তাঁর কাছে অবশ্য পৃথিবী মানে এই শস্য শ্যামলা বসুন্ধরা নয়; গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা, ছায়াপথ সম্বলিত এই বিপুল মহাবিশ্বই তাঁর জগৎ। সে যাই হোক, এই গভীর দার্শনিক প্রশ্নের জবাবে এমন নীরস গাণিতিক উত্তর নিশ্চয়ই কবির পছন্দ হবে না! যদিও তাঁর প্রশ্নের মধ্যেই স্পষ্ট নেতিবাচক উত্তর, কিন্তু একেবারে হিসেব কষে বলে দেওয়া পাঁচ ভাগ জানি আর পঁচানব্বই ভাগ জানি না! এটা কি বাড়াবাড়ি হয়ে গেল না? এ প্রশ্নের উত্তর পেতে ঘুরে আসা যাক ষাটের দশকের আমেরিকায়, ওয়াশিংটন ডিসির কার্নেগি ইনস্টিটিউশানে। সেখানে তখন বিভিন্ন ছায়াপথের মধ্যে তারাদের গতিবিধি নিয়ে গবেষণা করছেন এক তরুণী, ভেরা রুবিন।

ছোটবেলায় রুবিনকে জানলা দিয়ে হাঁ করে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে দেখে পেশায় ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ার পিতা আনন্দ যেমন পেতেন তেমনি মাথায় চিন্তাও ঘুরত, মেয়েদের পক্ষে কি মহাকাশ নিয়ে পড়াশোনা করা সম্ভব! সংশয় সত্ত্বেও তিনি মেয়েকে একটা দূরবীন বানিয়ে দিয়েছিলেন এবং শখের জ্যোতির্বিদদের সম্মেলনে নিয়ে গেছিলেন। তাই রুবিনের পিতার মনোভাবকে দোষ দিলে আমরা ভুল করব যখন দেখব স্কুলের পাঠ শেষ করে রুবিন প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের দরজায় গিয়ে দাঁড়ালে সে দরজা এই কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে যে "প্রিন্সটনে জ্যোতির্বিজ্ঞান পড়ার জন্য মেয়েদের নেওয়া হয় না!" এই নিয়ম প্রিন্সটনে ১৯৭৫ সাল অবধি চালু ছিল! শেষ অবধি রুবিন কর্ণেল ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হলেন এবং সেখান থেকে স্নাতক হয়ে জর্জ গ্যামোর অধীনে গবেষণা শুরু করলেন। পিএইচডি করে তিনি কার্নেগি ইনস্টিটিউশানে গিয়ে জুটি বাঁধলেন আরেক জ্যোতির্বিদ কেন্ট ফোর্ডের সঙ্গে। ফোর্ড তখন মহাকাশের কাণ্ডকারখানা দেখার জন্য অতি সূক্ষ্ম স্পেক্ট্রোমিটার (যা দিয়ে আলোর বর্ণালী বিশ্লেষণ করা হয়) তৈরীর কাজে ব্যস্ত।

গ্যালাক্সি বা ছায়াপথ ছায়াপথ তৈরী হয় অজস্র গ্রহ, নক্ষত্র, নক্ষত্রের মৃতদেহ, মহাজাগতিক ধুলো ইত্যাদি নিয়ে। এক একটা ছায়াপথে কয়েকশো কোটি থেকে কয়েক লক্ষ কোটি নক্ষত্র থাকে! ছায়াপথ গুলো সাধারণত চাকতি বা সর্পিল আকৃতির হয়। মধ্যাকর্ষণ টানের কারণে বেশীরভাগ তারা কেন্দ্রের দিকে থাকে, বাইরের দিকে নক্ষত্রের সংখ্যা অনেক কম। সৌরজগতে যেমন সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহগুলো প্রদক্ষিণ করে, ছায়াপথের কেন্দ্রের চারদিকে ঠিক তেমনি ভাবে নক্ষত্র গুলো সপরিবারে পরিক্রমণ করে। সৌরজগতের ক্ষেত্রে আমরা দেখি গ্রহগুলো সূর্য থেকে যত দূরে রয়েছে, তারা তত আস্তে ঘুরছে। যেমন সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ হল বুধ। একবার সূর্যকে পাক খেতে বুধের সময় লাগে পৃথিবীর হিসেবে মাত্র ৮৮ দিন। অন্যদিকে সবচেয়ে দূরের গ্রহ প্লুটো, যাকে এখন বামন গ্রহ তকমা দেওয়া হয়েছে, সূর্য কে পাক খেতে ৯০ হাজার দিন লাগিয়ে দেয়। আর পৃথিবী বুধের তুলনায় দূরে কিন্তু প্লুটোর তুলনায় সূর্যের কাছে। তাই পৃথিবীর ১ বছর হয় ৩৬৫ দিনে। পরিক্রমণ বেগের দিকে তাকালে দেখবো যে বুধ, পৃথিবী ও প্লুটোর বেগ যথাক্রমে সেকেন্ডে ৪৭.৪, ২৯.৮ ও ৪.৭ কিলোমিটার। যেহেতু সৌরজগতে গ্রহসমূহের গতি এবং ছায়াপথে নক্ষত্রসমূহের গতি পরিচালিত হচ্ছে একই নিয়ম, অর্থাৎ ভারী কেন্দ্রীয় অঞ্চলের মহাকর্ষীয় টানের কারণে, তাই ছায়াপথেও যত কেন্দ্র থেকে বাইরের দিকে যাওয়া যাবে তত নক্ষত্রগুলোর বেগ কমতে থাকা উচিৎ।

কিন্তু রুবিন ও ফোর্ড একটা অদ্ভুত ঘটনা দেখলেন। যতই ছায়াপথের কেন্দ্র ছেড়ে সীমানার দিকে যাওয়া হোক, নক্ষত্রগুলোর পরিক্রমণ বেগ প্রায় একই থেকে যাচ্ছে। ষাটটি পেঁচাল ছায়াপথকে তাঁরা পর্যবেক্ষণ করেন এবং প্রতিটার ক্ষেত্রেই একই ফলাফল মেলে অর্থাৎ কেন্দ্র থেকে দূরত্বের সঙ্গে নক্ষত্রদের পরিক্রমণ বেগের কোন পরিবর্তন নেই। এটা ঘটতে পারে যদি ছায়াপথের ভর কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সন্নিবিষ্ট না হয়ে গোটা ছায়াপথ জুড়ে বিস্তৃত থাকে। কিন্তু এই ভর আমাদের চেনাজানা কোন পদার্থের হতে পারে না, তা যদি হত তাহলে তো তাদের দেখাই যেত! এই অজানা ভরের নাম দেওয়া হল ডার্ক ম্যাটার। নক্ষত্রদের পরিক্রমণ বেগের হিসেব করে রুবিন ও ফোর্ড দেখলেন একটা গ্যালাক্সির মোট ভরের প্রায় নব্বই শতাংশই হল এই ডার্ক ম্যাটার। মাত্র দশ শতাংশ ভর আমাদের পরিচিত প্রোটন, নিউট্রন ইত্যাদি দিয়ে তৈরী।

ডার্ক ম্যাটারের কথা যে রুবিন রা-ই প্রথম বলেছিলেন তা নয়। তিরিশের দশকে ডাচ বিজ্ঞানী জন ওর্ট, যাঁকে ইউরোপিয়ান স্পেস এজেন্সি "বিংশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ জ্যোতির্বিদ" বলে আখ্যায়িত করেছে, আকাশগঙ্গা ছায়াপথে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব শনাক্ত করেন। আকাশগঙ্গা ছায়াপথ নিয়ে গবেষণায় পথিকৃত ছিলেন ওর্ট। তাঁর অন্যতম অবদান আকাশগঙ্গা ছায়াপথে সৌরমণ্ডলের অবস্থান চিহ্নিত করা। এদিক দিয়ে তাঁকে আধুনিক কোপারনিকাস বলা যেতে পারে। কোপারনিকাস যেমন দেখিয়েছিলেন আমাদের পৃথিবী আদৌ সৌরজগতের কেন্দ্রে নেই, ওর্ট তেমনি প্রচলিত মত খারিজ করে দেখালেন গ্রহমণ্ডলী সমেত সূর্যের অবস্থান আকাশগঙ্গা ছায়াপথের কেন্দ্রে নয়, কেন্দ্র থেকে তিরিশ হাজার আলোকবর্ষ দূরে একটি অপাংক্তেয় জায়গায়! ওর্ট যখন নেদারল্যান্ডের লেইডেন ইউনিভার্সিটিতে আকাশগঙ্গা নিয়ে গবেষণা করছেন তখন আটলান্টিকের ওপারে ক্যালিফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজিতে দাপট দেখাচ্ছিলেন এক বদরাগী ও তক্কবাজ সুইস জ্যোতির্বিদ ফ্রিৎজ জুইকি। সহকর্মীরা তাঁকে বলত স্ফেরিকাল

বাস্টার্ড! স্ফিয়ার অর্থাৎ একটা নিটোল গোলককে যেদিক থেকেই দেখি না কেন একইরকম দেখাবে, তেমনি জুইকি কে যেভাবেই দেখা হোক না কেন তিনি না কি একজন বাস্টার্ড! তো এই জুইকি কাজ করছিলেন কোমা ক্লাস্টার নিয়ে। অজস্র তারা নিয়ে যেমন গ্যালাক্সি তেমনি অজস্র গ্যাল্যাক্সি নিয়ে ক্লাস্টার। ক্লাস্টারের মধ্যে গ্যালাক্সি গুলো একই রকম ভাবে পাক খাচ্ছে। জুইকি দেখলেন ক্লাস্টারের বাইরের দিকের গ্যালাক্সিগুলো এত জোরে ছুটছে যেন এক্ষুণি ছিটকে বেরিয়ে যাবে, কিন্তু কোন অদৃশ্য টান তাদের ক্লাস্টারের মধ্যে ধরে রেখেছে। আমরা যদি একটা পাথরকে একটা সুতোর একপ্রান্তে বেঁধে অন্য প্রান্তটা হাতে নিয়ে বনবন করে ঘোরাই তাহলে বাইরের দিকে একটা টান অনুভব করব। সুতোটা পোক্ত না হলে ছিঁড়ে গিয়ে পাথরটা ছিটকে বেরিয়ে যাবে। সেরকমই ব্যাপার। জুইকি এটাও দেখালেন, যে অদৃশ্য ভর এই টান যোগাচ্ছে, তার অনুপাত ক্লাস্টারের মোট ভরের ৯০ শতাংশ! মাত্র ১০ শতাংশ হল দৃশ্যমান ভর।

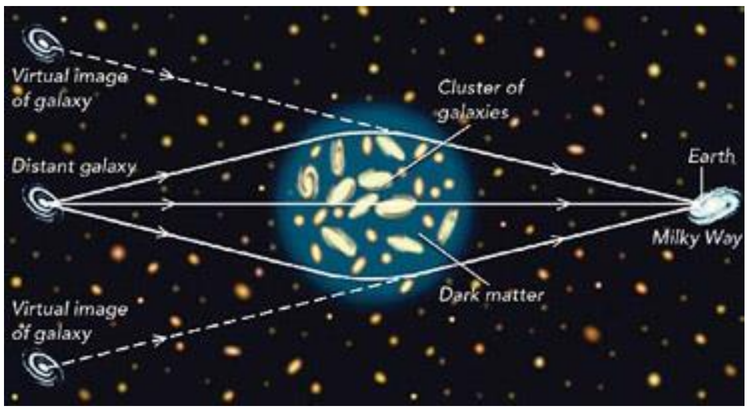

ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ত্বের পক্ষে আরেকটা বড় প্রমাণ পাওয়া গেছে মহাকর্ষীয় লেন্স থেকে। আমরা স্কুলের বইতেই পড়েছি আলো সরলরেখায় চলে। কিন্তু চলার মাধ্যম পরিবর্তন হলে আলোকরশ্মি দিক পরিবর্তন করে। এই ঘটনাকে বলা হয় প্রতিসরণ এবং এটাকে কাজে লাগিয়েই লেন্স তৈরী হয়। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে জানা গেছিল আলোকরশ্মি কোন ভারী বস্তুর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময়ও বেঁকে যায়। ধরা যাক কোন আলোক উৎস (যেমন একটা নক্ষত্র বা গ্যালাক্সি) আর আমাদের চোখের মাঝে তেমন কোন একটা ভারী মহাজাগতিক বস্তু এসে পড়ল। তখন আমরা সরাসরি নক্ষত্র বা গ্যালাক্সিটা কে না দেখে তাদের এক বা একাধিক বিকৃত প্রতিবিম্ব দেখব। এটাই হল মহাকর্ষীয় লেন্স। এখন ঐ মহাজাগতিক বস্তুটি যদি ডার্ক ম্যাটার দিয়ে তৈরী হয় তবে তাকে দেখা যাবে না বটে কিন্তু ভরের জন্য সে যে লেন্স তৈরী করবে তার ফলে অন্য উজ্জ্বল নক্ষত্র বা গ্যালাক্সির প্রতিবিম্ব দেখা যাবে। এইরকম অনেক ডার্ক ম্যাটার দিয়ে তৈরী মহাকর্ষীয় লেন্সের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ত্ব যখন সন্দেহাতীত তখন পরের প্রশ্ন হল এর চরিত্র আসলে কি? এই প্রশ্নের উত্তর এখনো পাওয়া না গেলেও এটা নিশ্চিত এরা অন্যান্য সাধারণ পদার্থের সঙ্গে মেলামেশা করে খুব কম। যে মানুষ সবার সঙ্গে মেলামেশা করে তার নাড়ি নক্ষত্র জানা সহজ। কিন্তু যে চুপচাপ একলা থাকে তাকে বোঝা ভারী কঠিন। বস্তুজগতের বেলাতেও একই নিয়ম খাটে। বস্তুজগতে মেলামেশার উপায় হল চার ধরণের বল – মহাকর্ষ (যার জন্য পৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে, আপেল মাটিতে পড়ে), তড়িৎচুম্বকীয় (যার কারণে ইলেকট্রন নিউক্লিয়াসের বাঁধনে আটকা পড়ে

পরমাণু তৈরী করে, আমরা চোখে দেখি, রেডিও টিভি থেকে শুরু করে ফোন, এসএমএস, ইন্টারনেট এ বার্তা পাঠানো যায়), দৃঢ় (যা পরমাণুর নিউক্লিয়াসে প্রোটন ও নিউট্রনকে আটকে রাখে, পরমাণু শক্তি থেকে বিদ্যুৎ বা বোমা বানানো যায়) এবং মৃদু (যা তেজস্ক্রিয়তার জন্য দায়ী)। এর মধ্যে ডার্ক ম্যাটারের অস্তিত্ব জানা গেছে সাধারণ পদার্থের সাথে মহাকর্ষীয় আকর্ষণের কারণে। নক্ষত্র গুলোতে যে অবিরাম নিউক্লিয় সংযোজন বিক্রিয়া নক্ষত্রের জ্বালানী জোগায়, তা ডার্ক ম্যাটারে ঘটে না। ঘটলে তারা অদৃশ্য থাকত না। এখন নক্ষত্রের জ্বালানী ফুরিয়ে গেলে তারা নিজের মহাকর্ষের টানে চুপসে গিয়ে শ্বেত বামন, নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাক হোলে পরিণত হয়। এই জাতীয় নক্ষত্রের মৃতদেহগুলো সম্ভাব্য ডার্ক ম্যাটার হতে পারে। সেক্ষেত্রে ডার্ক ম্যাটারের উপাদান আমাদের চেনা জানা নিউট্রন, প্রোটনই হতে পারে। কিন্তু বিভিন্ন মহাজাগতিক পর্যবেক্ষণ বলছে এই মহাবিশ্বে ডার্ক ম্যাটারের মোট পরিমাণের মধ্যে এই জাতীয় তারার মৃতদেহ টাইপের প্রোটন-নিউট্রন দিয়ে তৈরী বড় মহাজাগতিক বস্তু খুবই সামান্য। আরেকটা বিকল্প হল ডার্ক ম্যাটার আসলে সম্পূর্ণ অজানা কোন মৌলিক কণা, যারা মহাকর্ষীয় বলে সাড়া দেয় কিন্তু দৃঢ় বা তড়িৎচুম্বকীয় বলে সাড়া দেয় না। মৃদু বলে সাড়া দিতেও পারে। এধরণের কণার নাম দেওয়া হয়েছে উইকলি ইনটারাক্টিং ম্যাসিভ পার্টিকল বা উইম্প। এছাড়া আরেকটা সম্ভাবনার কথাও বলছেন কেউ কেউ। নিউটনের মহাকর্ষের যে নিয়ম সৌরজগতে খাটে, সেই নিয়ম ছায়াপথেও খাটবে তার নিশ্চয়তা কি? এমনিতেই জানা আছে মহাকর্ষীয় বল তীব্র হলে, যেমনটা নিউট্রন স্টার বা ব্ল্যাক হোলের কাছাকাছি হয়, নিউটনের নিয়ম কাজে লাগে না। সেখানে আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের রাজত্ব। কাজেই হয়ত ছায়াপথের মধ্যে অন্য কোন নিয়ম বা কোন পঞ্চম বল কাজ করছে। আমরা নিউটনের নিয়ম দিয়ে বোঝার চেষ্টা করি বলেই অপ্রত্যাশিত ফল পাই আর ডার্ক ম্যাটারের কল্পনা করি।

ডার্ক ম্যাটারের চরিত্র স্পষ্টভাবে জানা না গেলেও আধুনিক পর্যবেক্ষণ বলছে মহাবিশ্বের মোট ভরের মাত্র ছ ভাগের একভাগ হল আমাদের চেনাজানা পদার্থের ভর, বাকি পাঁচভাগই ডার্ক ম্যাটার। তাহলেও একদম শুরুতেই যে বলেছিলাম "মহাবিশ্বের মাত্র পাঁচ শতাংশ জানি" – সে হিসেবটা তো মিলছেনা? সেটার জন্য আবার ফিরে যেতে হবে একশ বছর আগে। আইনস্টাইন বাজারে ছেড়েছেন সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদ নামে এক বৈপ্লবিক তত্ত্ব, যা মহাকর্ষ সম্পর্কে প্রচলিত নিউটনীয় ধারণার খোলনলচে পালটে দিয়েছে। এই তত্ত্বের সাহায্যে মহাবিশ্বের কার্যকলাপ বোঝার চেষ্টা করতে গিয়ে রুশ গণিতজ্ঞ ফ্রিডম্যান একটা অদ্ভুত ফল পেলেন। মহাবিশ্ব নাকি স্থির নেই, তা ক্রমাগত স্ফীত বা সংকুচিত হচ্ছে। এসব ব্যাপার আইনস্টাইনের মোটেও পছন্দ হল না। নিউটনের তত্ত্বের সীমাবদ্ধতা প্রমাণ করলেও অনাদি অনন্ত কাল ধরে বিরাজমান মহাবিশ্বের ধারণা তখনো তাঁর মাথায়। তিনি নিজের সমীকরণে "মহাকর্ষীয় ধ্রুবক" নামে একটা পদ যোগ করে দিলেন যাতে সমীকরণের সমাধান করে স্থির মহাবিশ্বের ছবি পাওয়া যায়। কিন্ত শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা যায়? ১৯২৯ সালে আমেরিকান জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল টেলিস্কোপে চোখ রেখে দেখলেন মহাকাশের সমস্ত গ্যালাক্সি পরস্পরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে এবং যেকোন দুটো গ্যালাক্সির দূরে সরার বেগ তাদের মধ্যেকার দূরত্বের সমানুপাতিক! এর একটাই অর্থঃ মহাবিশ্ব স্ফীত হচ্ছে। ফ্রিডম্যান সঠিক ছিলেন। ব্যাপারটা বোঝার জন্য একটা বেলুনের গায়ে কয়েকটা ফুটকি দিন। এবার বেলুনটাকে ফুলিয়ে দেখুন, ফুটকি গুলো একে অপরের থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আইনস্টাইন পরে স্বীকার করেছিলেন, তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল ছিল মহাকর্ষীয় ধ্রুবকের আমদানি!

এরপর প্রায় সত্তর বছর ধরে ফ্রিডম্যানের প্রসারমাণ মহাবিশ্বের মডেলের ওপর নানারকম গয়নাগাঁটি পরিয়েই দিব্যি চলছিল আধুনিক বিশ্বতত্ত্ব।

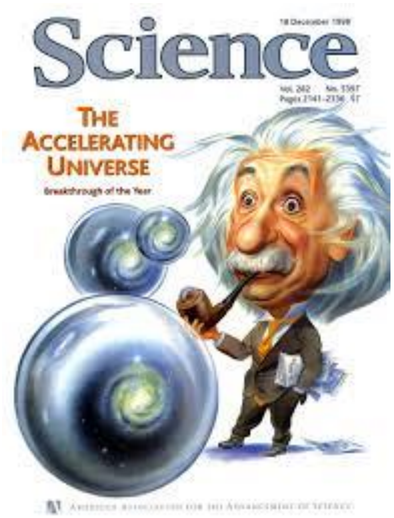

যে মডেল অনুযায়ী ১৪শো কোটি বছর আগে আগে এক মহাবিস্ফোরণ বা বিগ ব্যাং -এর মধ্য দিয়ে জন্ম নিয়েছিল আমাদের মহাবিশ্ব আর সেই বিস্ফোরণের ধাক্কাতেই আজো প্রসারিত হয়ে চলেছে মহাবিশ্ব। কিন্তু মহাবিশ্বে ছেয়ে থাকা ভর ও শক্তির (আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে ভর শক্তিরই একটা বিশেষ রূপ) মধ্যাকর্ষণের জন্য এই স্ফীতির হার কমতে বাধ্য। কারণ মহাকর্ষ বল চরিত্রানুসারে আকর্ষণমূলক। যে কারণে একটা ঢিল আকাশে ছুঁড়ে দিলে তার ওপরে ওঠার বেগ ক্রমশ কমতে থাকে আর একটা উচ্চতায় পোঁছে আবার নীচের দিকে পড়তে শুরু করে, সেই একই কারণে মহাবিশ্বের স্ফীতির হার ক্রমশ কমতে থাকা উচিৎ। কিন্তু নব্বইয়ের দশকের শেষদিকে ব্রায়ান স্মিথ ও অ্যাডাম রিস যৌথভাবে এবং সোল পারমুটার পৃথকভাবে সুপারনোভা, অর্থাৎ মৃত্যুর আগে তারাদের শেষবারের মত জ্বলে ওঠার দৃশ্য, পর্যবেক্ষণ করে জানালেন – মহাবিশ্ব শুধু প্রসারিত হচ্ছে না, প্রসারণের হারও বাড়ছে! এই আবিষ্কারে জন্য ২০১১ সালে পারমুটার, স্মিথ ও রিস নোবেল পুরস্কারে সম্মানিত হন।

এই ক্রমবর্ধমান হারের প্রসারণের জন্য প্রয়োজন এমন পদার্থ বা শক্তি যার মধ্যাকর্ষণ বিকর্ষণমূলক। এই শক্তির নাম দেওয়া হল ডার্ক এনার্জি! ডার্ক, কারণ অন্য কোনভাবে এই শক্তির অস্তিত্ব ধরা পড়ে না। ডার্ক এনার্জির চরিত্র ডার্ক ম্যাটারের মতই বা তার চেয়েও রহস্যজনক! ঋণাত্মক চাপবিশিষ্ট কোন ভুতুরে ফ্লুইড, স্পেসটাইমের নিজস্ব শক্তি বা আইনস্টাইনের সেই ফেলে দেওয়া মহাকর্ষীয় ধ্রুবক — ডার্ক এনার্জিকে নানা ভাবে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা চলছে। আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতাবাদের বাইরে গিয়ে "ঋণাত্মক মহাকর্ষ" পাওয়া যায় কি না সেটাও রয়েছে তাত্ত্বিক পদার্থবিদদের চিন্তার মধ্যে।

মহাবিশ্বের প্রসারণের হার থেকে জানা গেছে মহাবিশ্বে ভর ও শক্তির মোট পরিমাণের ৬৮ শতাংশই হল ডার্ক এনার্জি আর ২৭ শতাংশ ডার্ক ম্যাটার। তাহলে পড়ে রইল ৫ শতাংশ! আমাদের চেনাজানা পদার্থের অনুপাত এইটুকুই।

এককথায় বলা যায় আজকের মহাবিশ্বে অন্ধকারের রাজত্ব চলছে। এই অন্ধকারে আলো ফেলাই এই সময়ে মৌলিক বিজ্ঞানের সামনে অন্যতম চ্যালেঞ্জ।

সংযোজন - সদ্য ফেলে আসা বছরের ২৫শে ডিসেম্বর ৮৮ বছর বয়সে চলে গেলেন ভেরা রুবিন। মেরি কুরি আর মারিয়া গোপার্ট ময়ার-এর পর তৃতীয় মহিলা পদার্থবিজ্ঞানী হিসেবে নোবেল টা তিনি পেতে পারতেন। সে আর হল না।

ছোট গল্প

অতিথি লেখক

নভেম্বর ২, ২০১৭

এই পর্বে লিখছেন উজান মুখোপাধ্যায়। এখনও ছাত্র, আমেরিকাতে সাইবার সিকিউরিটি সিগনেচারের ওপরে পিএইচডি করছেন। বাঁশি বাজান, লেখালিখি করেন, ছবি তোলেন। একটি নিজস্ব গানবাজনার দলও আছে বন্ধুদের সঙ্গে নিয়ে...

কিম্ভূতদর্শন ছায়াগুলো ঝুঁকে পড়ে খুব গম্ভীর, ফিসফিসে অথচ দৃঢ় গলায় বলছিল, “ওঠো। উঠে পড়ো”। তাদের গলায় একটা জাজমেন্ট ডে মার্কা কাঠিন্য। “সময় হয়ে গেছে। কেয়ামতের সময়। ওঠো, নইলে বন্যা...” বন্যা শোনার পর আর ঘুমোনোর মানে হয় না। উঠতে হ’ল। চশমা খোঁজার সময় নেই। স্যুইচবোর্ড হাতড়ানোর সময় নেই। বন্যা। ছায়াগুলো একটা হতাশ, “এর দ্বারা কিস্যু হবে না” মুখ করে দাঁড়িয়ে। একটু দরজাটা দেখিয়ে দিতে পারত? দরজার কানায় ঠোকর খেয়ে এগোলাম। ছায়াগুলো পিছু নিয়েছে। সেরেছে। বাথরুমেও ঢুকবে নাকি? ভাবার সময় নেই। বন্যা। তিন বছরের অচেনা বাড়িতে হাতল ঘুরিয়ে বাথরুমে ঢুকেই একটা খুব চেনা গন্ধ পেলাম। স্পষ্ট। ভারী। চেনা। এ গন্ধর এখানে থাকার কথা নয়।

বীন্‌স আর বরবটি গুলিয়ে যেত। আর খাবার পাতে বরবটি আর কাঁচা লঙ্কা। কতবার যে বরবটি ভেবে লঙ্কা কেটেছি দাঁতে... মা বরবটি কাটছে বঁটিতে। আমাদের বাড়িতে দু’টো বঁটি, আমিষ আর নিরামিষ। খাবার ঘরের মেঝেতে সবজি ছড়ানো। বাজারের সবজি। ফ্রিজে তোলা হয়নি। আমাকে তুলতে বলেছিল। আমি খেলা দেখছি। বাবা খবরের কাগজ পড়ছে। নিজের রিডিং গ্লাস খুঁজে পায়নি। মায়েরটা পরে দেখছে। নাকের ডগায় রিডিং গ্লাস, আর চোখ টেরিয়ে স্কোর। “টিভির অত কাছে বসিস না, চোখটা খাবি।” আর চোখ, ১১৩/১। হেডেনটাকে দু’চক্ষে দেখতে পারি না। “আছে কাগওওওজ, খাতাওলা বওওইওলা” বলতে বলতে মহম্মদ ঘুরে গেলো। রবি শাস্ত্রীটা আহাম্মক। কী যে বলে! ও সৌরভের থেকে বেশি জানে? মা আবার চেঁচালো। “তুই যাবি কিনা স্নানে?” আমি ভাঙা রেকর্ডের মত বললাম “আর একটা ওভার। দাঁড়াও না!” গত ষোলো ওভার ধরেই বলছি। মা বলল “আর একটাও না। এক্ষুণি স্নানে যাবি তুই। আরে, ওরা চলে আসবে তো!” উফফ। কাণ্ডজ্ঞানহীন হরভজন। ওয়াইড। “গেলি কিনা স্নানে তুই? করে নিয়ে দেখ?!” মাঠে পেপ্‌সির গাড়ি নেমেছে। ড্রিঙ্কস। উঠলাম। আলনা থেকে স্যাণ্ডো গেঞ্জিটা নামালাম। মা বলল “এইটা পরে থাকবি ওদের সামনে? কোনও ইয়ে নেই তোর? দেখ খাটের উপর চেক কাটা জামাটা রেখেছি।” নিলাম। “ভালো করে তেল দিবি চুলে।” ছাই দেবো।

টুক করে ঘাড় বাড়িয়ে দেখে নিলাম খেলা চালু হয়েছে কিনা। হয়নি। মারুতি ওমনির অ্যাড হচ্ছে। ছিটকিনি খুলে বাথরুমে ঢুকলাম। একটা খুব চেনা গন্ধে চোখ বন্ধ হয়ে গেলো। স্পষ্ট। ভারী। চেনা। আমাদের বাড়িতে দু’টো

সাবানের খোপ। একটা রোজকার। একটা অতিথি এলে। ইস্পেশাল। চৌকো খাপে গোল সাবান। মাইসোর স্যাণ্ডাল সোপ।

ঘোর কাটল। ছায়াগুলো নেই আর। আলো জ্বাললাম। বন্যা পরিস্থিতির মোকাবিলা করলাম। বেসিনের পাশে লাল সবুজ হলুদ প্যাকেট। মুখ বের করে থাকা একটুকরো সাবান। এ পরবাসে এ সাবান পাওয়া যাওয়ার কথা নয়। চিন্তাশক্তি ফিরতে আরো সময় লাগল খানিক। এ জিনিস আমার নয়। অতএব এ জিনিস আমার সহবাসিন্দার। সে সদ্য বাড়ি থেকে ফিরেছে। বাড়ি। দেশ। দেশের বাড়ি। মাইসোর স্যাণ্ডাল সোপ কলকাতার একচেটিয়া নয়।

বাড়ির। একচেটিয়া।

বন্যা রোধ করা গেল না।

নাইটস্কোপ

নবকলম

জানুয়ারী ৯, ২০১৭

১

নতুন একটা শহরে দিন-দুপুরের থেকেও ঢের

বেশি অচেনা হয় সন্ধ্যে।

শুনেছি সন্ধ্যের কোনও কালে কোনও বন্ধু ছিল না;

তার বন্ধু হয়ও না কেউ।

সে ও কি কারো? না তো!

এমনকি নিজমাতৃগর্ভজাত অন্য অহ্নেরও নয়।

কোনও মিতালিমন্ত্র, আতিথেয়তার আনোখা রেসিপি তার জানা নেই -

এই বিষাদ ঢাকার জন্যেই হয়তো গুঁড়ো গুঁড়ো অন্ধকার

উঠে আসে চায়ের ফাঁকা কাপ থেকে,

ব্যর্থ, পিপাসু শেষ চুমুকের টানে।

ঘিরে ফেলে মাথা, গলা, বুক।

ক্ষতি বা কি! অঞ্জলি কি শুধুমাত্র ফুলেই?

লখনউ এর মুকেশ মাথুরের কণ্ঠস্বর ঠিক এসময়ে আরও বেশি

মোলায়েম , মরমী।

এক অভিজ্ঞ সওদাগরের মতোই বহু বহুদূর থেকে

নিক্তি মেপে খানিক বেশি কান্না কিনে আনে।

আর, সিঙ্গারা ফুরনো শালপাতার ঠোঙ্গার অন্ধকার?

সে আঙ্গুলের ফাঁক গলে নেমে যায় নীচের দিকে।

তলার দিক থেকে ভরে উঠে চামড়াচটা চটি থেকে কোমর অবধি ভারী হয়ে ওঠে।

বেজায় ভারী, বাড়ি ফিরতে দেরী হয় বড়, রোজ।

সেও এক সন্ধ্যেবেলারই কথা – মিহি গুঁড়োর, ছোট দানার যে এতো ভার,

তা প্রথম বার জেনেছিলাম এক আত্মীয় বিয়োগের পরে;

কাজ মিটে গেলে তিল- তিসির কৌটো উঁচু তাকে রাখতে গিয়ে।

নির্ভারের সমাবেশে ক্রমে ভারী হয়ে ওঠা, ভারী করে তোলা -

খানিক গভীরে এও তো এক গড়ে ওঠা সম্পর্কেরই খতিয়ান,

'বিষাদ – যোগ'।

'একাকীত্ব' নিজের ধ্রুপদী সংজ্ঞাটিকেও খুইয়ে এখানেই বুঝি সার্বিক রিক্ত হয়;

নিজে শুধু নিজের উদাহরণ হয়ে পড়ে থাকে।

ঠাহর হয় না ভালো সে নমুনা।

ঠিকমতো পরখের আগেই

সচেতন, অনাড়ম্বর শামিয়ানায় ঢাকা পড়ে।

২

দ্বিপ্রহরের কাদামাটি – গোবরে অপরিচ্ছন্ন, অপ্রতিভ

শিঙ্গালো মাথাটি গোধূলির বাঁক পেরোবামাত্র

লহমায় রাজকীয় নিকষমূর্তি।

সন্ধ্যাগর্ভে অনুরণনে আবছা হওয়া আলোয়

মায়াভাস্কর্যে উত্তীর্ণ মহাবৃষভের পৌরুষ, যৌনতা

প্রকট দৃশ্যমান না হলেও চলে; যতোখানি অপরিহার্য তার সৌষ্ঠব।

স্বয়ম্ভূর ধ্যানাসন হিসেবে মানায় এমন বৃষপৃষ্ঠে মনোনিবেশে মেলে

ককুদপর্বতে পেশীর পরিমিত, পরিশীলিত নড়াচড়া;

নিঃশ্বাস–প্রশ্বাস , ধৈর্য–অধৈর্য , কাম-ক্রোধ ফুটে ওঠে, নিখুঁত।

থিয়েটারে অমিল,

এমন শক্তিশালী এই কুশীলবের কোনও যোগ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নিকটবর্তী হলে

অধিকারের ধুলোঝড় ওঠে, আস্ফালনেরও।

কণ্ঠনির্গত বজ্রগরজনে সম্বিত ফিরে জানান দেয় দূরত্বের গুরুত্ব।

যথোচিত আঁধারে মধুঋতুর দ্বন্দ্বময় রোমহর্ষক পৃথিবী ক্রমে রোমাঞ্চকর,

পরিশেষে সুন্দর হয় প্রতি আগামীতে।

৩

তখনো আলোবদল হতে দেরি, ন সেকেন্ড।
কেউ কোথাও সিগনাল মানছে না।
চৌমাথার মোড়।
কোলাহলের প্রতিবর্ত ক্রিয়ায় হাত তুললে যেটুকু প্রাইভেট অঞ্চল তৈরি হয় গা ঘেঁষে
সেখানেও সেঁধিয়ে যাচ্ছে বাইক, সাইকেলের হ্যান্ডেল।
এরকমটায় অবাক হতে নেই
কারণ প্রাইভেসির কোনও জায়গাই আর নেই।
দেখছি পিছনের গাড়ির আলো হাঁটা পায়ের ফাঁক গলে ছিটকে পড়ছে সামনের অন্ধকারে,
যেখানে হেডলাইটের আলো ঢেলে জায়গার দখল নিতে ব্যস্ত আরও সাতটা গাড়ি।
"ভাই দাঁড়া, তাড়া তো আমারও !" -

এটুকু শেষ করতে না করতেই পা দলে দিয়ে চলে যেতে চাইছিল যে অটোরিকশা,

তার টেকো মাথার চালককে চিনি;
কাল খালি বসেছিল, খুব যত্ন করে ডাকছিল,
কারণ ও জানে, যে কেউ উঠলেই বিশ টাকা।

আজ গাড়িতে বিশ টাকা বসে আছে, বা তারও বেশি – সে আজকের দেবতা।
কালকের দেবতার পা ওর কাছে আজকের বেশি কিছু নয়,
চাকায় প্যাঁচ খাওয়া কালো পলিথিনেরই মতো;
টর্চ ফেললে হয়তো জানা যাবে আরও ঘন কালো বিস্মৃতিতেও অমিল।
যে জীবনের কঠিন যুদ্ধ আছে, গতি ব্যতিরেকে তার পৃথক পূজ্য দেবতা নেই।
ভয়ভক্তির কোনও বন্ধক নেই - এমন মানুষ নয়, জীবন গুলোই
সিগনাল মানছে না।

গভীর রাতের ডায়রি

উত্তরায়ন

জুলাই ৬, ২০১৭

কালবৈশাখী... নটরাজের দামামা। আধশোয়া হয়ে আছে একটা বুড়ো বটগাছ। যেন পড়ে যেতে যেতে কেউ উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছে। হাঁ করে থাকা অন্ধকার গহ্বর থেকে জীবনে এই প্রথমবার সূর্যের আলোর মুখোমুখি শেকড়গুলো। মাটি আঁকড়ে থাকার দম্ভ আর নেই। একটু শুকিয়ে উঠলেই করাতের দাঁত আর তার ধাতব বিষচুম্বন। বৃষ্টির জল সরু সুতোর মত বয়ে এসে সেখানে ভোজবাজির মত হারিয়ে যাচ্ছে। সেখান থেকেই কাঁধে ছোট ছোট দানা নিয়ে পিলপিল করে পিঁপড়ের অসীম মার্চ চলেছে। ইতিউতি ঘুরঘুর কাঠবেড়ালির ছানারা। চেনা খোঁদলে জমানো খুচরো খাবারের শেষ সঞ্চয়টুকু বেহাত হওয়ার মুখে। ভীষণ ব্যস্ততা তাই। ঢিমেতালে বহু কষ্টে দূরের অশ্বত্থটার দিকে চলেছে প্রাচীন দাঁড়াশ। জন্মানো অবধি এতদিনের ঠাঁই আশ্রয় ছেড়ে যেতে হয়ত মন চাইছে না। নরম রোদের কম্বল মুড়ে ঝিরঝির বৃষ্টি মাখছে শুকনো পাতার দল। সবুজ মাঠে এক রাতেই তামাটে গালিচা। একটা গন্ধ ভেসে আসছে... ইতিহাস উপড়ে যাওয়ার গন্ধ। এই সকালেও ঈষৎ নেশাতুর "রাজেন বিস্ত", শ্যাওলা ধরা স্যাঁতস্যাঁতে চ্যাপ্টা পাথরটার ওপর বসে একদৃষ্টে তাকিয়ে আছে সে দিকে। সেই ছোট্টবেলায় এখানেই তার বাবার সঙ্গে বসে ওই বটগাছটার দিকে তাকিয়ে কত ভোর হতে দেখেছে। রাত ঘনালে কাছে-দূরের সব ঘরের আলো যখন অল্প অল্প করে নিভে যেত, গেটের বাইরের রাস্তার স্ট্রিটল্যাম্পের আলোগুলো কুয়াশায় ঝাপসা হয়ে যেত, রাতের নেপালি খবর শেষ হতেই ব্যাটারি বাঁচাতে বাবা রেডিওটা অফ করে দিত... ঘুম আর মশার আক্রমন থেকে বাঁচতে দুজনে লাঠি হাতে ঘুরে বেড়াত। এতক্ষন চিৎকার করা মাদি কুকুরটাও ততক্ষনে দুধের ছানাগুলোকে নিয়ে বাগানের ডাই করা পুরনো পিপেগুলোর ভুলভুলাইয়াতে নিরাপদ আশ্রয়ে বিশ্রাম নিচ্ছে...। এই শ্বাপদ পরিবারটির ইতিহাসের আগেও একটা ইতিহাস আছে। এরা আগে এই বটগাছের পাশের কাঠের বেঞ্চের নিচেই রাত কাটাত। রাজেনের কেন যেন অভ্যাস হয়ে গিয়েছিল রাতে টর্চ জ্বেলে একবার অন্তত মায়ের পেটের উষ্ণতায় চারখানা ছানাকে ঘুমোতে দেখা। অদ্ভুত একটা শান্তি পেত সে। একদিন সকালে হঠাৎ বাচ্চাগুলোর সংখ্যা একটা কমে গেল। সকলে বলল যে এই বটগাছের ভেতরে কয়েকটা বিশাল সাপ আছে। তারাই কেউ রাতে খেয়ে গেছে একটা। ছোট্ট রাজেনের সেটা বিশ্বাস হয় নি। বড় সাপ থাকলে কি এতদিন তার চোখে পড়ত না ! তবে রাতের গভীরে সরসরিয়ে কোন বুকে হাঁটার অস্তিত্বের হদিশ পেয়ে সেই বারবার আচমকা শিউরে ওঠাটা এখনও যেন অনুভব করতে পারে। ভেতরে কোথাও এই অস্বীকারের জায়গাটা হারিয়ে যায়। মা কুকুরটা সারাদিন একজায়গায় থাবায় মুখ গুঁজে বসে রইল। তারপর কিন্তু নীরবে সেখান থেকে সরে গিয়ে বাগানে আর একটা বাসা খুঁজে নিয়েছিল।

মাঝরাতে প্রায় মাটি ছুঁয়ে থাকা ঝুরিগুলো অন্ধকারের আবেশে পাঁচ ব্যাটারির আলোর সাথে একটা অপার্থিব খেলা খেলে বেড়াত গাছটার শরীরে। থমথমে অন্ধকারে একটা প্রহেলিকার মত বহু হাত মেলে দাঁড়িয়ে থাকা বিশাল অবয়বটা প্রথম সকালের ছায়াপথে স্পষ্ট হলে দেখা যেত রোদ্দুর কিভাবে পরম আদরে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে ধরছে

বিশাল গুঁড়িটা। ঘুম ভাঙা পাখীদের একযোগে ডানা ঝাপটানোর অনুনাদে আর দূর চা বাগানের সকালের ভোঁ শুনে আড়মোড়া ভাঙত সে। টিফিন কৌটো থেকে বাপ-ছেলের রাত্তিরের খাওয়ার শেষ রুটির গুঁড়োগুলো গাছটার নিচে ছড়িয়ে দিয়ে কোয়ার্টারের দিকে হাঁটা দিত দুজনে। পাখীর দল এক্ষুনি ব্রেকফাস্টের জন্য নিচে নেমে আসবে।

বাবা আর নেই। এখন রাজেন নিজেই এখানকার পাহারাদার। রাত দশটা থেকে সকাল ছটা অব্দি ডিউটি। কাজ ছাড়া কাউকে কিছু কৈফিয়ত দেওয়ার নেই, কিছু নেওয়ারও নেই। তবে আজকে সকালে হঠাৎ সময়টা তার দুকাঁধ ধরে পেছনের দিকে টানছে কেন! গতকাল ঝড়ের হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে ছুটে নিজের ঘরে চলে যেতে হয়েছিল। শেষরাতে ঝড় থামতেই কোন এক অজানা আশংকায় ফিরে এসেছিল সে। তারপর থেকে স্থানুর মত ওই পাথরটার ওপরেই বসে আছে। ঝিরিঝিরি বৃষ্টির কনা শিশিরের মত কাঁচা পাকা চুলের ওপর ঝিকমিক করছে।

বটগাছটাকে সে ভালবাসত নাকি ঘৃণা করত জানে না। পড়াশোনা জানা বাবুদের মত কোনদিন ভাবেও নি। আকাশছোঁয়া দেহটাকে ভয় পেত, শ্রদ্ধাও হয়ত করত। কারন, মাঝে মাঝে গাছটাকে অনেকে পুজোও দিত। প্রসাদ পেত তারা। মজা হত বন্ধুদের সঙ্গে ঝুরি ধরে দোল খেতে, রাগ হত নিশ্চিত বাউনডারিটা গাছে ধাক্কা খেয়ে আটকে গেলে; কিন্তু অনেক রাতে নেশায় প্রায় বেহুঁশ বাবার কম্বলের আড়াল থেকে পায়ে পায়ে হেঁটে গিয়ে যখন গাছটার কালচে বাদামি খরখরে শরীরে কান রাখত, তার সামনে একটা অন্য পৃথিবীর দরজা খুলে যেত। অনেক নতুন শব্দ, অনেক নতুন গন্ধ, তাদের অনুবাদে অনেক অনেক নতুন ছবি... সেগুলো যেন এই পৃথিবীর কিছু নয়। পশ্চিমের রোদ্দুরটা সোজা এসে রাজেনের চোখের ওপর পড়ছে। সূর্যকে সামনে থেকে আটকে দেওয়ার মত আর কিছু নেই যে। কিন্তু সে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। ওই যে গেট খুলে দিল চন্দন। রাজেনের বড় ছেলে। ঘরঘর করে গাড়িটা এসে দাঁড়ালো অদূরে। করাত আর কাঠ কাটার দা নিয়ে লাফিয়ে নামলো কয়েকটা লাল নীল জ্যাকেট বর্ষাতি। শীর্ণ হাতে মদের বোতলটা তুলে এক ঢোকে শেষ করে পেছন ফিরেই টলমল পায়ে চা বাগানের দিকে দৌড়তে লাগল রাজেন। কোথায় থামার ছিল আর মনে আসছে না। কিন্তু, একটা মৃতদেহকে আরও খুঁড়ে খুঁড়ে মেরে ফেলা দেখতে পারবে না সে। অনেকের জীবনে পিতৃবিয়োগ একাধিকবার হয়।

রাঙিয়ে দিয়ে যাও

যদুবাবু

সেপ্টেম্বর ৩০, ২০১৭

একটা সময় ছিলো, আমাদের বয়েস তখন একক ছেড়ে দশকের ঘরে পৌঁছয়নি, এই চতুর্থী-পঞ্চমীতেও রাস্তাঘাটে নিরাপদে বেরোনো যেত, এমনকি সামনের রায়পাড়ার মাঠে ষষ্ঠীর দিনও দেখেছি প্যাণ্ডেলের বাঁশে কাপড় পরানো হচ্ছে আর সেই ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে এক চিলতে প্রতিমা, তার হাত খালি আর মুখের সামনে তেরপল টাঙানো... মা বলতেন, 'এই তো মা একটু ঘুমোচ্ছেন, অনেকটা জার্নি করে এসেছেন কিনা!' আর বেশ মনে পড়ে, জ্ঞান হওয়া ইস্তক সপ্তমীর রাতটা বাঁধা ছিলো হোল-নাইট ঠাকুর দেখা্র জন্যে, আর আমি ষষ্ঠী থেকেই রাতবিরেতে উঠে মাকে ঘুম ভাঙ্গিয়ে জিজ্ঞেস করতাম, 'সপ্তমী কি এসে গেছে?'

আমাদের সেই ছোট্টবেলায় পুজো শুরু হতো একটা অদ্ভুত রিচুয়াল দিয়ে, বাবা সকাল হতে না হতেই ঝাঁপিয়ে পড়ে বলতেন এই লাইন টানা খাতায় একশো বার শ্রী শ্রী দুর্গা সহায় লেখো ... সে এক দুঃসহ যাতনা!

তবে এর উদ্দেশ্য কিন্তু হাতের লেখা প্র্যাক্টিশ নয়, সে তো আপনি চাইলেই পি আচার্যের রচনা লিখতে পারতেন, বা আনন্দবাজার থেকে গৌতম ভটচাযের দাদাইস্ট পেইন্টিং-ও অক্লেশে টুকে দিতে পারতেন... কিন্তু নাহ, ওই একটাই বাক্য, সেই যাত্রাপথের 'মা খু চিহল ও পঞ্জম হস্তম' এর মতন ... বড়ো হয়ে বুঝতাম ওটার আসল উদ্দেশ্য দিনের পর দিন একঘেয়ে কাজ করে যাওয়ার নেট প্র্যাক্টিশ – ব্যাঙ্কে কাজ করতে গিয়ে দিনের পর দিন একটা পাওয়ারপয়েন্টে ভুষিমাল-টু-ডেসিমাল করতে গিয়ে দেখেছি, খুব কাজে দেয়...

পুজোর উপহার পেতাম চারটে জিনিস, নতুন জামা-প্যান্ট-জাঙ্গিয়া, নতুন একজোড়া জুতো এবং সেটা পরে ফোস্কা পড়বেই তাই একপাতা ব্যান্ড-এড আর একটা খেলনা ক্যাপ পিস্তল। সেই পিস্তল ছিলো আমার সবসময়ের সঙ্গী, পুজোর ভিড়ে ঘামতে ঘামতে, পায়ের পাতা বাঁচাতে বাঁচাতে কল্পনা করতাম একটা বিশাল দৈত্যাকৃতি টেরোড্যাক্টিল এসে মহম্মদ-আলির মাঠে নেমেছে আর আমি একা অকুতোভয় যোদ্ধা, হাতে একটি উদ্যত ক্যাপ পিস্তল...

এইসব আগডুম-বাগডুম ভাবতাম বলেই কিনা ঠিক জানিনা, থেকে থেকেই ছড়িয়ে মাঠ ময়দান করতাম। স্পষ্ট মনে পড়ে বাবার সাথে ঠাকুর দেখতে বেরিয়েছি, হঠাৎ রাস্তায় দেখা বাবার অফিস-কলিগ আর তাঁর মেয়ে, আমার-ই বয়সী। যদিও আমি নেহাত-ই শিশু এবং সে বয়সে ছক বলতে শুধুই এক্কা-দোক্কা বা লুডো, তা-ও ভদ্দরলোকের মতন পিস্তল কোমরে গুঁজে, হাত বাড়িয়ে জিজ্ঞেস করলাম, 'তোমার নাম কি? মেয়েটি ফিক করে হেসে উত্তর দিলো, 'এমা তোমার প্যান্টের চেন খোলা'... দামড়া বয়সে তার সাথে আরেকবার দেখা হয়েছিলো, বাবার চেম্বারে, আমি চিনতে পারিনি, সে-ও না, বাবাই পরিচয় করিয়ে দেন, 'সেই যে তোকে বলেছিলো, তোর পোস্টাপিস খোলা?'

দোষটা আসলে আমার-ই, ক্যাপ হাতে পেয়ে বীররস একটু বেশী-ই বেড়ে গেছিলো হবে, আমার বাবা আবার খেলনা-বন্দুক জিনিসটাকে অত্যন্ত অপছন্দ করতেন, তাঁর ধারণা ছিলো মানুষের মধ্যে হিংস্রতা জাগায় এমন জিনিস আর যাই হোক বাচ্চার খেলার জিনিস হতেই পারে না। এখন মাঝে মাঝে চারদিকে দেখে মনে হয়, এটাই যদি আর-ও দু-একটা লোক ভাবতো, মন্দ হতো না ...

ঠাকুর দেখতে বেরোনোর আগে আমাদের পকেটে একটা চিরকুটে নাম ঠিকানা লিখে দেওয়া হতো, হারিয়ে গেলে এবং গাঁত উলটে বাড়ির ঠিকানা ভুলে গেলে যাতে কেউ বমাল ফেরত দিয়ে যান তার ব্যবস্থা ... বাবা নির্ঘাৎ জানতেন যে আমার হারানোর ষোলো-আনা ইচ্ছে – তার অবিশ্যি দুটো জায়েজ কারণও ছিলো — এক, গোপাল ভাঁড়ের গল্পে পড়েছি, গোপালের ছেলে মেলায় হারিয়ে গিয়ে তারস্বরে 'গোপাল, অ্যাই গোপাল' বলে চিল্লামিল্লি জুড়ে দিয়েছে, গোপাল এসে কান মুলে ধরতে তার অকাট্য যুক্তি, 'বাবা, বাবা' ডাকলে তো সবাই ছুটে আসবে, আসল বাবা বুঝবে ক্যামনে? সেই অপাপবিদ্ধ বয়সে মনে হতো আমার দোর্দন্ডপ্রতাপ বাপকে নাম ধরে ডাকার সুযোগ এই একটাই – সন্তোষ মিত্রর লাইনে হাল্কা করে হাওয়ায় মিশে যাওয়া ... (বলাই বাহুল্য সব সদিচ্ছা পূর্ণ হয় না! হাজারোঁ খোয়াইশের অ্যায়সে-কি-ত্যায়সে)

আর দুই, ওই যে মাইকে ডাকে, 'পাইকপাড়া থেকে এসেছেন পিন্টু প্রামাণিক, আপনি যেখানেই থাকুন আমাদের অনুসন্ধান অফিসে এসে সত্বর বডি ফেলে দিন' ... বড়ো শখ ছিলো ওর'ম একটা জমায়েতে আমার নামটাও দিকে-দিগন্তরে ছড়াবে অশ্লীল এস-এম-এসের মতন ... এই ইচ্ছেটি পূর্ণ হয়েছিলো, কিন্তু সে আরেক লজ্জার কাহিনী !

বম্বে থেকে কলকাতা এসেছি কাউকে না জানিয়ে – পুজোর কলকাতা এ প্যান্ডেল থেকে ও প্যান্ডেলে আছড়ে পড়ছে আর আমিও জোয়ারের বিষ্ঠার মতন ভেসে চলেছি। পুজোর বাজারে একা একা, উদ্দেশ্যহীন ঘোরার ভারি মজা - প্যান্ডেলে ঢোকার দায় নেই, অসুরের জ্যাবোরান্ডি চুল দেখে হিংসে হওয়ার ভয় নেই – খালি এ রাস্তা থেকে ও রাস্তা, উত্তর কলকাতার অলি-গলি-পাকস্থলী চষে এই উন্মত্ত ভিড়কে মুগ্ধ হয়ে দেখে যাওয়া ... হঠাৎ দেখি সামনে এক পরিচিত দিদি দু হাত তুলে ছুটে এসে পাকড়াও করে বললেন, 'একা একা ঘুরছিস কেন? চল আমাদের সাথে' ... স্নেহ ভারী বিষম বস্তু, বিশেষ করে পাইকিরি রেটে এলে... একটু এদিক ওদিক দেখলাম, এই তো বাঁশ উঠেছে, পাল ছুটেছে, আমিও টুক করে গলে বেরিয়ে পড়লাম রাস্তায়, দৌড়ে বাগবাজারের মোড়-ও পেরোইনি, দৈববাণীর মতন মাইকে পষ্ট শুনলাম সেই অমোঘ, অমায়িক গলা, 'অনুসন্ধান অফিসে আপনার জন্য বসে আছেন ... '

সেটাই আমার শেষ কলকাতায় পুজো, এখন যার অস্তিত্ব শুধুই বন্ধুদের গল্পে, ছবিতে – এই অর্ধেক পৃথিবী দূরেও অবশ্য পুজো হয়, যেখানে বাঙালী কলোনি রীতিমত বর্ধিষ্ণু, সেখানে ঘটা করে – ইন্ডিয়ানার গ্রামে থাকার সময় দেখেছি, তিনটে আশেপাশের রাজ্য জুড়ে বিশাল ট্রাই-স্টেট পুজো, তার কর্মযজ্ঞ কলকাতাকে লজ্জা দেবে... আর তার আড়ালে ইউনিভার্সিটি টাউনে হয় বাচ্চাদের অনাড়ম্বর ঘরোয়া আড্ডা-পুজো ।

পার্ডুতে দেখতাম একা হাতে অলোক-দা, তৃপ্তি বৌদি আমাদের কয়েকপিস এনথু কাটলেট পাবলিক-কে নিয়ে একটা গোটা পুজো নামিয়ে দিতেন । সেই জনাকয়েক লোক – তারাই প্যান্ডেলে পেরেক ঠুকছে, সাতসকালে এসে খিচুড়িতে

খুন্তি নাড়ছে, ময়দা ঠেসছে, দুপুরে আবার তারাই কুইজমাস্টার, বিকেলে গলায় ক্যামেরা ঝুলিয়ে খচাখচ ক্যান্ডিড মোমেন্টস-ও তারাঁই ধরবেন, অল্প ধুনুচি নাচেও কোমর দোলাতে ভরসাও এয়াঁরাই ... সবাই চলে যাওয়ার পরেও বন্ধুরা কয়েকজন থেকে যেতাম জঞ্জাল ফেলতে, গোটা চার্চ ভ্যাকুয়াম করে, দুগগা ঠাকুরকে ইউ-হল-এ করে আবার গ্যারেজ-কৈলাসে ফেরত নিয়ে যেতে যেতে সেই বিলেটেড বিজয়াতেও মনটা ভারি খারাপ করে আসতো... নাস্তিক আমি সবার অলক্ষ্যে টুক করে মূর্তির পা-টা ছুয়েঁ বলতাম, 'আসছে বছর আবার এসো'...

চ্যাপেল হিলে থাকার সময় দেখেছি একদল বাচ্চা সারা-রাত জেগে কি অমানুষিক পরিশ্রম করে সাজিয়ে তুলেছে একটা ছোট্ট অ্যাপার্ট্মেন্টের মধ্যে একটা আস্ত প্যান্ডেলের কারুকাজ... সারা রাত ধরে রান্নাবাটি খেলা, মাঝে গান আর আড্ডা, তার আওয়াজ কানে লেগে আছে, থাকবে...

রঙিন কাগজের পুষ্পাঞ্জলি, র‍্যালে আর চ্যাপেল হিলের বাচ্চাদের সারা-রাত জেগে তৈরী করা সাজ

গান-বাজনার কথায় মনে এলো আমাদের প্রবাসী কলচর-বিলাস, সন্ধ্যেবেলায় একটা মাইক জোগাড় করে বসে যেতাম সবাই। একদল কুঁচোকাঁচা উঠে নাচতো, গাইতো, আধো গলায় 'এসেচে শরত, হিমের পরশ' – সদ্য ফোটা উচ্চারণের বাংলা শুনে কান জুড়িয়ে যেতো... এক দিদি ছিলেন, যারপরনাই অনুরোধের পর বসতেন আধুনিক গানের খাতা খুলে, একের পর এক গেয়ে যেতেন। তিনি গেয়েছিলেন 'কথা দাও ভুলবে না গো', সত্যিই ভুলতে চেয়েও পারিনি... আমি ছিলাম শ্রুতিনাটক-আবৃত্তির টিম-এ, এক এক বছর খুব উৎসাহ নিয়ে স্ক্রিপ্ট লিখতাম, আর না হলে ছাই ফেলতে ভাঙা কুলো চেনা কবিতা, জয় গোঁসাই আছেন কি করতে...

'আমি যখন ছোটো ছিলাম,
খেলতে যেতাম মেঘের দলে,
আর কিছু তো গাঁত করিনি,
'মেঘবালিকা'-ই হোক তাহলে?'

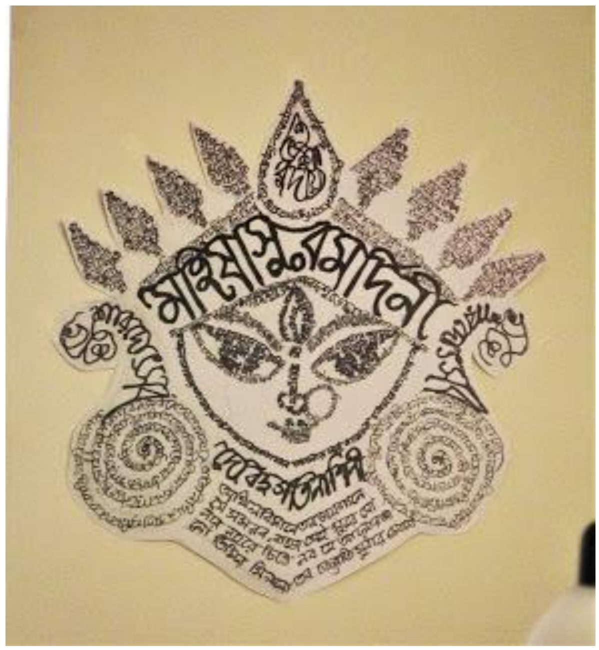

দুর্গা-ডুডল, ভালো করে খেয়াল করলে বোঝা যাবে প্রতিটা রেখাই আসলে লেখা, লিখে-এঁকে-ছিলো আমাদের সোহিনী

একটা জিনিষ কিন্তু পেয়ারাবাগান টু পেন্সিলভ্যানিয়া কোত্থাও পালটায় না – পড়তে পড়তে আড়চোখে দেখতাম কেউ হাই তুলছে, কেউ ঘড়ি দেখছে আর সিলিং, আর বাকিরা কর্তাব্যক্তি, কবিতাপাঠের ব্যাকগ্রাউন্ডে তুমুল পায়চারি করে যাচ্ছেন, পাঁঠার ট্রে-টা আসতে আসতে যদি ক্যালোরি ও পাপ দুটোই ঝরে যায় ... দু-একবার এই মওকায় নিজের লেখা ন্যাকা কবিতা শ্রীজাতর বলে ঝেড়েও দিয়েছি নির্লজ্জের মতো:

প্যান্ডেল আজ জ্বালেনি কেউ আলো
বাঁশ দাঁড়িয়ে, ছোট্ট-সরু-বাঁকা...
প্রেম জোটেনি এবার পুজোর ভিড়েও
পথ ও আমি, শুনশান আর ফাঁকা...

এবারে যেন একটু বেশি-ই মন কেমন – আসলে আমাদের এই ভূষুন্ডির মাঠে পুজোর জলুস একটু কম, পোস্ট-ইলেকশনে সিপিএমের মতন, সবাই জানে সে আছে, ঘনঘন মিটিং হচ্ছে, প্ল্যান হচ্ছে, তবু আমাদের মতন কিছু

নিবেদিতপ্রাণ পুজো-ফ্যান ছাড়া বেগার খাটার লোক পাওয়া দুষ্কর... পুজোর দিনগুলো তাই চুপচাপ কেটে যায়, ক্লাসে পড়ানোর ফাঁকে অগুন্তি মেসেজ আসে, উজ্জ্বল শাড়ির ছবিতে আর কাঁপা হাতের ভিডিও-তে ভরে যায় ফেসবুকের দেওয়াল... তার মাঝে মাঝে কয়েকটা আবার আমার-ই মতন লোকের, সত্যি পুজোর রেশ নেই, তাই পুরোনো অ্যালবামটাই বারবার উলটে পালটে ধুলো ঝেড়ে দেখা, তাও সব আস্তে আস্তে ঝাপসা হয়ে আসে...

দু-এক টুকরো তবু জানি মুছবে না – মুছবেন না সিংজী, সেই বৃদ্ধ ট্যাক্সিচালক, বাবার পেশেন্ট ছিলেন, জোর করে ঠাকুর দেখাতে নিয়ে যেতেন... বেচারির প্রস্টেট-এর সমস্যা ছিলো, পুজোর বাজারে যেখানে সেখানে পাগড়ি পরে হিসু করতে বসলে যে মার খেতে হতো, সে নিজের চোখে দেখা... তা-ও, আসতেন, প্রত্যেকবার, রাত্রে দেখতে পেতেন না যখন, দিনের বেলায় আসতেন তার পক্ষীরাজ নিয়ে... আলোর কারিকুরি কিস্যু দেখা যেতো না, তাও লাইটিং-এর কঙ্কালের দিকে তাকিয়ে মনে মনে ভেবে নিতাম মারাদোনার গোল, মাদার টেরেজার বলিরেখা ভরা মুখ, সৌরভের সেঞ্চুরি... লাল-নীল টুনি গুলো একে-একে জ্বলছে-নিবছে...

আর একটা আশ্চর্য পুজোর সন্ধ্যে মাঝে মাঝে ফিরে আসে – ২০০৮, মাস্টারস-এর ফাইনাল ইয়ার, সপ্তমীর দিন এক বন্ধুর ফোন এলো, বললো ভিড়ে আর আওয়াজে পাগল পাগল লাগছে, চ' একটা নিরিবিলি জায়গায় বসে আড্ডা মারি – চলে এলাম নন্দন চত্ত্বরে, শুনশান ফাঁকা এলাকা, এমনি দিনেও যেসব ঝোলা-চপ্পল-শোভিত আঁতেল মিছিল দেখা যায়, সেও নেই, কড়ে আঙ্গুল ধরে থাকা প্রেমিক-প্রেমিকারাও না... খালি একটা এগরোল-চাউমিনের দোকানে টিমটিম করে আলো জ্বলছে আর কয়েকটা লোক ফতুয়া পরে হাত নেড়ে নেড়ে তর্ক করছে...

আমি আর আমার বন্ধু যে গাছের তলায় বসে একের পর এক সিগারেট ধ্বংস করছিলাম, তার সামনের গাছ তলাটায় এক মহিলা বসেছিলেন – উস্কোখুস্কো চুল, কাঁধে একটা ঝোলা থেকে একটা একটা করে লেখা পাতা বের করছেন, উল্টেপাল্টে দেখে আবার ঢুকিয়ে রাখছেন ভিতরে, একটা সিগারেট বোধহয় চেয়ে এনেছিলেন, আর্ধেকটা খেয়ে বাকিটা আবার প্যাকেটে ঢুকিয়ে রেখে দিলেন সযত্নে, কেউ দূর থেকে বললো 'পাগলিটা আবার এসচে'...

কিন্তু আমি দেখলাম তার মুখে চোখে কি অনাবিল, অনর্গল, অবৈধ একটা আনন্দ, যার তল পাওয়া যায় না... যেন একটা বেয়াড়া প্রশ্নকে ধাওয়া করে করে সারা জীবন শুকতলার মতন ক্ষয়ে ক্ষয়ে এসে তিনি পৌঁছেছেন এই নির্জন গাছতলায় – আর ওদিকে যখন শহরটা একটা বিশাল যন্ত্রদানবের মতন নিজেকে ছেঁচড়ে ছেঁচড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে একটা থেকে আরেকটা ঝিলমিল আলোর চারপাশে, আজ সেই উত্তরটা তিনি পেয়েছেন কল্পনায়...

...আমার ফোনে এদিকে লাগাতার টুংটাং করে এস-এম-এস বেজেই যাচ্ছে, 'কিরে কখন আসবি?' -

আজ যদি আবার ফিরে যেতাম পুজোর কলকাতায়, ভিড়ের বাইরে খুঁজে বের করতাম তাঁকে... আর জিজ্ঞেস করতাম, 'তাঁরও কি পুজো হারিয়ে গেছে হাত ফস্কে, আমার মতন?'

[পুনশ্চঃ এসব-ই বড্ড ছেঁদো কথা, তা-ও, এই লেখাটা উৎসর্গ করলাম আমার স্টেথো-গলায় অসুর বন্ধুদের, যাঁদের ঢাকের বাদ্যি লাবডুব-এ মিশে গেছে, এই পার্বণে যাঁরা চার দেওয়ালের মধ্যে বসে রুগী দেখছেন, যাতে আর পাঁচজনের পুজো আরেকটু উজ্জ্বল হয়, তাঁদের]

সেই ভীতু লোকটা

তৃতীয় পাণ্ডব

সেপ্টেম্বর ১৮, ২০১৭

দশজনের মধ্যে আলাদা করে চোখে পড়নি কখনোই
মফস্বলের ছাপোষা মাস্টারমশাই যেমন হয়,
ঠিক ততটাই তুমি,
একটুও বেশি না, বা কম

কেউ তোমায় ভয় পায়নি কখনো,
তুমিই উল্টে ভয়ে ভয়ে কাটিয়ে দিলে
সারাটা জীবন,
আমাদের দুভাইবোনকেই বলনি কখনো
জোর গলায়, পড়তে বোস!

মায়ের সাথে ঝগড়াও একতরফাই,
মিনমিন করে দু এক কথার পর
হাল ছেড়ে বাঁচতে যেন...
আমদের দিকে তাকিয়ে টিপতে চোখ।
ভাবখানা এমন, আমার কি, বকছে বকুক!

তুমি পাখা মেলতে,
মাঠের আলপথে,
বুড়ো সাইকেলের পিঠে চড়ে,
দিগন্তে মিশতে মিশতে...
সব্জিওয়ালার সাথে খোশগল্পে,
বা মুখে মুখে গল্প বানাতে,
গ্রামার শেখাতে কখনও...
তখন চোখে মুখে অন্য আলো,
অন্য বাবা পুরো!
চিনতে পারতাম না, কেমন যেন।

লাইব্রেরি ঘরটা তোমার সংসার,
বাকিটা মায়ের..
এভাবেই কাটিয়ে দিলে কতটা সময়,
সুন্দর বিপরীত সহাবস্থান।
সহজ সরল নির্বিরোধী
সাধারণ বাবা আমার...

একটা সন্ধ্যের কথা
আজও মনে আছে, জানো..
দিদি তখন সবে কলেজ,
আমি ক্লাস টুয়েলভ্
পাড়ার রকে আড্ডা বসত
খুব, যত মায়ে খেদানো, বাপে তাড়ানো
দল বেঁধে হুজ্জোতি,
সন্ধ্যে নামলে আরো বেশি,
বেশি করে অশ্লীল।
ফিরছি আমরা দেওয়াল ঘেঁষে,
পাশ থেকে হোহো, খিস্তি খেউড়
হঠাৎ কাছে বোম ফাটল যেন,
সবাই চুপ!
দেখি কখন যেন আমার বাবা,
পাশে পক্ষীরাজ, চড় মেরেছে সপাটে
অশিক্ষার গালে, চিতিয়ে বুক।
জ্বলছে শ্বাপদচোখ..

সেদিনও,
চোখে মুখে অন্য আলো,
অন্য লোক পুরো,
চিনতে পারিনি, কেমন যেন...

আবোল তাবোল মূর্খামি

হস্তিমূর্খ

অক্টোবর ১, ২০১৭

মনে আছে তো সেই বিখ্যাত ঠাঁইবদলের কথা ? অসময়ে গান ধরে যে দোষ করে ফেলেছিল বিদেশিরা তারপর রাজার নিদান – "বিদেশী! তা হলে নিয়ম খাটবে না। একবার সকলে ঠাঁই বদল করে নাও, তা হলেই দোষ যাবে কেটে"। অথচ কি মজা দেখুন, সেই বিদেশিরা তো রাজাকে খুশিই করতে চেয়েছিল, কিন্তু কে জানত হিতে বিপরীত হবে। যাকগে, এসব সে রাজরাজড়ার যুগের কথা, আমাদের মত প্রজাদের এসব ভেবে কি লাভ।

এরপরে নিশ্চয় অনেকেই প্রশ্ন করবেন ভেবে যদি সেরকম কোনও লাভই নেই তখন অনর্থক ঢেঁকির সামনে বসে শিবের গাজন ধরেছ কেন হে মূর্খ ? বলেছেন ঠিকই। কিন্তু এত কথা বলার কারণ ঐ দোষ এবং দোষ কাটাতে ঠাঁইবদল। প্রশ্ন উঠে যায় তখন, যখন দেখা যায় সেরকম কোনও দোষ না থাকা সত্ত্বেও ঠাঁইবদল ঘটে। আজ্ঞে হ্যাঁ, বহুদিন হল একটি এইরকম ঠাঁইবদল নিয়ে কথা উঠেছিল, এখনও আড়ালে আবডালে চলছে। যার কেন্দ্রে রয়েছে একটি বই এবং তার পরিসীমা বরাবর বিখ্যাত পিতা-পুত্র। বইটির নাম – আবোল তাবোল। বাকিদের পরিচিতি নিঃসন্দেহে নিষ্প্রয়োজন।

এই ঠাঁইবদল-এর কাহিনীতে প্রবেশ করার আগে যেসব কুশীলবদের সাহায্য পেয়েছি তাদের সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু কথা...

আবোল তাবোল – নব-সংস্করণ ১৩৫১, প্রকাশক সিগনেট প্রেস

জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ সুকুমার সাহিত্যসমগ্র, প্রথম খন্ড – সম্পাদক সত্যজিৎ রায় ও পার্থ বসু, প্রথম সংস্করণ – ১৯৭৩, দ্বিতীয় মুদ্রণ ১৯৯৫, প্রকাশক আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড

আবোল তাবোল প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯শে সেপ্টেম্বর ১৯২৩ তারিখে। খুব স্বাভাবিকভাবেই ইউ রায় অ্যান্ড সন্স এই বইটির প্রকাশক ছিলেন। কিন্তু পরবর্তী সময়ে সুকুমারের মৃত্যুর মাত্র আড়াই বছরের মাথায় এই প্রকাশনা সংস্থার হাতবদল হয় এবং যদ্দূর জানা যায় ১৯৩৮ সাল নাগাদ সেই মালিকানাধীন প্রকাশনা সংস্থা থেকেই এই বইটির ষষ্ঠ তথা খুব সম্ভবত এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়।

এর আরও পাঁচ বছর পরে প্রতিষ্ঠিত হয় সিগনেট প্রেস। প্রতিষ্ঠার এক বছর পরে প্রকাশিত হয় আবোল তাবোল – নব-সংস্করণ। অর্থাৎ লেখকপুত্র তখন তেইশ বছর বর্ষীয় নবীন যুবক। এই বইটির প্রিন্টার্স লাইন থেকে জানা যায় এই বইটির কিছু ছবি সত্যজিৎ রায় এঁকেছিলেন। যদিও বইটি দেখে খুব পরিষ্কার করে বোঝা মুশকিল যে ঠিক কোন ছবি ওঁর আঁকা। সেটা বুঝতে ব্যর্থ হলেও এইটুকু অন্তত বোঝা যায় যে আবোল তাবোল খুব সম্ভবত এই নব-সংস্করণেই প্রথমবার পরিবর্তিত হয় যদিও সেখানে সত্যজিৎ রায়ের কোনও ভূমিকা ছিল কিনা সে বিষয়ে আমার

সংশয় আছে। যেমন ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের আবোল তাবোল না দেখতে পাওয়ার কারণে এটাও অজানা যে এই নব-সংস্করণ কোনও ঠাঁইবদলকে প্রশ্রয় দিয়েছিল কিনা। যদিও সন্দেহ উস্কে দেয় বইটির শুরুতেই "মূল-সংস্করণে যা কিছু ছিলো সবই এ নব-সংস্করণে বর্তমান – অদল-বদল শুধু সজ্জা-বিন্যাসে" (বানান গ্রন্থানুগ) এই স্বীকারোক্তি।

যাই হোক, এবারে আসা যাক দ্বিতীয় ঠাঁইবদলের প্রসঙ্গে (যদি সিগনেট প্রেসের নব-সংস্করণে প্রথম ঠাঁইবদলটি হয়ে থাকে)। এরপর থেকে ১৯৪৪ এবং ১৯৭৩ এইভাবে বইদুটির উল্লেখ করব।

প্রথমেই একটি কথা। ১৯৪৪ সালের বইটিতে দেখা যাচ্ছে একটি কৈফিয়ৎ। "যাহা আজগুবি, যাহা উদ্ভট, যাহা অসম্ভব, তাহাদের লইয়াই এই পুস্তকের কারবার। ইহা খেয়াল রসের বই, সুতরাং সে রস যাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না, এ পুস্তক তাঁহাদের জন্য নহে। গ্রন্থকার" (বানান গ্রন্থানুগ)। গ্রন্থকারকৃত এই কৈফিয়তটি ১৯৭৩ সালে অদৃশ্য। অবশ্য পুরোদস্তুর অদৃশ্য এমন কথা বলা ভুল, এটি প্রথম খন্ডের শেষে পুস্তক পরিচয় অংশে স্থানলাভ করেছে। ঠিক এইভাবেই ১৯৪৪ এবং ১৯৭৩ ছড়াগুলিও এদিক ওদিক। ১৯৪৪ সালে 'গানের গুঁতো' ছয় নম্বর স্থান দখল করলেও ১৯৭৩ সালে আট নম্বরে পিছিয়ে গেছে। একইভাবে 'খুড়োর কল' নড়তে নড়তে সপ্তম স্থানচ্যুত হয়ে দশম স্থানে স্থির হয়েছে। তবে শুধু পিছিয়ে যাওয়া নয়, ভাল ফলও করেছে কেউ কেউ। ১৯৪৪ সালে অষ্টাদশস্থানাধিকারী 'ভাল রে ভাল'-র ঊনত্রিশ বছর পেরিয়ে এসে ষষ্ঠস্থান দখল কিংবা একবিংশস্থান থেকে 'শব্দ-কল্প-দ্রুম'-এর নবম স্থান অধিকার এর উদাহরণ। যদিও সুচীপত্রে 'শব্দ-কল্প দ্রুম'-কে হাইফেনটি ত্যাগ করতে হয়েছে।

অবশ্য এর চেয়েও অনেকবড় বিস্ময় সূচীপত্রে অপেক্ষা করে আছে। ১৯৪৪ সালে তালিকায় মোট সাতচল্লিশটি ছড়ার হদিশ পাওয়া গেলেও ১৯৭৩ সালে একটি কমে এসে ছেচল্লিশটি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে। এমন হওয়ার কারণ কি ?

আমার ব্যক্তিগত ধারণা এই কমে যাওয়ার সাথে ঠাঁইবদলের একটা যোগসূত্র রয়েছে এবং সেই যোগসূত্রের সাথে সাহিত্য ইত্যাদি সম্পর্করহিত। খুব সম্ভবত পাতার হিসেব ঠিক রাখতে এই সংক্ষিপ্তকরণ এবং ঠাঁইবদল। এই অবধি পড়ে অনেকেই, বিশেষত যাঁরা আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত দুটি গ্রন্থে 'আবোল তাবোল' পড়েছেন তাঁরা ভাবতে পারেন তবে কি পুরো 'আবোল তাবোল' পড়া হয়ে ওঠেনি, তাঁদের আশ্বস্ত করার জন্যে বলি – আবোল তাবোল-এর মোট সাতটি ছড়া শিরোনামবিহীন (ঊনত্রিশ বছরের ব্যবধানে এরাও নিজেদের মধ্যে জায়গা বদল করেছে)। এই সাতটি ছড়ার দুটি 'মাসি গো মাসি' এবং 'বলব কি ভাই হুগলি গিয়ে' এই দুটি ছড়া একসাথে 'মাসি গো মাসি' এই শিরোনাম বাহিত হয়ে ১৯৪৪ সালে সূচীপত্রে স্থান পেলেও বইটিতে শিরোনামহীন অবস্থায় প্রকাশিত হয়।

এই সব ঘটনাই ঘটেছে লেখকের মৃত্যুর পঞ্চাশ বছর পূর্ণ হওয়ার আগেই। খুব সম্ভবত ইউ রায় অ্যান্ড সন্সের হাতবদলের পরে রায় পরিবারের কোনও সদস্যের বইয়ের কপিরাইট তাঁদের উত্তরাধিকারদের কাছে ছিল না কারণ এই প্রকাশনা সংস্থা থেকে পরবর্তী সময়ে কেউ কোনো রয়্যালটি পাননি। এটা মেনে নিয়েও প্রশ্ন থেকেই যায় ১৯৩৮ সাল যে বইয়ের শেষ সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে, মাত্র ৩৫ বছরের মধ্যে সেই বই কি এতটাই দুষ্প্রাপ্য হয়ে গেল যে

মূল বইটিকে অক্ষুণ্ণ রাখা কঠিন হয়ে উঠল। অস্বস্তি আরও বাড়ে যখন দেখি সাম্প্রতিককালে একটি প্রকাশনা সংস্থা থেকে মূল বইটি পুনঃপ্রকাশিত হয়েছে।

ঐতিহাসিক দিক দিয়েও আবোল তাবোল একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বই। কারণ এই একটিমাত্র বইয়ের বুকমেকিং সুকুমার করে যেতে পেরেছিলেন। সেই বুক মেকিং কিভাবে হয়েছিল তার সংক্ষিপ্ত বিবরণ, ছড়াগুলি কিভাবে সুকুমার পাল্টে ফেলেছিলেন সে সবই রয়েছে জন্মশতবার্ষিকী সংস্করণ সুকুমার সাহিত্যসমগ্রে, শুধুমাত্র মূল বইটিই ব্যতিক্রম। এই বইটি যে গুরুত্ব, যে সম্মান দাবি করত, সেই গুরুত্ব, সেই সম্মান আনন্দ পাবলিশার্স প্রকাশিত দুটি সমগ্রে (একটি শিশুসাহিত্য, অন্যটি সাহিত্যসমগ্র) অন্তত অনুপস্থিত।

তো, এই হল অবস্থা। যদিও এ অবস্থাতেও 'আবোল তাবোল' একই রকম সুস্বাদু রয়ে গেছে। গ্রন্থকার তো বলেই দিয়েছেন ‘খেয়াল রসের বই’। খেয়াল রস নিয়ম মেনে চললেই তো বরং বিপদ। তবু একটা কথা বলতেই হচ্ছে। যতদিন ১৯৪৪ সালের বইটি চোখের বাইরে ছিল তার অস্তিত্ব সম্বন্ধে অজ্ঞাত ছিলাম, ততদিন মনটা বেশ ফুরফুরে ছিল, কিন্তু দুটি রঙে মুদ্রিত এই বইটি দেখে প্রিয় গায়কের দুটি লাইন বারেবারেই গুনগুনিয়ে উঠছি

“কখনও সময় আসে, জীবন মুচকি হাসে, ঠিক যেন পড়ে পাওয়া চোদ্দ আনা”

ওহ, বলতে ভুলে গেছি – ১৯৪৪ সালে সুকুমারের আরও দুটি বইয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল – একটি বহুরূপী, দাম এক টাকা বারো আনা, অন্যটি ঝালাপালা, দাম দু’টাকা। এবারে যে বইটি পড়ে এত কথা মনে এল তার দাম – একটু বেশিই – দু টাকা বারো আনা।

জন্মদিন

দৃপ্ত বর্মন রায়

অক্টোবর ১৭, ২০১৭

স্যুইং ডোরটা ঠেলে গড়িয়া থানার সাব ইনস্পেক্টর, পাঁচ ফুট এগার ইঞ্চি লম্বা দোহারা চেহারার মলয় দাশ ঘরে ঢুকে ইনস্পেক্টর অম্লান রায়ের টেবিলের সামনে এসে একটা স্যালুট ঠুকে বললেন, "মলয় দাশ রিপোর্টিং, স্যার।"

অম্লান রায় সবে মিনিট পনের হল এসেছিলেন। একটা স্মার্টফোনে ক্যান্ডি ক্রাশ খেলছিলেন। ডাক শুনে মলয়ের দিকে মুখ তুলে চাইলেন। টেবিলের উল্টোদিকে একটা চেয়ার টেনে বসে মলয় হাতে ধরা কাগজটা অম্লানের দিকে এগিয়ে দিয়ে বললেন, "আজকের ক্রাইম রিপোর্টটা, স্যার। আপনার একটা সাইন লাগবে।"

গম্ভীরভাবে মলয়ের কাছ থেকে কাগজটা নিয়ে কি লেখা আছে না পড়েই সামনের পেন-স্ট্যান্ডটা থেকে একটা পেন তুলে নিয়ে পাতাটার নিচের দিকে গোটা গোটা করে নিজের নামটা লিখে দিলেন অম্লান।

মলয়ের পেছন পেছন ঘরে ঢুকেছিলেন হেড কনস্টেবল বছর পঞ্চান্নর বিশ্বজিৎ সামন্ত। সই করা শেষ হলে অম্লানের সামনে এসে বললেন, "স্যার, আপনাকে একবার একটু কষ্ট করে পাশের ঘরে আসতে হবে। একটু দরকার ছিল।"

ঢলঢলে ইউনিফর্মটা একটু টেনেটুনে ঠিক করে নিয়ে মলয় আর বিশ্বজিতের সাথে পাশের ঘরে এসে অম্লান দেখলেন ঘরটা লাল সাদা বেলুন দিয়ে সাজানো। টেবিলের ওপর একটা ব্ল্যাক ফরেস্ট কেক রাখা, তাতে লেখা 'হ্যাপি বার্থ ডে টু অম্লান রায়।' পাশে একটা প্লাস্টিকের ছুরি আর বয়স নির্দেশ করা একটা জ্বলন্ত মোমবাতি। থানার ছোট বড় র‍্যাঙ্কের সব পুলিশরা এসে ঘরটায় জমায়েত হয়েছে।

মলয়ের সাথে অম্লান এসে দাঁড়ালেন কেকটার সামনে। বিশ্বজিতের ইশারায় ভিড়ের মধ্য থেকে কনস্টেবল নিরঞ্জন আর তার স্ত্রী কল্পনা এগিয়ে গিয়ে জড়সড় হয়ে দাঁড়ালেন অম্লানের দুই পাশে।

মলয় ছুরিটা অম্লানের হাতে ধরিয়ে দিয়ে বললেন, "কেকটা কাটুন, স্যার।" সবার সমবেত 'হ্যাপি বার্থ ডে' গানের মধ্যে এক ফুঁয়ে মোমবাতিটা নিভিয়ে কেকটা কাটলেন অম্লান। ঘরে উপস্থিত প্রত্যেকে হাততালি দিল। কেউ কেউ আবার মোবাইলে ফটো বা ভিডিও তুলল পুরো ঘটনাটার। সবাই আনন্দ করলেও নিরঞ্জনের চোখের কোনায় জল চিকচিক করছিল, কল্পনার চোখ আঁচল দিয়ে ঢাকা।

আর গত কয়েকমাস ধরে ক্রমাগত কেমোথেরাপি নিতে নিতে রুগ্ন, ক্লান্ত অম্লানের মুখে তখন এক অপার্থিব আনন্দ। চোখদুটোয় ইচ্ছাপূরণের এক অপূর্ব দ্যুতি, মুখে বিজয়ীর হাসি।

সাত বছরের সংক্ষিপ্ত জীবনে তার খুব ইচ্ছে ছিল বড় হয়ে বাবা নিরঞ্জনের মত পুলিশ হবার। দুরারোগ্য ক্যান্সার তাকে সেই সুযোগ না দিলেও, যাতে সে জীবনের বাকি হাতে গোনা কয়েকটা দিন মনে আনন্দ নিয়ে কাটাতে পারে,

সেই জন্যে তার বাবার সহকর্মী পুলিশ কাকুরা সম্ভবতঃ তার জীবনের শেষ জন্মদিনটায় তাকে একদিনের পুলিশ ইনস্পেক্টর বানিয়ে তার সেই ইচ্ছা আজ পূর্ণ করে দিয়েছে।

নিকানো উঠোনে ঝরে রোদ

যদুবাবু

ডিসেম্বর ৬, ২০১৬

বিধিসম্মত সতর্কীকরণঃ এই গল্পের সমস্ত ঘটনা কাল্পনিক, মনগড়া, আজগুবি এটসেটেরা। আসলে বাংলা মিডিয়ামের ছেলেরা আদৌ আমার মতন ল্যাদাভ্যারুস না, বরং অনেক স্মার্ট হয় ! কাউকে কাউকে দেখে, সত্যি বলছি, একচুলও বোঝা যায় না ! ঠিক তেমনি এটা যদিও তর্কের খাতিরে মেনেও নিই যে সব ট্যাঁশই ইংলিশ মিডিয়াম, আপনাকে-আমাকে আর মদন-মামাকে মানতেই হবে যে সব ইংলিশ মিডিয়াম-ই ট্যাঁশ নয়!

আর না মোটেও লজ্জা-টজ্জা পাই না, বরং বিশ্বাস করি বাংলাভাষা আমার উত্তরাধিকার, অস্বস্তিকর জন্মদাগ নয় – তবে আলিমুদ্দিনও একদিনে 'জাঙ্গিয়া পড়েনি, আর কথাঞ্জলিও রাতারাতি লেখা হয়নি ! বাইরে যখন বৃষ্টি ছিলো, তখন অনেক পাতা এদিক ওদিক গাছ-গাছালি, কুট-কচালি, বাপের খ্যাদানি আর প্রেমের প্যাঁদানিতে ভরিয়েছিলাম আমরা ! জলে ভিজে, উইয়ে ধরে সব নষ্ট হয়ে যাওয়ার আগে দেখি যদি একটুও উদ্ধার করা যায় – এই শীতের মিঠেকড়া রোদ্দুরে আচারের বয়ামের পাশে অমনি কয়েকটা পাতা ! যেরকম পেলাম তেমনি রেখে দিলাম পাশাপাশি, কেমন?

তেরশত নদী শুধায় আমাকে, কোথা থেকে তুমি এলে ?
আমি তো এসেছি চর্যাপদের অক্ষরগুলো থেকে ...

তো সেটা কত সাল আমার মনে নেই, এটা মনে আছে যে কৃষ্ণমাচারি শ্রীকান্ত তখন ওপেন করতেন আর ক্যামন নাক-ফাক কুঁচকে এদিক-উদিক চার-ছয় হাঁকাতেন। এইসময়েই একদিন আমার বাবা এসে থার্ড আম্পায়ারের মতন আউট ঘোষণা করে জিজ্ঞেস করলেন, "সারাদিন যে হাঁ করে টিভি গিলছো, কি হবে বড় হয়ে?" আমিও সপাটে স্টেপ আউট করে বললাম, "ওই যে শ্রীকান্ত"! বাবা গম্ভীর গলায় বললেন, 'ম্যান অব দ্য ম্যাচের ইন্টারভিউটা দেখেছো? কির'ম সুন্দর ইংরেজি বলছে? পারবে?' আমি বিপদ বুঝে বললাম, 'ঠিকাছে, তা'লে কপিল দেব' ... বাবা কিয়ৎকাল রণে ভঙ্গ দিলেন বটে, কিন্তু আমি বুঝলাম সত্যি ঘোর বিপদ ... নিশীথস্যার বেত হাতে যে বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন শুরু করেছেন, এ জীবনে তা বোধকরি আর ঘোচার নয় !

এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, আমার বাবা নেহাৎ দিনে রেলে চাকরি আর রাতে ব্রাইয়োনিয়া-বেলাডোনা করে ইহজীবন কাটিয়ে দিলেন বটে, আসলে কিন্তু ওনার মধ্যে হাল্কা করে একটা ত্রিকালজ্ঞ ব্যাপার ছিলো, অন্ততঃ আমাকে নিয়ে – যখন যা ভয় পেতেন, মাস খানেকের মধ্যে 'ফলিবেই ফলিবে' !

এবারেও তার ব্যত্যয় হলো না ! নিশীথদা একগাদা ট্রান্সলেশান দিলেন পরীক্ষায়, আর আমিও তো বাংলার বাঘ ! কোশ্চেন দিলো, 'আমি রোজ ভাত খাই', আমি ভেবে দেখলাম eat বললে তো খাই মনেই হয়, কিন্তু এই যে আমি রোজ রোজ শুধুই ভাত-ই খাই, রোজ ম্যাগি নয়, রোজ বিরিয়ানি নয়, যেন অনন্তকাল ধরে সিসিফাসের পাথর তোলার

মতন প্রতিবাদ না করে শুধুই ভাত-ই খেয়ে যাচ্ছি, সেটা কি শুধু eat বললে মেটে? নাঃ ! দীর্ঘশ্বাস ফেলে লিখে দিলাম 'I eats rice'!

খাতা বেরুলো যেদিন, দেখি ভদ্রলোক সবার উপরে আমারটা নিয়ে এসেছেন, ক্লাসে পড়ে শোনাবেন বলে ... পাক্কা পনেরো মিনিট নিশীথদা আর সেকশান-ডি হ্যাহ্যা করে হাসলো, আমিও মনে মনে বেশ পুলক অনুভব করলাম, কিন্তু বাড়ি ফিরে দেখি আবহাওয়া থমথমে, বাবার হাতে একটা লাল বই, রেন অ্যান্ড মার্টিন, আর চেয়ারে একজন পুরুষ্টু গোঁফওয়ালা নতুন মাস্টারমশাই !

মাস্টারমশাইয়ের জেদ ছিলো সাংঘাতিক, আমাকে তিনি দেখলেন যেন অমল দত্ত দেখছেন রেলিগেশানের মুখে মোহনবাগান ! কি-ই না করতেন, মাঝে মাঝে ইংরেজি কাগজ ঠুসে বলতেন পড়ে যাও একপাতা, আমিও নিকুচি করেছে বলে প্যারা-ফ্যারা উড়িয়ে কংগ্রেস-ডায়ানা-হাওয়ালা-আজহার সব একসাথে পড়ে যেতাম! মাঝে মাঝে পাশে তাকিয়ে দেখতাম দিদি হাসি চাপতে ইতিহাসের বইতে মুখ লুকোচ্ছে আর বাবার ভ্রূ শুয়োঁপোকা থেকে শুয়োঁপোকা-তর হচ্ছে ক্রমশঃ ...

রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলেছিলো বহুদিন, এবং কবে কি করে যে সেই মাস্টারমশাই শেষমেশ রণে ভঙ্গ দিয়ে পালালেন তা আর মনে নেই এক্কেবারেই, তবে শাপে বর হলো সত্যি – যাঁকে পেলাম, তাঁকে ইংরেজির টিচার বলা মানে রবীন্দ্রনাথকে ট্রাফিক পুলিশ বলা ! তিনি দেখলেন একে দিয়ে গ্রামার-ট্রামার হবে না, এর পাস্ট অতিশয় ইনডেফিনিট, ফিউচার ততোধিক টেন্স ! হাতে ধরিয়ে দিলেন দুটি বই, অস্কার ওয়াইল্ডের পিকচার অব ডোরিয়ান গ্রে আর টি এস ইলিয়টের কবিতাগুচ্ছ! ইংরেজি একফোঁটা বলতে বা দু-কলম লিখতে না পারলেও যে দিব্যি পড়ে মুগ্ধ হওয়া যায় ... সেটা সেই জানলাম !

বছর দেখতে দেখতে ঘুরে যায়, নরেন্দ্রপুরে ঢুকে দেখলাম, সব বই ইংরেজি হয়ে গেছে – ভয়ানক চাপ ! শুধু কেকুলের সাপ বুঝলে চলবে না, সে সাপ ছোটে না কি হাঁটে না, অন্ততঃ বাংলায় চাটে না ... একবার কেমিস্ট্রির ল্যাবে কি কান্ড, ঢুকে দেখি সারি সারি শিশিবোতল – গায়ে বড় বড় করে লেখা INFLAMMABLE ! এদিকে তো রেন অ্যান্ড মার্টিন গাঁতিয়েছি, in মানেই নঞর্থক ! এই যেমন ধরুন ঃ

incapable – আমার মতন অপদার্থ,

inaudible – মিনমিনিয়ে কতা কয়, কেউ শুনতে পায় না,

incurable – যা সারে না, শাহ্রুখখানের তোতলামো, আর আমার ক্যাবলামো,

invisible – যা দেখা যায় না, গাঙ্গুলীর কভার ড্রাইভ !

infallible – যা একবার উঠলে আর পড়ে না (এটার উপমা আর দিলাম না) ...

তো আমিও মনের আনন্দে ঠাউরে নিয়েছি, ইনফ্লেমেবল নিশ্চয়ই হিন্দু আত্মার মতন অদাহ্য – অক্লেদ্য কিছু একটা হবে, আমিও এটাসেটামিক্স করবো বলে দুটো বোতল হাতে নিয়ে পিছন ফিরেছি – দেখি দীনবন্ধু স্যার ভয়ার্ত দৃষ্টি নিয়ে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে !

এইবেলাই বুঝলাম, জানেন, যে জীবনে এমন কিছু পড়াই ভালো, যেখানে খুব বেশি ইঞ্জিরি না মাড়িয়ে পাতার পর গ্রীক লেটার আর চাউমিন সিম্বল দিয়ে ভরিয়ে দিলেও দিব্যি চলে যাবে ... টুক করে স্ট্যাটে চলে এলাম ... আই-এস-আই-তে বছর পাঁচেক আমার ইংরেজি ওই পিসি-র অমর কবিতার মতন, "তোমার নাম? হ্যালো হাই / বাবার নাম? সি ইউ বাই!"

তখন বাংলা শুধুই রন্ধ্রে নয়, রক্তেও ! এক রোববার GRE দিয়েই ছুটতে ছুটতে আমি আর পানু চলে গেলাম খালাসিটোলায় ! হাফ ওপেন স্কাই ছাদের তলায় স্কুলবেঞ্চ পাতা, একদিকে বাংলা বিক্রি হচ্ছে ঢেলে, একদিকে মাছভাজা-আলুকাবলি, আর খালি বোতল ফেরৎ দিলে তিন টাকা সাতাত্তর পয়সা ! সে অন্ধকারে মাটির ভাঁড়ে প্রেম-অপ্রেম যেন গলে জল হয়ে এলো ! এক চুমুক দিয়েই দেখলাম বিকেলের আকাশে সবকটা মুখ মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলো – হঠাৎ পানু বললে, ভেবে দ্যাখ জেডি, কমল্কুমার ক্লাসের ফাঁকে এসে এক পাত্তর ঢেলে গলা ভিজিয়ে নিচ্ছেন এককোণে, বা হয়তো তুষার রায় সদ্য লেখা কবিতাটা শোনাচ্ছেন শক্তি-সুনীলদের ! ফেরার সময় মনে আছে, ট্যাক্সিকাকুকে কিছুতেই মনে করে বলতে পারছি না কোথায় নামতে চাই, পানু অনেক কষ্টে বললো, নর্থ ক্যালকাটা!

জীবনটা চলে যাচ্ছিলো, দিব্যি চলেই যেতো, পাঁচ বছর যে আসলে ইনফিনিটি নয় সেটা কেউ বললেও বিশ্বাস করতাম না - কিন্তু তাও, কলকাতা থেকে মুম্বাই, মুম্বাই থেকে আবার পালাতে পালাতে অর্ধেক পৃথিবী দূরে, দিন-রাতের অন্যদিকটায় !

'পড়ে রইলো যে, পড়েই থাকতো ... সে লেখা তুলবে বলে,

কবি ডুবে মরে, কবি ভেসে যায় অলকানন্দা জলে ...'

বলেছিলাম এখন লজ্জা পাই না, তখন কিন্তু খুব হতো ... খু-উ-ব, বলে আর শেষ হওয়ার নয় সে গপ্পো ঃ একদিন সাবওয়ের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে বলেই যাচ্ছি বাবা দুটো পেয়াঁজ আর লঙ্কা দে, ব্যাটা হাঁ করে তাকিয়ে আছে যেন অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শন করছে ... আরেকদিন আবার হলে ঢুকে সবাইকে জিজ্ঞেস করছি ভাই লিফটটা কোনদিকে, তারা এমন ভাব করছে যেন আপনি শ্যালদা স্টেশানে পক্ষীরাজ ঘোড়া খুঁজতে বেরিয়েছেন ... অনেক কষ্টে একদিন ঘন্টা দেড়েক

ধস্তাধস্তি করে এক ব্যাটাকে বানান করে বোঝালাম যে আমার জীবন ইন্টারনেট ছাড়া অচল, সে পরেরদিন দরজায় প্যাকেট রেখে পালিয়ে গেলো, উপরে নাম লেখা 'Jyoeis Daha' ..

তারপর তো কত-কত-দিন গড়িয়ে গেছে, দিকে দিগন্তরে বক্তিমে দিয়েছি, ছাত্রদের বুঝিয়েছি কোরিলেশান আসলে কজেশান নয়, কিন্তু ভেতরে ভেতরে একটা দুরুদুরু যায়নি পুরোপুরি – সেই প্রথমবার যখন আইনক্সে অ্যানাকোন্ডা দেখতে ঢুকে বুঝেছিলাম হলের সিনেমায় শালারা সাবটাইটেল দেয় না, আর নিতান্ত বাধ্য হয়েই শুধু লোপেজ দিদিকে দেখেই ফিরে এসেছিলাম – সেরকম অনেকটা ! এখনও আগে পুরো বাক্যটা মনে ভেবে নিই, তারপর ভাবি নিশীথস্যার ক্যালাবে, তারপর ট্রান্সলেট করি, একটু হি-শি-হ্যাজ-হ্যাভ দেখে টেখে নিয়ে বলি – ভুল্টুলও কমে, লোকেও নির্ঘাৎ একটা গ্রাম্ভারি গেছোদাদা টাইপের কিছু একটা ভেবে নেয় !!

তবে হারাতে হারাতেও, ভেসে যেতে যেতেও, শ্যাওলা-খড়কুটো ধরে কি করে যেন একটু সেই খালাসিটোলার সন্ধ্যেটা রয়ে গেছে গ্লাসের তলায় লেগে ! অঙ্ক-টঙ্ক যেদিন নামে না, বা যেদিন খুব ইচ্ছে করে দাঁড়ে বসে ডানা ঝাপটাতে, সেদিন খাতা খুলে একটা বাতি জ্বালিয়ে বসি ... এক বন্ধুর দেওয়া ফাউন্টেন পেনটা যত্ন করে পরিষ্কার করে কালি ভরে একটু লিখি একটা সাদা পাতায় ... হয়তো একটা প্রিয় শব্দ, একটা আদরের নাম ... একটা চেনা কবিতা মাথায় আসে, গুনগুন করে,

' তবু সে এখনও মুখ

দেখে চমকায়

এখনও সে মাটি পেলে

প্রতিমা বানায়'

আস্তে আস্তে জটগুলো ছেড়ে যায় তখন ! এই বন্ধ পড়ার ঘরের ঘুলঘুলি আর আনাচ কানাচ দিয়ে কি করে যেন ক্যাট-ব্যাট-ডগ-ফিশ পেরিয়ে ঢুকে পড়ে একরাশ বাংলা ভাষা ! পরম মমতায় আমার হাতের আঙ্গুল ছুঁয়ে থাকে সে ... আমি আবার স্বপ্ন দেখি !

বিহঙ্গ, ওরে

অতিথি লেখক

নভেম্বর ২, ২০১৭

এই পর্বে লিখছেন শুভময় দাস। আইআইটি কানপুরে জৈবরসায়নের গবেষক, পিএইচডি শেষ করে পেশাদার জীবনে পা রাখার মুখে। ফোটোগ্রাফি, লেখালিখি এবং দেশ বিদেশের মিউজিক শোনার শখ রয়েছে প্রবল।

নগরদ্বার খুলেছ ফের তুমি পালিকা

নিজ দেহ-অবয়ব সাজিয়ে — অঙ্গ যেন

তার বিহঙ্গসদৃশ, আংশিক চোখে পড়ে,

ধূমকেতু হতে ঢেউ নিবিড় আলোকবর্তিকা

জানে সবাই কোন পথে শরীর ভাঙে — জানেনি

কেবল উচাটন মন কেমন পরকীয়ায় মজে।

বিন্দুগামী যে ভালবাসা

বছর-কাল ভুলে চলেছে তির্যক বকেদের নিয়ে

সান্ধ্যকালীন আলোক ঊষরতা সন্ধানে — কতকটা তার

বেদনা নিমগ্ন রক্তিম ডানা পিঞ্জর কাতর বক্ষ

সাম্পান শেষে স্পর্শ-সূচক ধ্বনি তুলে

পুনরায় ডুবে যায় হিমশৈলের গর্ভদেশে,

যেমন অবিভক্ত গল্প-গাছা অব্যক্ত থাকে প্রায়শই

সে ভালগাছ কবেই মুড়িয়েছে, আমাদের আর বেশি

আশা নেই সে পথে, বরং যা কিছু এখনো

সূর্যস্নাত অম্লান — তেমন কিছু দুঃখ আর রক্তিম অন্ধকার —

রাংতায় মুড়ে বুড়ো অশ্বত্থ গাছটার পেটের ভিতর

সেঁধিয়ে যাওয়া যেত — তারপর সেই কবে নীলপাখি
খোঁজ নিয়ে উড়ে যেত দূরদেশে নগরে পালিকাবাজারে
যেখানে নীলকণ্ঠ এখন শুশ্রূষা পেয়ে আকণ্ঠ মদে ডুবে
বিলুপ্ত কোন নক্ষত্রমালার সন্ধানে বীতকাম – হৃদয়ের
গোপন গহীন গহ্বরে পরম নির্ভরতায় চুপিসাড়ে একদিন
তাকে দিয়েছিল বুঝি কোন নাম – পীতবাস সে ঘুমঘোরে
জড়িয়ে নিয়েছিল, মরণ এসে সেই বাস বুকের ভাঁজে রেখে
ধীর পায় ফেলেছিল নিঃশ্বাস

এরপর বিহঙ্গের মতো যখন সে জলাভূমি ছেড়ে উড়ে গেছে
উপেক্ষিত মানুষের ভিড়ে মিশে গেছে পালিকাবাজারে
পালিকার দেহে মননে জঙ্ঘায় বহ্নিতে — মোহমুগ্ধ অনেক
শরীরের ভিড়ে — একদণ্ড বোঝেনি হায়
কোথা হতে এসেছিল সে প্রত্যয় — অটুট এক নিঃশব্দ
যার ভিজে চুল ছড়ানো নদী থেকে মোহনায় বন্দরে
উদ্বাস্তু ক্যাম্পের পাঁজরে
আরো আছে, খোঁজ নিলে জানা যেত, যারা এখনও চড়েনি
নিলামে, এমনসব মনুরূপী শব খোসা ছাড়ালেই
এক অপার্থিব উজ্জ্বলতা ছড়িয়ে পড়ে — পালিকাবাজারে
কোলাহলে শোনা গেছে তারাও নাকি রুগ্ন
দর্শনাবিষ্ট বিহঙ্গ ভৃত্য-প্রতিভূ আরোপিত সমাধানে।

নিশীথ-উত্তর রাশিফল দেখে একরাশ ঘুম হাতে

আমাদেরও যাত্রা সেই পালিকাভিমুখে, ভিতরে ভিতরে

কেবল চাপান-উতোর চলতেই থাকে —

‘নগরদ্বার কখন বোজে’?

দিদার দুই রেসিপি

শ্রীরূপা

অক্টোবর ২৯, ২০১৭

আমার মা সব কথাতেই বলে রান্নাটা নাকি জিনের ব্যাপার। জিন কি ভূত কি জিনি তা বলতে পারব না, তবে একথা সত্যি বটে আমার দিদা এবং মা-র হাতের রান্নার জুরি মেলা ভার। ছোটবেলায় যখন সবাই আমাকে জিজ্ঞাসা করত, আমার প্রিয় খাবার কি, চোখ বন্ধ করে এক বাক্যে বলতাম, দিদার হাতের যেকোন রান্না। দিদার হাতেরই একটা অদ্ভুত গুণ ছিল। শুকনো লঙ্কা ভাজার তেল, মুড়ি, পিঁয়াজ দিয়ে পান্তাভাত মাখা থেকে কচু বেগুন দিয়ে ইলিশ মাছের ঝাল – সবকিছুই আমার কাছে ছিল অমৃত সমান। দিদা দুবছর হল চলে গেছে, কিন্তু মায়ের কথায় ঐ জিনের জন্যেই হয়ত তার রান্নার সিকিভাগ গুণ আমার মধ্যেও এসে পৌঁছেছে। নতুন রান্না যাইই করি না কেন সাবেকি রান্নার নিয়ম কানুন দিদা দিদিমণির অনুসরণে না করা ছাড়া গতি নেই। যেটুকু পারি, যেটুকু করি, যেটুকু শিখেছি সবই মা-র থেকে। আর মা শিখেছে দিদার থেকে। তাই সাবেকি রান্না করার জন্য, ঐ স্বাদ আবার ফিরে পাওয়ার জন্য দিদার রন্ধন প্রণালীই শেষ কথা।

আজ যে দুটো রান্না সবার সাথে ভাগ করব, বলাই বাহুল্য সে দুটো ভায়া মা, দিদার থেকেই শেখা। হাতেকলমে কোনদিনও শেখার সুযোগ পাইনি, মায়ের মুখে শুনে আর মুখে লেগে থাকা সেই স্বাদের অনুসরণেই হঠাৎ করেই বানিয়ে ফেলেছিলাম এই দুই পদ।

কচুর শাক ঝাল

আমার দিদা নিজের মতন করে কচুর শাক রান্না করতো । এত্তো ভালো খেতে হতো যে বলে বোঝাতে পারব না ।

রান্নার যে বাঙাল ঘটি বলে কিছু হয় না তা দিদার রান্না খেয়েই বুঝতাম । বলাই বাহুল্য মা-ও একইরকম অসাধারণ করে ঐ রান্নাটা । আমি কেমন করি ঠিক জানিনা তবে দেখি বাড়ির সবাই তৃপ্তি করে খাচ্ছে, এটুকুতেই আমার পরিতৃপ্তি ।

টুকটাক যা লাগবে -

(i) কচুর শাক (এক আটি বা একটি গাছ)
(ii) কালো সরষে (ছোট এক চামচ)
(iii) রাই সরষে মানে সাদা সরষে (ছোট এক চামচ)
(iv) পোস্তো (ছোট দুই চামচ)
(v) আদা বাটা (ছোট চামচের অর্দ্ধেক)
(vi) রসুন (এক কোয়া)
(vii) কাঁচালঙ্কা (১টা চাইলে বেশি দিতেই পারেন)
(viii) চেরা কাঁচালঙ্কা (২-৩ টে)
(ix) সরষের তেল
(x) পাতিলেবু (৪-৫ টুকরো বা একটা গোটা)
(xi) নুন
(xii) চিনি
(xiii) কালো জিরে (ছোট এক চামচ)
(xiv) জিরে (হাফ ছোট চামচ)
(xv) নারকোল কোরা (২ চামচ)

রান্না শুরুঃ

কচুর শাকের গা ছাড়িয়ে, টুকরো করে, ধুয়ে জল ঝরিয়ে, কড়ায় সেদ্ধ হতে দিতে হবে। শাকটা কড়ায় দিয়ে, একটু নুন দিয়ে, একটা চাপা দিয়ে মিনিট ৪-৫ রাখলেই শাক সেদ্ধ হয়ে যাবে। একটা ঝাঁঝরি তে ঢেলে, শাকের extra জল টা চাপ দিয়ে বার করে দিতে হবে।

এবার বেশ খানিকটা সরষের তেল গরম করে, তাতে কালোজিরে ফোড়ন দিয়ে একটু ভেজে শাকটা দিতে হবে। একটু নাড়াচাড়া করে পরিমাণ মতন নুন, মিষ্টি (সামান্য taste balance এর জন্য) লেবুর রস দিয়ে ভাজতে হবে।

সরষে, রাই সরষে, পোস্ত, আদা, জিরে, রসুন, কাঁচা লঙ্কা একসাথে বেটে রাখতে হবে।

শাক একটু ভাজা হলে ঐ বাটনা আর চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে, মিশিয়ে, কষিয়ে, তেল ছেড়ে আসলে ওপরে নারকোল কোরা ছড়িয়ে দিলেই, কচুর শাক ঝাল, গরম ভাতের পাতে দোসর হওয়ার জন্য রেডি।

বিঃ দ্রঃ

(i) কচুর শাকে ভীষণ হাত কুট কুট করে তাই যতটা কম পারবেন হাত ব্যবহার করবেন। শাক কুটে ঝাঁঝরিতে রেখে জলে তলায় রেখে ধুয়ে দিন, ঝাঁঝরি ধরে শাক কড়ায় ঢেলে দিন। একটি হাতার উল্টো দিক দিয়ে চেপে সেদ্ধ কচুর শাকের extra জল বের করুন।
(ii) যদি হাত কুটকুট করে, লেবুর রস বা টক জাতীয় কিছু হাতে মেখে নিন।
(iii) অনেকে কচুর শাকে চিনি দেন না। চাইলে নাও দিতে পারেন।
(iv) কচুর শাক কাঁচা অবস্থায় অনেক বেশি মনে হয় .কিন্তু রান্না হলে অনেকটা কমে যায় তাই নুনের পরিমাণ বুঝে দেবেন। আর নিজের পরিবারের জন্য কতটা পরিমাণ রান্না করবেন সেটাও খেয়াল রাখবেন।

পুঁই পিঁয়াজ পোস্ত

খুব সহজে চটপট হয়ে যায় অথচ রান্নার স্বাদও হয় অপূর্ব – এই ম্যাজিক বোধহয় মা-দিদার রেসিপিতেই সম্ভব। চিরপরিচিত পুঁইশাক দিয়ে সেরকমই এক ভিন্ন স্বাদের রান্না পুঁই পিঁয়াজ পোস্ত।

টুকটাক যা লাগবেঃ

(i) ছোট করে কাটা পুঁইশাক (একটা বড় গাছ, ছোট করে কাটলে বর জামবাটির এক বাটি)
(ii) কুচনো পিঁয়াজ (২টো বড়)

(iii) পোস্ত বাটা (৪ বড় চামচ)
(iv) পাঁচফোড়ন (১ বড় চামচ)
(v) সরষের তেল (৩ বড় চামচ)
(vi) নুন (স্বাদমতন)
(vii) চিনি (স্বাদমতন)
(viii) চেরা কাঁচালঙ্কা (২টো)
(ix) শুকনো লঙ্কা (১টা)

রান্না শুরুঃ

কড়ার মধ্যে সরষের তেল গরম করে পাঁচফোড়ন, শুকনো লঙ্কা দিয়ে একটু নড়াচড়া করে পিঁয়াজ কুচনো যোগ করতে হবে। পিঁয়াজ ভাজা হলে একটা জায়গায় তুলে রেখে ঐ তেলেই পুঁইশাকটা দিয়ে তার মধ্যে নুন ও চিনি দিয়ে নাড়া চাড়া করে ঢিম আঁচে চাপা দিয়ে রাখত হবে মিনিট ১৫-২০ মত যাতে শাক এবং ডাঁটা নরম হয়ে যায়। যদি ১৫ মিনিট পরও নরম না হয় তাহলে আরো কিছু সময় একই ভাবে রাখতে হবে। শাক এবং ডাঁটা সেদ্ধ হয়ে গেলে ওর মধ্যে পোস্ত আর এগে ভেজে তুলে রাখা পিঁয়াজ মিশিয়ে দিতে হবে। পুঁই, পোস্ত, পিঁয়াজ ভালোভাবে মিশে গিয়ে জল পুরোপুরি শুকিয়ে গেলে চেরা কাঁচালঙ্কা দিয়ে নেড়েচেড়ে ভাজা ভাজা করে নামিয়ে নিলেই তৈরী "পুঁই পিঁয়াজ পোস্ত"।

বিঃ দ্রঃ

(i) পুঁইশাকের ডাঁটাগুলো দিয়ে ভালো করে গা ছাড়িয়ে, মাঝখান থেকে দুই টুকরো করে দেবেন। এতে ডাঁটা তাড়াতাড়ি সেদ্ধ হবে।
(ii) এই পদটায় হালকা একটা মিষ্টি স্বাদ ভালো লাগে। তবে অনেকে পোস্তয় মিষ্টি মোটেই পছন্দ করেন না। তাঁরা চিনি ছাড়াই করতে পারেন। শুধুমাত্র পিঁয়াজ ভাজার সময় এক চিমটে দেবেন। এতে পিঁয়াজ ভাজার রং ভালো হয়।
(iii) "পুঁই পিঁয়াজ পোস্ত" গরম ভাতে সবচেয়ে ভালো জমে।

মিমিক্রি

যদুবাবু

অক্টোবর ২২, ২০১৭

স্টেজে ওঠার সময় একবার টুক করে পকেট থেকে একটা লজেন্স বের করে মুখে দিলো সুমন, একটা জলের বোতল সঙ্গে থাকে, তা-ও গলাটা আর্দ্র না থাকলে পারফরম্যান্সে তার ছাপ টের পাওয়া যায়। এটা অবিশ্যি একটা দক্ষিণ কলকাতার মাঝারি সাইজের একটা বার – শুক্রবার সন্ধ্যে তাই এই সন্ধ্যে সাতটাতেই বেশ লোক হয়েছে। অবশ্য সবাই যে সুমনের স্ট্যান্ড-আপ কমেডির ফার্স্ট শো শুনতে এসেছে তা নয়, অনেকেই দূরে দূরে বসেছে, আর্ধেক উৎসাহ আর আর্ধেক বিরক্তি নিয়ে – তবে স্টেজের সামনে বেশ কয়েকটা চেনামুখ, পুরনো বন্ধুবান্ধব – অফিস কলিগ, উৎসুক হয়ে অপেক্ষা করছে।

সত্যি বলতে এই জনা-কয়েক ফ্যানদের উপর ভরসা করেই পাকা চাকরিটা দুম করে ছেড়ে দেওয়ার কথা ভাবছে সুমন । তার সেন্স অব হিউমার মোটামুটি ভালোই, সামান্য কথাকে ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে 'পান' করার অভ্যেসটাও এক্কেবারে ছোট্টবেলার থেকেই আছে, তবে তার আসল দক্ষতা লোকের গলা এবং আদব-কায়দা অর্থাৎ ম্যানারিজম নকল করা। ইস্কুল-কলেজে পড়ার সময় টিফিন বা ক্লাসের মাঝখানে বন্ধুরা ঘিরে ধরতো, 'একবার এস্কেজি-টু করে দ্যাখা, একবার হেডু যে মর্নিং প্রেয়ারে লেকচারটা দেয় সেটা কর !' ... কলেজে বেঞ্চের উপর বসেও একের পর এক প্রোফেসারদের নকল করে দেখাতো, একজন 'স'-কে 'শ'-বলতেন, একজন ছিলেন গায়ক, তার গম্ভীর ব্যারিটোন নকল করে 'আলফা-বেইটা-গ্যামা' বললেই হেসে গড়িয়ে পড়তো বন্ধুরা ... একটু নকল, আর একটু কল্পনা করে আজগুবি কিছু কথা জুড়ে দিলেই হলো ! সমস্ত পার্টির মধ্যমণি হয়ে থাকতে, আর লোককে এই প্রাণখোলা হাসি হাসাতে সে-ও কম উপভোগ করতো না ...

চাকরি ছেড়ে দেওয়ার আইডিয়াটাও এইভাবেই এলো ! মাস ছয়েক আগের কথা, অফিসের রিট্রিট হচ্ছে এক চা-বাগানের এস্টেটে ! শেষদিন খাওয়া-দাওয়ার পর সবাই ধরে বসলো, আজকে সুমনকে পারফর্ম করতেই হবে ! অল্প নেশা করেছিলো বলে হয়তো ইনহিবিশন-টাও কম ছিলো সেদিন, সুমন-ও রাজি হয়ে গেলো এককথায় ! নকল করার লোক-ও হাতের গোড়ায়, বস ছিলেন এক গোমড়া-মুখো ওড়িয়া লোক, মিস্টার উপাধ্যায় – বিদেশে বছরকয়েক থাকার ফলে তার উচ্চারণে আর হাবেভাবে স্পষ্ট আমেরিকান ছাপ .. সুমনের তার উপর অল্প রাগ-ও যে ছিলো না তা নয় ! ঘন্টাখানেক চলার পর যখন শেষ করলো, সেই বস এসে জড়িয়ে ধরে বললেন, অনেকদিন পর পেটফাটা হাসি হেসেছেন তিনি !

আজকে সুমন নকল করবে ঠিক করেছে তিনজন মোটামুটি নাম-করা সেলিব্রিটির, একজন বয়স্ক পলিটিশিয়ান, একজন হিন্দি সিনেমার হিরো আর একজন নামকরা খেলোয়াড় !

নকল করতে গেলে যে খুব ভালো পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা লাগে তা সুমনের আছে, সহজেই ধরে ফেলতে পারে কার বৈশিষ্ট্য কোনটা, এই যেমন পলিটিশিয়ান-টি বাংলা টোনে আশ্চর্য ইংরেজি বলেন, আর থেকে 'ইয়ে','মানে','ধ্যাত্তেরি' ঢুকে যায় স্পিচে ... আর খেলোয়াড়টির-ও তাই, এই কেরিয়ারের মধ্যগগনেও তার গলায় কৈশোর যায়নি, আর টিভি খুললেই যার বিজ্ঞাপন দেখা যায়, তার মুখে সংলাপ বসানো কি এমন কাজ ? সবথেকে সোজা মনে হয় হিন্দি সিনেমার হিরোটিকে নকল করতে, তাঁর পিলে-চমকানো ডায়লগবাজি আর কৃত্রিম-ব্যারিটোন গলা বোধহয় সুমন-ও আর কোত্থাও শোনেনি !

ফার্স্ট শোয়েই জ্যাকপট ! এতো মুহুর্মুহু হাততালি আর হাসির হররা কখনো শোনেনি আগে ! এ এক অদ্ভুত উত্তেজনা – তিনের জায়গায় চা-পাঁচটা ক্যারিকেচার করে দেখালো সুমন, একবার প্রাইম মিনিস্টারের সম্ভাষণ-ও নকল করতে ছাড়লো না – শেষ করার সময় দেখলো লোকে নিজের টেবিল ছেড়ে স্টেজের পাশে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে, জীবনে প্রথমবার স্ট্যান্ডিং ওভেশান নিতে নিতে সুমন ঠিক করলো চাকরিটা ছেড়েই দেবে, এটাই আজ থেকে তাঁর জীবন ও জীবিকা !

——————

শহরের আশেপাশের বার অনেক, স্ট্যান্ড আপ কমেডির বাজার-ও বেশ উঠতির দিকে এখন, তাই সুমনের প্রথম প্রথম কাজ পেতে সমস্যাই হলো না। আজকাল সে একটা নোটবুক নিয়ে ঘোরে, নতুন কোনো লাইন মাথায় এলে লিখে রাখে, রাস্তাঘাটে ইন্টারেস্টিং ক্যারেকটার দেখলেও নোট করে নেয় আর ঘন্টার পর ঘন্টা এ-চ্যানেল ও-চ্যানেল ঘুরিয়ে টিভি দ্যাখে, সারাক্ষণ-ই কেউ না কেউ কথা বলছেন ... কার ক্যারিকেচার করা যায় নোট নিতে থাকে সুমন!

অল্প অল্প নাম হলেও সুমনের একটা দুঃখ রয়েই গেছে, ওই শুক্রবারের সন্ধ্যের বারের বাইরে তাকে কেউ বড়ো একটা চেনে না ! কাফে-তে গিয়ে বসলে কেউ অটোগ্রাফ চায় না, রাস্তাঘাটে পাবলিক ট্রান্সপোর্টেও কেউ তাকে দেখে ফিসফিস করে সঙ্গীকে বলেনা, 'ঐ লোকটাকে চিনিস?'। সুমনের বদ্ধমূল ধারণা এই মিলেনিয়ামে সত্যি বিখ্যাত হতে গেলে টিভিতে মুখ দেখানো বা ইন্টারনেটে ভাইরাল হওয়া ছাড়া উপায় নেই ...

সুযোগটাও এসে গেলো দিন কয়েকের মধ্যেই ! ইস্কুলের এক বন্ধু বিপ্লব আজকাল টেলিফিল্ম-টিল্ম করে হাত পাকাচ্ছে, সেই এক চ্যানেলের সাথে যোগাযোগ করিয়ে দিলো, ম্যানেজার বিপ্লবের মেসোমশাই, জয়দেব বর্মণ। চুক্তি হলো, সুমনের পারফর্ম্যান্স ইন্টারনেটের মাধ্যমে সম্প্রচার করবে তারা, সরাসরি বার থেকেই, আপাততঃ একটাই শোয়ের বায়না, পাবলিক খেলে আরো ভাবা যাবে ...

সময় এগিয়ে আসছে, সুমন-ও নতুন নতুন ক্যারিকেচার খুঁজছে, এক ঘন্টার শো – অতএব, অনেকগুলো চাই আর সবার জন্য ছোট্ট ছোট্ট গল্প ... এই শো-টার জন্য নতুন কিছু চাই-ই চাই, আর সেই এক-ই জোক, এক-ই ক্যারিকেচার করে চলবে না !

আইডিয়াটা এলো টিভির চ্যানেল ঘোরাতে ঘোরাতেই, হঠাৎ একটা চ্যানেল-এ এসে একটা অতিপরিচিত গলার আওয়াজ শুনে থমকে গেলো সুমন। এ তো সেই ছোটোবেলার বিখ্যাত ম্যাজিশিয়ান, তার কত শো দেখেছে মহাজাতি সদনে, এমনকি টিভিতেও বাচ্চা-বড়ো সবরকমের প্রোগ্রামে আসতেন তিনি। সুমনের মনে হতো সত্যি জাদু ! এই তাকে হাতে-পায়ে শেকল বেঁধে বাক্সবন্দি করে তাকে সাগরে ফেলে দেওয়া হচ্ছে, তিনি ঠিক কোথাথেকে অক্ষত শরীরে উদয় হচ্ছেন, একবার স্টেজে দেখেছে তাকে চোখে রুমাল বেঁধে দেওয়া, আর হাতে চক – দর্শকদের থেকে একজন উঠে একটা ব্ল্যাকবোর্ডে কিছু ফরমুলা লিখছে, আর পাশেই চোখ বাঁধা অবস্থাতেই যাদুকর মল্লিক অন্য ব্ল্যাকবোর্ডে হুবহু লিখে যাচ্ছেন সে-ই এক-ই ফর্মুলা ! সুমন-ও হাত তুলে ভলান্টিয়ার করেছিলো সেইদিন, খুব শক্ত একটা অ্যালজেব্রার ফর্মুলা লিখতে গিয়ে দেখলো, এ প্লাস বি হোল স্কোয়ার ছাড়া কিস্যু মাথায় আসছে না !

এখন অবশ্য মল্লিকের অনেক বয়েস, ম্যাজিক শো-ও সুমন শেষ কবে দেখেছে মনে নেই , এখন কোনো একটা চ্যানেলে এসে তিনি তাঁর সেই অননুকরণীয় গলায় বলছেন, 'এই কলকাতা শহর থেকে দুষ্টু লোকগুলোকে সব ভ্যানিশ করে দেবো' ... সুমন শুনতে শুনতেই ঠিক করে ফেললো তাঁর নতুন ক্যারিকেচার - এক ম্যাজিশিয়ান – যাঁর সব ম্যাজিক-ই ফেল করে !!

যথারীতি এবারের শো-ও খুব হিট, প্রত্যেকটা স্কেচের পরে সুমন-কে পাক্কা তিরিশ সেকেন্ড অপেক্ষা করতে হয়েছে শুধু হাততালি থামাতে! শেষ হওয়ার পরে বাইরে বেরিয়ে এলো সুমন – একটা সিগারেট ধরাতে গিয়ে দেখলো পকেটে লাইটারটা নেই, অথচ এই একটু আগেই ...

'দেশলাই ভ্যানিশ?'

গলাটা শুনে চমকে গেলো সুমন, অনতিদূরে দাঁড়িয়ে আছেন যাদুকর মল্লিক, তার আঙ্গুলের ফাঁকেও একটা জ্বলন্ত সিগারেট ! এগিয়ে এসে সুমনের সিগারেট-টা ধরিয়ে দিতে দিতে বললেন,

'আপনার তো সেন্স অব হিউমার মন্দ না, গল্প বলার কায়দা-ও ভালো, তাহলে এই আমাদের মতন বৃদ্ধ, বাতিল লোকেদের ভেঙিয়ে পয়সা উপার্জন করতে হচ্ছে কেন?'

সুমন বলার চেষ্টা করলো, 'ইমিটেশান ইজ দ্য বেস্ট ফ্ল্যাটারি', মল্লিক কান করলেন না। হাতের সিগারেটটা পাশের নালায় নিক্ষেপ করে চলে যেতে যেতে বললেন, 'ভাঁড়ামি করে লোক হাসাচ্ছেন, হাসান, আমার আপত্তি করায় কিছু যায় আসে না, কাজটা কিন্তু তা-ও ভালো করলেন না' ।

সারা শরীর যেন লজ্জায় রাগে অবশ হয়ে এলো সুমনের, কোনো রকমে একটা ট্যাক্সি ডেকে বাড়ি ফিরে এলো যখন মনে হলো অল্প জ্বর এসে গেছে ইতিমধ্যে, একটা প্যারাসিটামল খেয়ে শুয়ে পড়তে পড়তে সে ঠিক করলো যাই হোক না কেনো, আর কোনোদিন ঐন্দ্রজালিক মল্লিকের ক্যারিকেচার নয়।

পরদিন ঘুম ভাঙলো জয়দেব-বাবুর ফোনে, সুমনের শোয়ের ভিডিও ইতিমধ্যে ভাইরাল হয়ে গেছে ! ইউটিউবে হাজার কুড়িবার লোকে দেখে ফেলেছে এই অল্প সময়ের মধ্যে ! সুমন ভাবলো একবার বলে দেখবে ভিডিও-টা সরিয়ে

নেওয়ার কথা, তারপর ভাবলো হাতের তীর, মুখের কথা – একবার যা বেরিয়ে গেছে আর কি ফেরানো যায়?

পরের শোয়ের আগে আর-ও সপ্তাহ দুয়েক সময় চেয়ে নিলো সুমন, জয়দেব-বাবু যদিও অধৈর্য্য হয়ে উঠেছেন ক্রমশঃ, কিন্তু সুমনকে নতুন ক্যারেকটার ভাবতেই হবে ! ম্যাজিশিয়ানের শেষ কথাগুলো কোথাও যেন একটা কাঁটার মতন ফুটে আছে । এর মধ্যে তার নাম-ও হয়েছে বেশ খানিকটা, একদিন মলে জামা কিনতে গিয়ে ক্যাশিয়ার তাকে দেখেই চিনতে পেরে খানিকটা এক্সট্রা খাতির করলেন – এমনকি পাড়ার সে কাফেটায় গত এক বছর ধরে যাচ্ছে সুমন, তার ব্যারিস্তাও আজকাল সুমনের জন্য কাফের এককোণে একটা কাউচ রিজার্ভ করে রাখছে, সুমন জানে এইভাবে একটু একটু করেই খ্যাতি আসে !

ক্যাফে-তে বসেই মাথায় এলো পরের ক্যারিকেচারের আইডিয়া, তার ছেলেবেলার ইস্কুলের মহারাজ, নাম ছিলো অজপানন্দ – মুখে সারাক্ষণ অনাবিল হাসি লেগে থাকতো বলে দুষ্টু বাচ্চারা নাম দিয়েছিলো অযথানন্দ ! এখন তিনি বেশ নাম-টাম করেছেন, টিভির চ্যানেলে এসে গান-টান করেন, টক-শোতেও এসে মানুষের সঙ্গে ফোনে কথা-টথা বলে শান্তির উপায় বাতলে দেন ! অযথানন্দকে নকল করাও ভারি সহজ, তাঁর ভাবভঙ্গি-গলার স্বর সব-ই যে বেশ

মেয়েলি ! এফিমিনেট পুরুষ-মানুষের নকল করা যতই রাজনৈতিক-ভাবে অশুদ্ধ হোক, লোকে যে দেদার হাসে সে সুমনের জানা !

দিন চারেক পরে শো শুরু হলো সুমনের, শুরুতেই অযথানন্দ-কে নিয়ে একটা আনকোরা নতুন স্কিট ! কাল্পনিক কথোপকথন – একদিকে অযথানন্দ, আরেকদিকে পলিটিশিয়ান চক্কোত্তি !

কিন্তু এ কি? আজকে তো কই হাসির হররা উঠছে না, স্টেজের সামনের দিকে অল্প আলোয় পুরোনো বন্ধুদের মুখ চোখে পড়ছে, তারা-ও কেমন যেন অবাক হয়ে তাকিয়ে সুমনের দিকে ! এই স্কেচ তার সেরাগুলোর মধ্যে একটা, তা হলে?

মাইকে হঠাৎ একটা বিশ্রী জোরে ফিডব্যাকে সম্বিত ফিরে এলো সুমনের, তাতেই ব্যাপারটা দিনের আলোর মতন স্পষ্ট বুঝতে পারলো সে- মাইকে যে গলা শোনা যাচ্ছে সুমনের সেটা অযথানন্দ-ও না, পলিটিশিয়ান চক্কোত্তিও না ... সেটা একটা অচেনা অদ্ভুত গলা ! নাঃ, একটা নয়, একের পর এক বিভিন্ন গলা, কোনোটা ভারি, কোনোটা মিহি, কোনোটা অত্যন্ত কর্কশ – এবং আশ্চর্য ব্যাপার, গোটা ব্যাপারটা হয়ে চলেছে সুমনের ইচ্ছের কোনোরকম তোয়াক্কা না করে ! পুরোনো স্যাটেলাইট রেডিও-র মতন, কখন যে কি সিগ্ন্যাল ধরে চলেছে, সুমন-ও জানে না !

এক ঘন্টার শো ছিলো। হল যখন প্রায় ফাঁকা, সুমন দেখলো মিনিট কুড়িও পেরোয়নি ! রাস্তায় বেরিয়ে আজ আর ট্যাক্সি নয়, এক ঘন্টার রাস্তা হেঁটেই ফিরলো সুমন। তার মাথায় কি চলছে সে নিজেও জানেনা, রাস্তায় বার দুয়েক চাপা পড়তে পড়তে বেঁচেছে আজকে – একবার মোড়ের মাথায় গুমটিটায় দাঁড়িয়ে এক প্যাকেট সিগারেট কিনতে গিয়ে দেখলো, অবিকল মহিলার গলা বেরিয়ে এলো ভেতর থেকে ! দোকানদার চেনা লোক, এক-গাল হাসলো, সুমন আবার তাঁকে কিছু বলতে গেলো, গলা থেকে কিছু যান্ত্রিক আওয়াজ বেরিয়ে এলো !

ঘরে ফিরে দরজা বন্ধ করে একগ্লাস ঠান্ডা জল ঢকঢক করে খেয়ে একটু যেন ধাতস্থ হলো সুমন ! একবার নিজের গালে একটা চড় মারলো, বাথ্রুমে গিয়ে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে দেখলো কোথাও কোনো অস্বাভাবিক চিহ্ন ফুটছে কিনা, গলার কাছেও কিছু নেই – সম্পূর্ণ সুস্থ একটা লোক আয়নার ওপাশে দাঁড়িয়ে ! খালি তার চোখে-মুখে অপার্থিব ভয়ের ছাপ !

সুমনের মনে হলো সে পাগল হয়ে যাচ্ছে, পৃথিবীটা যেন দুলছে তার - ইচ্ছে হলো প্রচন্ড জোরে একটা চিৎকার করে ওঠে – আর অবাক হয়ে দেখলো তার সমস্ত প্রাণশক্তি নিঙড়ে বের করা আর্তনাদটা গলা দিয়ে বেরলো ঠিক একটা পোষা টেরিয়ারের রাগী গর্জনের মতন ! ...

——————

অনেক রাতের দিকে জ্ঞান ফিরলো বিপ্লবের ডাকাডাকিতে! দরজা ভেঙে ঢুকে দমকল তাঁকে যখন সংজ্ঞাহীন অবস্থায় উদ্ধার করে, সুমন বাথ্রুমের মেঝেতে গলা আঁকড়ে পড়েছিলো ! পাশের বাড়ির বয়স্ক ডাক্তার চৌধুরী রাতের শেষ

পেগটা ব্যালকনিতে বসে আরাম করে খান, আজ পাশের ফ্ল্যাট থেকে একের পর কুকুর-বিড়ালের পরিত্রাহি আর্তনাদ শুনে ভয় পেয়ে পুলিশকে ফোন করেন তিনি-ই!

বিপ্লব-ও শোয়ের সময় ছিলো, কিছু একটা অদ্ভুত ব্যাপার হচ্ছে দেখে রাত্রে বন্ধুকে অনেকগুলো ফোন করেও না পেয়ে একটা ট্যাক্সি ধরে চলে আসে সুমনের ফ্ল্যাটে !

বিপ্লবের ডাকে সাড়া দিতে দিতে সেই আবছা-অবচেতনের মধ্যেও সুমন বুঝলো, তার গলা দিয়ে যে আওয়াজ বেরোচ্ছে সেটা তার-ই, নিজের চেনা গলা !

——————

বিপ্লবের মেসোমশাই অনেকবার অনুরোধ করেছিলেন, আর কয়েকটা শো করতে – একটা একটু গন্ডগোল তো কি হয়েছে? সুমনের সেই প্রথম শোয়ের ভিডিও এতদিনে দশ লক্ষ লোক দেখেছেন ! জয়দেব-বাবুর বাকি সব প্রোডাকশন মিলিয়েও এতো লোক হবে না ...

সুমন এখন আর স্ট্যান্ড-আপ করে না ! পুরনো চাকরিটা পেতেও তেমন বেগ পেতে হয়নি, বস উপাধ্যায় তাকে এককথায় আগের পোজিশান-টাই ফিরিয়ে দিলেন, এরকম একজন সেলিব্রিটি থাকলে টিমের সবদিক থেকেই ভালো, কোম্পানির ভিজিবিলিটি-ও বাড়ে, আজকাল তো লোকে চাকরির পাশাপাশি কতকিছুই না করছে !

তবুও সুমন আর স্ট্যান্ড-আপ করে না, বন্ধুদের পার্টিতেও না – সে বই পড়ে পড়ে ম্যাজিক শিখছে ! আয়নার সামনে বসে বসে একমনে পামিং আর পাসিং করতে করতে সময়টা দিব্যি কেটে যায়! বিপ্লবকে বলেছে জাদুকর মল্লিকের নাম্বারটা যদি এনে দিতে পারে – স্টেজে উঠুক না উঠুক, একটা কয়েন ভ্যানিশ করা শিখতে পারলেও অনেক !

পুনশ্চঃ আমি গত কয়েকদিন ধরে টানা 'গল্প ১০১' পড়ছি, কেন ঠিক জানিনা ! হয়তো হঠাৎ ছোটোবেলা ফিরে পাওয়ার ইচ্ছে – সেই যখন পড়ার বইয়ের তলায় গোগ্রাসে গিলতাম 'এবারো বারো', 'আবার বারো'-র গল্পগুলো ... আমার এই গল্পটা সেই সব আশ্চর্য গল্পের স্রষ্টা সত্যজিত রায়ের প্রতি সামান্য এবং অতিশয় অক্ষম একটা ট্রিবিউট!

ছুটকথা

নবকলম

এপ্রিল ২৭, ২০১৭

১

যেমন অনেক রাত কেটে যায় চাঁদ চুমুকে,
যেমন নতুন তীর বিঁধে যায় দিনের বুকে,
তেমন করেই, না পাক তেমন পয়সাকড়ি,
ঘুরবে বলেই সচল প্রাচীন স্টেশন ঘড়ি!

ঘড়ির কাঁটা ঘুরলে ভীষণ সময় বাড়ে,
ছাপ রেখে যায় চোখের এবং নখের ধারে;
মনের ভিতর গজায় "তবে", "কিন্তু", "যদি",
মুচকি হাসে লোকালয়ের পাশের নদী।

২

নিবিড় তিমিরে
ধরিলে কুমীরে
ছুঁড়ে হাত-পাও ছাড়া নাই।

ঘুম শেষ যবে,
দেখি ভোর সবে;
আজ রবিবার, তাড়া নাই!

৩

জাগা চোখে বৃষ্টি দেখে
স্বপ্নেরা টিকিট কাটে সিংগলিলার;

ধুলো শুয়ে তৃষ্ণা মেটায়,
সোঁদা ঘ্রাণ ফ্রি তে বিলোয় ব্যাকটিরিয়া।

মরা ড্রেন প্রাণ ফিরে পায়, রেডিওয় বন্যাকাহন,
শুনে ভয় প্রবল নতুন বিড়ালছানার!
পাশে তার নাকখাড়া মা'র নাকজুড়ে খিচুড়িখবর,
সাথে মাছ থাকছে জেনেই হঠাৎ হানা!

৪

দিন তিনেকের বৃষ্টি, তাতেই
আমার বাড়ি জাহাজবাড়ি,
ডাকছে যে রোজ দূরের পাড়ি,
হপ্তাখানেক জল পেলে ঠিক নাবিক হবো।

মাস চারেকের রসদ, এবং
গাঁটরি বেঁধে জুতো ও জামার,
আর যা কিছু লাগবে আমার;
খটকা লাগে – দূরের দেশে রাবড়ি পাবো?

৫

এখন এখানে দিনগুলো বেশ শান্ত,
ক'দিনের স্নানে গাছেরা খানিক ক্লান্ত;
চায়ের গুমটি চোখ তুলে খোঁজে চেনা চোখ,
বিস্কুট খোঁজে চেনা হাত; ঠোঙা, চেনা লোক।

জোলো বিকেলেই ভাব হয় মুড়ি – বালিশের,
"ধুর দিবাকর!" বলে শুরু, আরও কতো কি!
মিয়োনো তাদের সান্ত্বনা দেয় মোটা বাল্ব,
তবু ফিলামেন্ট কভু সূর্যের মতো কি?

৬

কয়েক লাফে তফাত আসেই লাব-ডুবে;
ধন তেরাসে কিনলে জিনিস ধনকুবের?
খামচি ছাড়াই খাম খুলে যায় কোন ঝড়ে!
ঘরের ঠাকুর ডুব দিলে পর কোন ঘরে?

বৃষ্টি সিনহা-র শ্বশুরবাড়ির টিনের ছাদ?
জল গড়ালে অনেক তবেই গভীর খাদ?
সাঁঝের মুখেই চাঁদকে নিয়ে বাঁশবাগান;
বাস চললেই নতুন নিবাস, বেশ দূরে।

আমার ইতিহাস শিক্ষা

হস্তিমূর্খ

সেপ্টেম্বর ২, ২০১৭

গুজব সৃষ্টি, প্রকাশ এবং প্রচার হইতে বিরত থাকুন।

ইহা সত্য ঘটনা অবলম্বনে রচিত একটি কাল্পনিক কাহিনী। ইহার সহিত যদি কেহ কোনও হোয়াটস অ্যাপ কিংবা ফেসবুক গ্রুপ অথবা তাহার পরিচালক / পরিচালকবৃন্দ অথবা সেইসব গ্রুপের কোনও সদস্য / সদস্যার কোনও মিল খুঁজিয়া পান তবে তাহা অনিচ্ছাকৃত।

ধূমপান কর্কটরোগের কারণ।

মদ্যপান স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর।

আদি পর্ব

শিশুকাল হইতেই আমার বড় সখ ছিল আমি ইতিহাস পড়িব। পিতার কঠিন শাসনে বিজ্ঞান সাধনা করিতে বাধ্য হইয়াছিলাম বলিয়া আমার সে সাধ অপূর্ণ রহিয়া যায়। কিন্তু মনে মনে ইহা নিশ্চয় জানিতাম সুযোগ হইলে আমি একদিন ইতিহাস পড়িব। সে সুযোগ যখন আসিল তখন আমি বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়াছি।

একদা প্রত্যুষে গৃহে একখানি লিফলেট কুড়াইয়া পাইয়া তাহা পড়িয়া দেখিলাম যে কোনও এক স্থলে কোনও এক মহাত্মা বিনা পারিশ্রমিকে প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষার ব্যবস্থা করিয়াছেন। সংবাদ লইয়া জানিলাম সে স্থলে দিনের বেলা তো বটেই এমনকি রাত্র নয়টা-সাড়ে নয়টার পূর্ব্বে পড়াশোনা করিবার সুবিধা নাই। আরও জানিলাম প্রতিষ্ঠানে সকল শিক্ষার্থী এবং শিক্ষক এই সময় হইতেই ইতিহাস চর্চ্চা শুরু করেন। শুনিয়া বক্ষে শেল বিঁধিল। তবে কি এক্ষণেও আমার ইতিহাস শিক্ষার আয়োজন বৃথা যাইবে। তবু আশায় বাঁচে চাষা। এবং এতদিনে ঈশ্বর মুখ তুলিয়া চাহিলেন। যে গৃহিণী রাত্রে একাকিনী থাকিবে এই আশঙ্কায় আমার চিত্ত বিকল হইয়াছিল সেই গৃহিণী আমার হস্ত তাঁহার মস্তকোপরি স্থাপন করিয়া কহিলেন যে তাঁহার মাথার দিব্বি আমি যেন অবশ্য অবশ্য আপন ইচ্ছা পূর্ণ করি।

এইরূপে সাহস অর্জ্জন করিয়া আমি সেই প্রতিষ্ঠান সম্পর্কে আরও বিস্তারিত খোঁজখবর লইয়া জানিলাম যে উক্ত লিফলেট লইয়া প্রতিষ্ঠানে পৌঁছাইতে পারিলেই প্রবেশাধিকার পাওয়া সম্ভব। ভর্ত্তি হইবার কোনও নির্দ্দিষ্ট দিনক্ষণ নাই। যে কোনও দিন ভর্ত্তি সম্ভব। এমত অবস্থায় পঞ্জিকা দেখিয়া এক শুভক্ষণে গৃহদেবতার উদ্দেশ্যে অনেকানেক ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া আমি প্রতিষ্ঠানে গমন করিলাম।

একেবারেই প্রথমদিন একটি বড় হলঘরে সমস্ত নবীন শিক্ষার্থীর বসিবার ব্যবস্থা হইল। এতক্ষণ পর্য্যন্ত কোনও প্রকার অসুবিধা হইল না। আমি বসিয়া আছি, কেহ বা নিজেদের মধ্যে শলাপরামর্শ করিতেছেন এমন সময় প্রধানশিক্ষক মহাশয় স্বয়ং প্রবেশ করিলেন। প্রত্যেকে প্রথমাবধি জানিতেন যে প্রধানশিক্ষক প্রশ্ন করিলে আপন আপন পরিচয় প্রদান করিতে হইবে। কিন্তু তাহা কি প্রকারে হইবে সে বিষয়ে বোধ করি অনেকেই সংশয়াবিষ্ট ছিলেন। প্রধানশিক্ষক প্রত্যেকের নিকটে যাইয়া যখন পরিচয় জানিতে চাহিলেন তখন কেহ বা আধার কার্ড বাহির করিয়া দিলেন, কেহ বা রেশন কার্ড বাহির করিলেন। একজন কহিলেন তিনি আধার কার্ডের নিমিত্ত দরখাস্ত করিয়াছেন সেই দরখাস্ত জমা করিবার প্রমাণপত্রটি আপনার সহিত লইয়া আসিয়াছেন। বুঝিতে পারিতেছিলাম প্রধানশিক্ষক কুপিত হইতেছেন কিন্তু নীরব রহিয়াছেন। তাঁহার ধৈর্য্য বড় বেশিক্ষণ অটুট রহিল না। এক শিক্ষাপ্রার্থী পরিচয় দিবার ছলে একখানি আপন ফোটোগ্রাফ বাহির করিতেই তিনি ক্রোধে ফাটিয়া পড়িয়া যাঁহারা নিজ পরিচয় প্রদানের কারণে নাম এবং বাসস্থানের নাম বলা ভিন্ন অন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়াছিল তাঁহাদের প্রত্যেকের প্রবেশাধিকার রদ করিয়া দিলেন। আমি নিয়মমাফিক কর্ম্ম করিয়া সর্ব্বশক্তিমান পরমেশ্বরের কৃপায় শ্রেণীতে প্রবেশ করিবার অনুমতি লাভ করিলাম।

শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়া বুঝিলাম যে সেই স্থলে পূর্ব্ব হইতেই আরও অনেক শিক্ষার্থী উপস্থিত হইয়াছেন। কেহ আমার ন্যায় নবীন, কেহ বা পুরাতন। যাহা হউক, আমি একটি স্থান নির্ব্বাচন করিয়া বসিলাম। আমার ন্যায় নবীনেরা অধিকাংশই নিশ্চুপ বসিয়া ছিলেন এবং পুরাতনেরা নিজেরা আলোচনা করিতেছিলেন। সেই আলোচনায় কান পাতিয়া একটি পরিচিত শব্দ কর্ণে আসিল। শব্দটি হইল – তাজমহল। তাঁহাদিগের নিকটে গিয়া বলিলাম তাজমহল সম্পর্কে তাঁহারা যে আলোচনা করিতেছেন, অনুমতি পাইলে আমি তাহা শুনিতে ইচ্ছুক। আমার ইচ্ছা শুনিয়া আমাকে একজন প্রশ্ন করিলেন আমি তাজমহলের নাম শুনিয়াছি কিনা, শুনিলে সে বিষয়ে কি জানি। আমি বিদ্যালয়ে পাঠরত থাকিবার কালে তাজমহল শুনিয়াছিলাম, বলিলাম। আরও যাহা শুনিয়াছিলাম তাহাও বলিলাম। এমনকি এও বলিলাম যে শুনিয়াছি কোন এক আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান তাহাকে বিশেষ স্বীকৃতি প্রদান করিয়াছে। আমার উক্তি শুনিয়া সেই দলের একজন কহিল আমি এই বিষয়ে যাহা জানি তাহা মিথ্যা। এই মিথ্যা কমিউনিস্ট ঐতিহাসিকগণ বিশেষ উদ্দেশ্য লইয়া প্রচার করিয়াছে। এমত বাক্য শুনিয়া কিঞ্চিৎ হতোদ্যম হইয়া সত্য জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলাম। যাহা শুনিলাম তাহাতে রক্ত উষ্ণ হইয়া উঠিল, শোণিতপ্রবাহ দ্রুত হইল। শুনিলাম তাজমহলের নিম্নে তেজো মহালয়া নামক এক হিন্দু শিবমন্দির নিস্তেজ হইয়া পড়িয়া রহিয়াছে। আমি শিশুকাল হইতে পিতামহীর আশ্রয়ে যে ধর্ম্মশিক্ষা করিয়াছি, সেই হিন্দুধর্ম্মের এই অবমাননা জানিয়া হৃদয় বিদীর্ণ হইল। প্রশ্ন করিলাম এখন উপায়। তাঁহারা জানাইলেন যে আমি যেন এই কথা এতজনকে বলি এবং তাহাদিগকেও যেন এতজনকে বলিতে বলি যাহাতে জনমানস হইতে ভ্রান্ত ধারণা দূর হইয়া যায় এবং একমাত্র তাহা হইলেই স্বীকৃতিপ্রদানকারী সংস্থা বাধ্য হইবে সত্য মানিয়া লইতে। আমি সম্মত হইলাম।

এই সমস্ত কাহিনী শুনিতে শুনিতে খেয়াল হয় নাই কক্ষে বেশ গোলযোগ শুরু হইয়াছে। "এক্ষণেও কেন পঠনপাঠন শুরু হইল না" এই রব তুলিয়া অনেকেই উচ্চৈস্বরে প্রতিবাদ জানাইতেছেন। এমন সময় পুনরায় সেই মহাত্মা প্রধানশিক্ষক কক্ষে প্রবেশ করিয়া জানাইলেন লিফলেট লইয়া অনেকেই আসিয়াছেন সেই কারণেই বিলম্ব। তবে অচিরেই পাঠদান শুরু হইবে। প্রধানশিক্ষক কক্ষের ডানদিকে একখানি বিচিত্র (কেন বিচিত্র পরে বলিব) বোর্ড

দেখাইয়া বলিলেন যে যাহা জানিতে চায় তাহা যেন ঐ বোর্ডে লিখিয়া দেয়। এই বাক্য শুনিয়া কেহ কেহ উক্ত বোর্ডের নিকটে গিয়া ফুল আঁকিল, কেহ বা একখানি পাখির ছবি আঁকিল। আমি আমার স্থানে বসিয়া রহিলাম। একে একে আমার উভয়পার্শ্ব হইতে কতিপয় নবীন শিক্ষার্থী 'আর কতক্ষণ এই প্রকারে অপেক্ষা করিতে হইবে' বলিয়া বিরক্তি প্রদর্শন করিয়া শ্রেণীকক্ষ ত্যাগ করিল। ইঁহাদের দেখিয়া একবার আমিও বিরক্ত বোধ করিয়া ভাবিলাম এই স্থান ত্যাগ করাই সঙ্গত। কিন্তু করুণাময় ঈশ্বর তৎক্ষণাৎ আমাকে আমার আপন সহধর্ম্মিনীর কথা স্মরণ করাইয়া দিলেন। সে হতভাগিনী কত ক্লেশ শিকার করিয়া শয্যায় একাকিনী নিশি যাপন করিতেছে তাহা মনে আসিতেই বিরক্তি নামক পাষণ্ড প্রবৃত্তি আমার অন্তর হইতে একেবারে দূরীভূত হইল। আমি দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম যে কোনো প্রকারেই হউক, ইতিহাস শিক্ষা ব্যতিরেকে এই স্থান পরিত্যাগ করিব না।

আদি-মধ্য পর্ব

প্রধানশিক্ষক শ্রেণীকক্ষে প্রবেশ করিয়াই পুনরায় দিনের পঠনপাঠন শুরু হইতে বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিয়া বলিলেন। এরপরে উনি সেই বোর্ডটির দিকে তাকাইলেন। বিস্মিত হইয়া দেখিলাম যাহা যাহা লিখিত হইয়াছিল তাহা আর মুছিয়া ফেলিবার কোনও পন্থা নাই এবং যিনি লিখিয়াছেন আপনা হইতেই তাঁহার নাম খোদিত হইয়া গিয়াছে। এই কারণেই তাহাকে বিচিত্র আখ্যা দিয়াছিলাম। যাহা হউক, প্রচুর পরিমাণ ফুল, পাখি, গাছ, সূর্য ইত্যাদির ছবি দেখিয়া প্রধান শিক্ষক সকলকে স্মরণ করাইয়া দিলেন বোর্ডে ইতিহাস সম্বন্ধীয় বিষয় ভিন্ন অন্য কোনও লেখা কিংবা ছবি আঁকা হইতে বিরত থাকিবার জন্যে। এইরূপে বোর্ডে আকস্মিক নজরে পড়িল একটি লেখা – ভারতবর্ষের তিন যুগপুরুষ, প্রথমজন সতীদাহপ্রথা রদ করিয়াছিলেন, দ্বিতীয়জন বিধবাবিবাহপ্রথা শুরু করাইয়াছিলেন, তৃতীয়জন তিনতালাকপ্রথা ধ্বংস করেন। এই লেখাটি দেখিয়া এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করিল – কীরূপে ইহা ঐতিহাসিক বিষয় হইল ?

অতঃপর কথোপকথন নিম্নরূপ

- ইহা অবশ্যই ঐতিহাসিক বিষয়

- প্রথমোক্ত প্রথাদুটি লইয়া দুইজন যুগপুরুষ এক সামাজিক আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন কিন্তু তিনতালাকপ্রথা রদ হইয়াছে আদালতের আদেশক্রমে, ইহাতে তৃতীয় যুগপুরুষের ভুমিকা কি

- যুগপুরুষগণ তাঁহাদের চিন্তা অন্যের অন্তরে প্রবেশ করাইতে সক্ষম, এইরূপে এই মহাপ্রাণের ইচ্ছাই আদালতের মাধ্যমে প্রকাশিত হইয়াছে

উক্ত শিক্ষার্থী বিনা বাক্যব্যয়ে বসিয়া পড়িলেন। প্রধানশিক্ষক মহাশয় পুনরায় বোর্ড দেখিতে লাগিলেন। আবার একটি স্থানে আসিয়া উনি ভাল করিয়া দেখিলেন। সেই স্থলে হিন্দিতে লিখিত আছে – বুঢ়ে দিন ওয়াপস লাও (অর্থ – খারাপ দিবস ফিরাইয়া আনো)।

পুর্ব্বেই বলিয়াছি কিছু লিখিলেই যিনি লিখিয়াছেন তাঁহার নাম আপনা হইতে বোর্ডে খোদিত হইয়া যায়। দেখিলাম প্রধানশিক্ষক পূর্ব্বোক্ত শিক্ষার্থী যিনি প্রশ্ন করিয়াছিলেন 'ঐতিহাসিক ঘটনা কীরূপে হইল', তাঁহার নিকটে আসিয়া তীব্র কর্ণাকর্ষণপূর্ব্বক পশ্চাতে পদাঘাত করিয়া শ্রেণী হইতে বিতাড়িত করিলেন। প্রধানশিক্ষকের প্রতি আমার শ্রদ্ধা বহুগুণ বর্দ্ধিত হইল। আমি ভাবিয়া পাইলাম না কি প্রকার নীচমনোবৃত্তির বশবর্তী হইলে মানুষ খারাপ দিবস ফিরাইয়া আনিবার কথা চিন্তা করিতে পারে।

প্রধানশিক্ষক মহাশয় আপন স্থান গ্রহণ করিয়া আমাদিগের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন করিলেন যে আজ কি বিষয়ের পাঠ হইবে। একজন পুরাতন শিক্ষার্থী তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে ভারতবর্ষ যে বর্ত্তমানে পরাধীন সেই বিষয়টি পূর্ব্ব হইতেই স্থির হইয়া আছে। ইহা আমার নিকট নবীন তথ্য। আমার ধারণামতে আমরা স্বাধীন ভারতের নাগরিক কিন্তু এক্ষণে বিপরীত শুনিয়া আমিও সাগ্রহে অপেক্ষা করিতে লাগিলাম। প্রধানশিক্ষক মহাশয় শুরুতেই বলিলেন – "ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংক্রান্ত আইন হইয়াছে বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টে"। ইহা শুনিয়া একজন বলিলেন – "সেক্ষেত্রে কল্য যদি বৃটিশ পার্লিয়ামেন্ট সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামত লইয়া এই আইন বাতিল করিয়া দেয়, তবে আমাদিগকে পুনরায় পরাধীনতা বরণ করিতে হইবে"। এই মন্তব্য শুনিয়া অনেকেই হাসিয়া উঠিলে প্রধানশিক্ষক মহাশয় সকলকে তিরস্কার করিয়া বলিলেন – "ইহা কোনওপ্রকারেই হাস্যউদ্রেককারী ঘটনা নহে। মনে রাখিতে হইবে এইরূপে কোনও দেশের পক্ষে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি অসম্ভব।" কানাডা দেশের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির উদাহরণ টানিয়া উনি বাল ফোঁড়াইবার কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন এইরূপেই কোনো পরাধীন দেশ স্বাধীন হয়। আমাদের দেশ বাল ফোঁড়াইয়া স্বাধীনতা অর্জ্জন করে নাই জানিয়া আমি যৎপরোনস্তি ক্ষুণ্ণ হইলাম এবং স্পষ্ট অনুধাবন করিলাম আমরা পরাধীন। ইহার সহিত উল্লেখ করিলেন যে দেশীয় কমিউনিস্টগণ ইহা ধরিতে পারিয়া স্লোগান বাঁধিয়াছিল – ইয়ে আজাদী ঝুটা হ্যায়। কিন্তু উক্ত কমিউনিস্টগণ অত্যন্ত অসৎ অর্থগৃধ্ন ছিল, সেই কারণেই নেহেরু উহাদিগকে অনায়াসেই যথোপযুক্ত মূল্য দিয়া ক্রয় করিতে সক্ষম হইয়াছিল। এইসময় এক শিক্ষার্থী প্রশ্ন করিলেন – "কমিউনিস্ট পার্টি কাহার দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল ?" যেহেতু কমিউনিস্ট পার্টি কাহার দ্বারা নিষিদ্ধ ঘোষিত হইয়াছিল তাহা পাঠ্যবিষয়বহির্ভুত সেহেতু প্রধানশিক্ষক মহাশয় তাঁহার কথার উত্তরে বৃথা বাক্য এবং সময়ব্যয় না করিয়া আমাদিগের শিক্ষার নিমিত্ত বলিতে লাগিলেন। প্রথমেই বলিলেন এই ইতিহাস 'ওনার ধারণা হইলেও ইহাই সত্য। তৎসত্বেও যদি কেহ যুক্তি দিয়া অন্যমত স্থাপন করিতে পারে সেক্ষেত্রে তিনি তাহা নির্দ্বিধায় মানিয়া লইবেন'। ইহা অমান্য করিবার কোনও কারণ আমার নিকট অনুপস্থিত ছিল। যে মহাত্মা স্বেচ্ছায় প্রকৃত ইতিহাস শিক্ষার ভার লইয়াছেন তাঁহার ধারণাকে সত্য বলিয়া মানিয়া লইতে আমি দ্বিধান্বিত হইবার কোনও অজুহাত খুঁজিয়া পাইতে ব্যর্থ হইলাম। বিশেষত কবিগুরু স্বয়ং যখন এক কাব্যে উল্লেখ করিয়াছেন – সেই সত্য যা রচিবে তুমি, ঘটে যা তা সব সত্য নহে।

মধ্য-অন্ত্য পর্ব

তৎপরে প্রধানশিক্ষক মহাশয় যাহা বলিলেন তাহা আপন লেখনীতে ধারণ করিব এ ক্ষমতা হইতে আমাকে ঈশ্বর বঞ্চিত করিয়াছেন কিন্তু একদা আমি শর্টহ্যান্ড (সঙ্কেতে লিখনপদ্ধতি) শিখিয়াছিলাম সেই কারণেই আমি উক্ত মহাত্মার ভাষণ অবিকৃত নিম্নে লিপিবদ্ধ করিতে পারিলাম

"পূর্ব্বেও বলিয়াছি, পুনরায় বলিতেছি এই কাহিনীর কোনও রূপ প্রমাণ আমার নিকট নাই। প্রমাণ ও যুক্তি ব্যতীত কথা বলিতে আমি অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিয়া থাকি সেই বিষয়ে তোমরা সকলেই জ্ঞাত আছো। এই কাহিনী উত্তরপ্রদেশ রাজ্য ক্যাডারের একজন অবসরপ্রাপ্ত আই এ এস অফিসার আমায় বলিয়াছিলেন। উনি বারংবার এই প্রসঙ্গে নেহরুর একমাত্র বিশ্বস্ত অনুচর এম ও মাথাই এর কথা ও তাঁহার আত্মজীবনী 'রেমিনিসেন্সেস অফ নেহরু এজ' বইয়ের কথা উল্লেখ করিয়াছেন। কাহিনীটি এইরূপ -

ভারতীয়দের স্বাধীনতা হস্তান্তর করিতে ইংরেজরা ঘোর অরাজি ছিল, তাহাদের agent গান্ধীও ব্যর্থ হইল। বৃটিশদিগের বিরুদ্ধে আপোষহীন লড়াই লড়িতে ইচ্ছুক সুভাষকে সঙ্কল্পচ্যুত করা গান্ধীর অসাধ্য হইল। অতঃপর বৃটিশ, গান্ধী, জিন্নাহ্ এবং নেহেরু এই চতুর্মূর্তি মিলিয়া এক ষড়যন্ত্রে সামিল হইয়া একটি স্বাধীনতার নাটক রচনা করিয়া ভারত ছাড়ো আন্দোলনের রূপরেখা স্থির করিল। চিত্রনাট্যানুসারে আন্দোলন শুরু হইবার প্রথমদিনেই সব নেতা গ্রেফতার হইল। আজাদও তাঁর পুস্তক 'ইণ্ডিয়া উইনস্ ফ্রীডম'-এও একই অভিযোগ করিয়াছেন।

ইহার পর বৃটিশ ভারতকে তাঁহাদের অধীনে একটি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা প্রদান করে। ইহা কোনওপ্রকারেই স্বাধীনতা হইতে পারে না। এইরূপে একটি দেশের পার্লিয়ামেন্টের আইন মোতাবেক কোনও দেশ স্বাধীনতা পাইতে পারে না কারণ আইন পরিবর্তনযোগ্য বলিয়া সেই স্বাধীনতা আইনের যুক্তিতে উক্ত পরদেশীয় আইনের পরাধীন হয়। ফলে আমাদের স্বাধীনতা বৃটিশ পার্লিয়ামেন্টের অধীন। ইহা ব্যতীত বৃটিশ কানাডা বা আমেরিকাকে তো আইন করিয়া স্বাধীনতা দেয় নাই। কানাডাকে বাল ফোঁড়াইয়া (এই স্থলে প্রকাশ করিয়া রাখা আবশ্যক আমি প্রথমে বাল ফোঁড়াইয়া শুনিলেও পরবর্তীতে জানিয়াছি উহা আসলে বালাফোর) ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকেও ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে স্বাধীনতা প্রদান করা হইয়াছে। আইন করিয়া স্বাধীনতা হইতেও পারে না এবং হয়ও নাই। এই নিমিত্ত ১৯৪৭ সনের ১৫-ই আগস্ট পরবর্তী সময়ে ভারতের প্রথম গভর্ণরের স্থলাভিষিক্ত হন ইংরেজ রাজপুরুষ যিনি বৃটিশ সরকার কর্তৃক নিযুক্ত। জল, স্থল এবং বায়ু সেনার তিনবিভাগীয় প্রধান হিসেবেও ইংরেজ রাজপুরুষগণ নিযুক্ত হন। ১৯৫৩ সন পর্যন্ত ইহারাই সমস্ত সরকারী কার্য পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। এবং তোমরা জানো অপরাপর স্বাধীন দেশ বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করিতে পারে, কিন্তু ভারতে কোনও বিদেশমন্ত্রী নাই, কারণ বিদেশমন্ত্রী নিয়োগ করিবার ক্ষমতা শুধুমাত্র স্বাধীন দেশসমূহের এক্তিয়ারভূক্ত। এবং ভারত বৃটিশ রাজা অথবা রাণীর কমনওয়েলথভুক্ত হওয়ায় রাষ্ট্রদূত নিয়োগ করিবার ক্ষমতাহীন, সেই স্থলে হাইকমিশনার নিয়োগ করে।

নেহেরুদের সাথে বৃটিশের চুক্তি হয় ৪৫৫ পৃষ্ঠার। সেই চুক্তি অনুযায়ী ৫০ বৎসর কাল যাবৎ ভারত বৃটিশাধীন থাকিবে অর্থাৎ ১৯৯৭ সন অবধি এই চুক্তি লাগু থাকিবে। উক্তসময় অতিবাহিত হইয়া গেলে একমাত্র প্রধানমন্ত্রী

উহাতে স্বাক্ষর করিয়া দেশকে স্বাধীন করিতে পারেন কিংবা চুক্তি আরও কিছুকাল বলবৎ রাখিতে পারেন। ১৯৯৭ সনে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী আরও ২২ বৎসর সময়কালের জন্য উহাকে বর্ধিত করিয়াছিলেন। ২০১৯ সনে যিনি প্রধানমন্ত্রী হইবেন তিনি ইচ্ছা করিলে দেশকে স্বাধীন করিতে পারেন।

এইসমস্ত তথ্য গোপনীয় রাখিবার উদ্দেশ্যেই প্রধানমন্ত্রী হইতে গেলে শপথবাক্যের সহিত গোপনীয়তার শপথ লইতে হয়। যাহাতে তিনি এইসমস্ত তথ্য দেশবাসীর মধ্যে প্রকাশ করিতে অসমর্থ হইতে বাধ্য থাকেন।

ইহাই হইল সেই প্রমাণহীন কাহিনী।"

কাহিনী সমাপ্ত হইল। প্রধানশিক্ষক আপন বক্তব্য বিস্তারিত জানাইয়া পুনরায় নিজ আসন গ্রহণ করিলেন শ্রেণীকক্ষে এক অদ্ভুত নীরবতা নামিয়া আসিল। আমিও নীরব রহিয়া ভাবিতে থাকিলাম – সুবর্ণসুযোগ উপস্থিত এবং কোনও প্রকারেই যাহাতে ইহা নষ্ট না হইয়া পড়ে তাহার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখা প্রতিটি দেশপ্রেমিক ভারতবাসীর কর্ত্তব্য। যে কোনও প্রকারে বর্ত্তমান প্রধানমন্ত্রীর ন্যায় দৃঢ়চিত্তের লৌহমানবকে পুনরায় ২০১৯ সনে প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করিতেই হইবে এবং নচেৎ আমাদিগের বহু প্রত্যাশিত স্বাধীনতা অধরা রহিয়া যাইবে। বলা বাহুল্য, সেই স্বাধীনতা কমিউনিস্টকীটদষ্ট মিথ্যা প্রচার হইবে না বরং প্রকৃত স্বাধীনতার স্বাদ পাইব।

অন্ত্য পর্ব

অতঃপর পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে এই কাহিনীভিত্তিক আলোচনা শুরু হইল। আলোচনায় অংশগ্রহণ হইতে নিজেকে বিরত রাখিয়াছিলাম কারণ প্রথমত, আমি একজন মূর্খ, দ্বিতীয়ত, প্রথমোক্ত কারণে আমি শিখিতে চাহিয়াছিলাম, অল্পবিদ্যার অধিকারী হইয়া আলোচনায় অংশগ্রহণ করিলে সেই শিক্ষা হইতে নিজেকে বঞ্চিত করিতাম। যাহা হউক, এই আলোচনায় যাঁহারা অংশ লইয়াছিলেন তাঁহারা প্রত্যেকেই যে সদুদ্দেশ্যে অংশ লইয়াছিলেন এমন নহে, কাহারো কাহারো বাক্য শুনিয়া তাঁহারা যে দেশদ্রোহীমনোভাবাপন্ন তাহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইয়াছিল। এতদসত্ত্বেও সেই মহাত্মা তাহাদিগের সহিত যেরূপ সহিষ্ণু ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা নিঃসন্দেহে প্রত্যেকের নিকট শিক্ষণীয়।

পূর্ব্বেই কহিয়াছি আলোচনার এই অংশ আমি শ্রোতা হিসেবে শুনিয়াছিলাম এবং পূর্ব্ববৎ শর্টহ্যান্ডে লিখিয়া লইয়াছিলাম।

নীরবতা ভঙ্গ হইল এক ছাত্রীর হতাশাজনিত মন্তব্যে। চোখে দুই হাতে চাপিয়া ধরিয়া তিনি কহিলেন –"oh my god (অহো আমার ভগবান, এইরূপে ইংলন্ডদেশীয়গণ আপন বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন)। আমি জানিতাম আমাদের দেশে পররাষ্ট্রমন্ত্রীই মূলত বিদেশমন্ত্রীর কর্ম সম্পাদন করিয়া থাকেন। কিন্তু এক্ষণে যাহা জানিলাম তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝিতে পারিতেছি সামান্য শব্দের হেরফের করিয়া দেশদ্রোহীগণ দেশভক্তের রূপ ধরিয়া আমাদিগকে কিরূপে মূর্খ

বানাইয়া রাখিয়াছে।" আমারও মস্তক ঘর্মাক্ত হইতেছিল। কিন্তু আরেকটি মন্তব্য শুনিয়া সর্বাঙ্গ জ্বলিয়া উঠিল (ইহাকে আমরা অবশিষ্ট অংশে ফক্কর বলিয়া সম্বোধন করিব, এই নামকরণের যৌক্তিকতা পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিবেন)। সেই বক্তব্যটি হল এইরূপ – এক, Ambassador (বিদেশে একপ্রকার রাষ্ট্রপ্রতিনিধি) এবং high commissioner (বিদেশে আরেকপ্রকার রাষ্ট্রপ্রতিনিধি) -এর পার্থক্য কি, আপনি বলিয়াছেন রাষ্ট্রদূত নাই, হাইকমিশনার বর্ত্তমান, বাংলা ও ইংরিজি মিলাইয়া বিভ্রান্ত। দুই, পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও বিদেশমন্ত্রী এই দুইয়ের ইংরাজি অর্থ কি"। প্রধানশিক্ষক মহাশয় ইহার উত্তর দিবার পূর্ব্বেই একজন একজন কহিল – "আরও একটি উদাহরণ, যাহার দ্বারা স্পষ্ট বুঝা যায় যে ভারত পরাধীন। খেয়াল করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবেন নির্ব্বাচনের ফল ঘোষিত হইলে মোট ৫৪৩-টি লোকসভা আসনের ফল জানা যায়। অবশিষ্ট দুইটি ইংলন্ডের পার্লিয়ামেন্টের নিম্নকক্ষের প্রতিনিধিদিগের কারণে সংরক্ষিত।" এই মন্তব্য শুনিয়া ফক্কর বলিয়া উঠিলে – "উক্ত আসন দুটি কোনও ইংলন্ড নাগরিকের কারণে নহে, দেশীয় অ্যাংলো ইন্ডিয়ান নাগরিকগণ উক্ত আসনে রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক মনোনীত হইয়া থাকেন"।

- আমি উহা জানি, কিন্তু আমি তাহা বলি নাই, আমি স্পষ্ট কহিয়াছি, ইংলন্ডের পার্লিয়ামেন্টের নিম্নকক্ষের সদস্য প্রতিনিধিদিগের কারণে দুটি আসন সংরক্ষিত

- আপনার বক্তব্য মানিয়া লইলে হয় মানিয়া লইতে হয় বাংলা ছবির চরিত্রাভিনেতা জর্জ বেকর ইংলন্ড পার্লিয়ামেন্টের নিম্নকক্ষের সদস্য অথবা লোকসভার আসনসংখ্যা ৫৪৭

এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই ফক্কর সম্পূর্ণ রবাহূত হইয়া "কেন ১৯৪৭ সনের ১৫-ই আগস্টের পরেও ইংলন্ড রাজপুরুষগণ দেশীয় প্রশাসনিক কান্ডে অংশ লইয়াছিল" অন্য এক ছাত্রের এই প্রশ্নের উত্তরে বলিয়া উঠিল – "হইতে পারে তৎকালীন দেশীয় রাজনৈতিক নেতৃত্ব দেশ পরিচালনা বিষয়ে অনভিজ্ঞ ছিল"। এহেন দেশদ্রোহীভাবাপন্ন বক্তব্য শুনিয়া প্রধানশিক্ষক অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন – What a bogus logic. Nehru fooled us with this rubbish logic. (কিরূপ অপ্রাসঙ্গিক যুক্তি, নেহেরু এইরূপ আবর্জ্জনাপূর্ণ যুক্তিসহকারে আমাদিগকে বোকা বানাইয়াছে)। প্রধানশিক্ষকের কণ্ঠস্বর শুনিয়া ফক্কর পুনরায় তাহার পূর্ব্বপ্রসঙ্গে ফিরিয়া গিয়া বলিল যে সে মানিয়া লইতেছে যে নেহেরু অত্যন্ত ধুরন্ধর দুষ্ট প্রকৃতির মানুষ ছিল। কিন্তু তাহাতে কিরূপে প্রমাণ হয় যে এক, ভারতে বিদেশমন্ত্রী নাই, দুই, ভারত রাষ্ট্রদূত নিয়োগে অক্ষম এবং তিন, দেশীয় সংসদের নিম্নকক্ষে দুইটি আসন বৃটিশ রাজপ্রতিনিধিদিগের জন্যে সংরক্ষিত। এমতাবস্থায় যে কোনও অতি স্থিরচিত্তের দ্বারাও নিজেকে সংযত রাখা কঠিন, প্রধানশিক্ষকও তাহার ব্যতিক্রম হইলেন না। তিনি ইংরাজিতে কহিয়া উঠিলেন – What is the necessity of proof ? All these are bare facts. (প্রমাণের কি প্রয়োজন, এই সমস্ত নগ্নসত্য মাত্র)। প্রধানশিক্ষকের এইরূপ রুদ্রমূর্তি দেখিয়া প্রত্যেকেই নীরব হইলেও ফক্কর দমিবার পাত্র নহে। সে নিজেকে মহাত্মা প্রধানশিক্ষকের উর্দ্ধ্বে নিজেকে প্রতিষ্ঠা করিবার দিবাস্বপ্নে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। বলিল – আপনার বক্তব্যের কি ইহাই অর্থ যে ভারতের কোনও বিদেশমন্ত্রী নাই, আইনগত উপায়ে আমরা রাষ্ট্রদূত নিয়োগে অপারগ এবং ভারতীয় সংসদে নিম্নকক্ষে সদস্যসংখ্যা ৫৪৭ ?

আমি অধীরআগ্রহে অপেক্ষা করিতেছি প্রধানশিক্ষক মহাশয় কি উত্তর দেন, এমনসময় বাহিরে কি নজর করিয়া "ওরে অ ক্যাবলা, দেখ দেখ বিড়েলে সবডা ছাগলাদ্য ঘ্রেত খেয়ে গেল" বলিতে বলিতে সবেগে শ্রেণীকক্ষ হইতে প্রস্থান করিলেন। হতভম্ব হইয়া সেই পথের দিকে চাহিয়া রহিয়াছি, এমন সময় 'ঢং' করিয়া একটি শব্দে সম্বিৎ ফিরিল। বুঝিলাম রাতের মত পঠনপাঠন সমাপ্ত হইয়াছে।

ঝরাপাতার কথা

সুব্রত চৌধুরী

অক্টোবর ৭, ২০১৭

প্রিয় এথেল,

বছরের শেষদিনে আমার তোমার শহর যখন বর্ষবরনের প্রস্তুতিতে ব্যস্ত, আমি তখন এই রাজ্য ছেড়ে যাওয়ার প্রস্তুতির মাঝে লিখছি তোমায়। আমার এক সহযোদ্ধার হাতে দেব চিঠিটা।জানি না সে কি করে তোমার কাছে পৌঁছে দেবে, অদৌ তুমি পাবে কি না! তোমার সাথে শেষ দেখা হয়েছিল দু'মাস আগে কালীপুজোর রাতে। পুলিশের নজর এড়িয়ে তোমার পাড়ায় পৌঁছনোটা খুবই কঠিন আর বিপজ্জনক ব্যাপার ছিল।পরে তার জন্য আমার কমরেডদের কাছ থেকে হঠকারী আখ্যাও পেয়েছি। কিন্তু কি করব বল এথেল আমার। হয়ত আমাদের আর দেখা হবে না কখনো, সমাজ বদলানোর যুদ্ধে হয়ত আমরা দুজনেই শহীদ হব।

তোমার মনে পড়ে সেই দিনটার কথা? কলেজের গেট মিটিংয়ে আমি ভিয়েতনামে আমেরিকার নির্যাতনের বিরুদ্ধে বলছিলাম, তুমি মন্ত্রমুগ্ধের মত আমার কথা শুনছিলে। মিটিংয়ের পরে তোমার বন্ধু চিত্রা আলাপ করিয়ে দিয়েছিল। তুমি আমায় বলেছিলে, কথা তো বেশ ভালোই বলেন। কিন্তু আমেরিকার উপর আপনার রাগ তো ওটা বড়লোকের দেশ বলে, আমাদের মত গরীব নয় তাই। আমি তোমায় ভিয়েতনাম যুদ্ধের ইতিহাস বুঝিয়েছিলাম। এরপর যখনই তোমাদের কলেজে যেতাম কোন মিটিংয়ে, তুমিও হাজির হতে। পরে তোমায় অনুরোধ করেছিলাম জগু মিস্ত্রী লেনে আমাদের সংগঠনের অফিসে আসতে।

মনে পড়ে এথেল, খালধারের বস্তিতে সেই পার্টি ক্লাসের কথা! সেই রমেনদা, লুংগী আর পানজাবী পরে ঘন্টার পর ঘন্টা মার্কসীয় অর্থনীতি বুঝিয়ে যেত। আমার সাথে ভারতের রাষ্ট্রচরিত্র বিশ্লেষনে কত ঝগড়াই না হয়েছে। আমরা নতুন দলে এলেও রমেনদা পুরনো পার্টিতেই রয়ে গেল। শুনেছিলাম অজয়বাবুর মন্ত্রীসভায় রমেনদা নাকি জায়গা পাবে, শেষ পর্যন্ত তা হয় নি। এই জংগলে সব খবর সময়ে পাই না। আমরা এখানে আসার আগে নকশালবাড়ী কি কম্যুনিষ্ট পার্টির নাম এখানকার লোকে জানতই না। এখানে ভারতরাষ্ট্রের শাসনব্যাবস্থা পৌছেছে কিনা সন্দেহ হয়। উঁচুজাতের জোতদারেরাই এখানে রাজার মত শাসন চালায়। খালপাড়ের বস্তির মানুষদের অবস্থা দেখে তোমার চোখে জল এসে গিয়েছিল, এখানে এলে তুমি কি করতে তাই ভাবি। তবে এখানকার মানুষদের সংগঠিত করেছি। জমির লড়াই শুরু হয়েছে, জোতদাররা ভয় পেয়েছে। এখানে আমার কাজ শেষ, স্থানীয় কমরেডরা দায়িত্ব নেবেন। আমি চলে যাব অন্য প্রদেশে। আমায় নিয়ে চিন্তা কোরো না, আমরা বিপ্লবের জন্য বলিপ্রদত্ত। আমি তো নিজের দেশেই থাকব। চে গিয়েছিলেন অন্য দেশে, রেজি দ্য ব্রে অন্য মহাদেশে। বিপ্লব রপ্তানি করা যায় না জানি। বিপ্লবের জ্বালানিটা স্থানীয় হতে হবে, কিন্তু দেশলাইয়ের কাজটা তো আমরা করতেই পারি।

আমার এথেল, দলবেঁধে শান্তিনিকেতন বেড়াতে যাওয়ার কথাগুলো মাঝেমাঝেই মনে পড়ে যায়। কোপাইয়ের ধারে বসে একের পর এক কবিতা পড়ে শুনিয়েছিলাম তোমায়। সবই তোমার জন্য লেখা, আমার কবিতা তো তুমিই। কতদিন কোন কবিতা লিখি নি, পড়িও নি। বিপ্লব ডাক দিয়েছে, কবিতা নিয়ে খেলা করে সময় নষ্ট করার দিন হাতে নেই। আমার কলম আঁচড় কাটবে ভারতবর্ষ নামের এই দেশটার বুকে। রচিত হবে এক শোষনহীন সমাজের আখ্যান। এথেল, এথেল আমার, যখনই আমার কথা মনে আসবে, কান্না নেমে আসবে তোমার চোখে, মনে কোরো রোজেনবার্গ দম্পতির কথা। ওরা আমেরিকান সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে প্রান দিয়েছিল। ওদের মতই আমাদেরও লক্ষ্য শ্রমিকশ্রেনীর একনায়কতন্ত্র। হয়তো প্রানও দেব আমরা।

এবার বেরোতে হবে এক অজানা জায়গার উদ্দেশ্যে, এক অজানা পথে। তাই শেষ করছি। ভালো থেকো এথেল আমার।

তোমার জুলিয়াস।

১৯৭২ সালে এই চিঠিটা কলকাতা পুলিশের গোয়েন্দা শাখার হাতে আসে। ডেবরার কাছে নকশালদের কোন ঘাঁটিতে নাকি পাওয়া যায়। যেহেতু কেউ ধরা পড়েনি, পুলিশের ঘাড়ে দায়িত্ব আসে এথেল আর জুলিয়াসকে খুজে বের করার। তখনো মধ্য কলকাতার একটি এলাকায় অনেক অ্যাংলো ভারতীয়ের বাস ছিল। সেখানে খোজ নিয়ে কোনো জুলিয়াস না পাওয়া গেলেও, দুই এথেলকে পাওয়া গেল। তাদেরকে তুলে আনা হল ভবানী ভবনে। হাজার জেরাতেও কোনও জুলিয়াস কিংবা নকশালবাড়ীর নামগন্ধ পাওয়া গেল না। তার উপরে তারা কেউই স্কুলের গন্ডী ছাড়ায় নি। অ্যাংলো সমাজের কর্তারা হট্টগোল শুরু করল। তাদেরকে ছেড়ে দিতে হল। দু চারমাসের পর দুই এথেলের পরিবারই তাদের নিরাপদ গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া পাড়ি দেয়।

দুই এথেল তো মুক্তি পেল, কিন্তু পুলিশের মাথায় চিন্তা। গোয়েন্দাকর্তা রায়সাহেব এই চিঠি নিয়ে হাজির হলেন সবরকম সরকারের সংগে থাকা কমিউনিষ্ট পার্টির এক বুদ্ধিজীবি নেতার কাছে। তিনি ওই চিঠি একবার পড়েই বললেন, এ তো এথেল রোজেনবার্গ আর জুলিয়াস রোজেনবার্গের নাম। আমেরিকার কম্যুনিষ্ট ছিলেন ওনারা। গুপ্তচরবৃত্তির অভিযোগ এনে ওদের ফাঁসি দেওয়া হয়। সুভাষবাবুর লেখা রোজেনবার্গ পত্রগুচ্ছ পড়তে পারো। এই বিদ্যে নিয়ে কি করে যে গোয়েন্দাগিরি কর জানিনা! মানুবাবু শুধুশুধু তোমাদের মাইনে দেয়। এথেল-জুলিয়াসের সন্ধান এখানেই ধামাচাপা পড়ে।

বছরদশেক পরে অন্ধ্রপ্রদেশের শ্রীকাকুলমে পুলিশি এনকাউন্টারে মৃত গৌরীআম্মার ব্যাগ থেকে এক খাতা পাওয়া যায়; তাতে লেখা ছিল: জুলিয়াস তুমি নেই, তোমার এথেল কিন্তু তোমার দেখানো স্বপ্নের পিছনে আজো ছুটে চলেছে।

র‍্যান্ডম দুঃখবিলাসিতা

শাক্য মুনি

মে ২৬, ২০১৭

সন্ধের কিছু পরে চাঁদ উঠেছিল, অতি বিলম্বিত। সুর থেকে মীড় গড়িয়ে পড়ে যেমন, মধুগামিনী, অনূঢ়ার নির্লাজ আতপ যেভাবে স্ফুরিত হয় ক্রমে প্রেমিকের স্পর্শে, শুক্ল পঞ্চমীর পোকায় কাটা চাঁদ, গৌরীপুর জুটমিলের পাঁশুটে চিমনির পিছন থেকে। বোমা গুলির শব্দ ইদানিং আর... দাঙ্গার রাত্রি শেষে মানুষের কালঘাম জয়ী হয় প্রতিবার! মাদুলির ভিতর থেকে কথা বলে ওঠেন সহস্র মন্ত্রের ঋষিরা। তাঁদের মার্শমেলো হাসি লেগে থাকে মানুষের কোমরে ও কবজিতে। চাঁদের মানুষ তাঁরা, মহাকাব্যের নিশ্চয়তায় বাঁধা তাদের পাঁচালী জীবন।

ইদানিং এইসব স্বপ্নই দেখে চলি আমি। বসন্তের হলদেটে পাতারা সারাদিন ঝরে চলে অবিরাম। প্রেমহীন মদের স্বেদগন্ধে খুঁজে পাই সহস্র চিরুনি। স্বর্গের উপকূল থেকে ভেসে আসে শীত, রিফিউজি শিশুর বেশে। মুঠো ভরা তার অনাত্মীয় বালি আর কাদা, যা কিছু আপন। জীবনের প্রেম আর বিভ্রমকে মৃত্যুর তুলি দিয়ে এঁকেছিল যে সমস্ত কবি আর শিল্পীরা, আজ তারা শেষ ট্রেন ধরে চলে গেছে শহর থেকে বহু দূরে। বিমর্ষ রাতের ওপারে নতুন কোনও দিনের আশ্বাস যোগাবার কেউ নেই আর। সূর্যের উজ্জ্বলতা চেটে নিয়েছে চেরনোবিলের টিকটিকি। তার কাঁচের চোখের ভিতরে থেকে চেয়ে আছে এক বোবা নারী। আমাদের মা সে। সন্তানের শবযাত্রার দিকে ছুঁড়ে দিচ্ছে পুরুষকার ঘৃণা, নির্বাক ভঙ্গিমায়।

জ্যোৎস্নায় ভেসে যাওয়া ময়দানের কালচে প্রান্তর দিয়ে টলমল হেঁটে আসছে চার্ণকের ভুত। হাতে রক্তাক্ত ভোজালি, অন্য হাতে মৃত মোরগ ঝুঁটি। প্রতিটা সভ্যতার পত্তনে এভাবেই দলে দলে প্রাণ দিয়েছে অজস্র মোরগ ও ইঁদুরেরা। পরানখাগী মা-মাগী প্রকৃতিকে রক্ত দিয়ে স্নান করাতে করাতে অমৃতের পুত্রকন্যাদের কেটে গেছে সহস্র বছর। নদীর স্রোতের বাঁকে ভেসে গেছে মাহেঞ্জোদারো-মানুষের সৌখীন খড়ম, ঘোলাটে চশমা, আচারের বয়াম। তাদের জন্য কোথাও কোনো শহিদ মিনার তৈরি হয়নি। আমাদের নিয়েও হবেনা। আমাদের হারিয়ে যাওয়া ছাতারা চিঠি লিখে জানাবেনা কুশল সংবাদ। সভ্যতার যুদ্ধবিদ্ধস্ত চৌমাথায় ফাটল ধরা দেওয়ালের গায়ে ঝোলানো লেটারবক্সে কেউ ফেলে যাবেনা আমাদের ঠিকানা লেখা প্রেমপত্র।

দ্রোণাচার্য্য

তিয়াসা চ্যাটার্জী

সেপ্টেম্বর ১১, ২০১৭

ক্ষমতার নাম স্থান, কাল, পাত্র ভেদে ভিন্নতর হয়। হয়ত তার চরিত্রও এক থাকে না। কিন্তু একটা জায়গায় সে তার মৌলিকতা বজায় রাখে। তা হল কার্টেজিয় ডুয়ালিস্ট গঠন, যা আসলে নামে ডুয়ালিস্ট হলেও আখেরে মনিস্ট। যেখানে সেল্ফের চশমার কাচে আদারকে দেখা হয় এক অপেক্ষাকৃত নিম্নতর, ইতরতর দ্বিতীয় শ্রেণীর সত্ত্বা হিসাবে। এই ক্ষমতার নাম কখনও ব্রাহ্মণ্যবাদ, কখনও পুঁজিবাদ, কখনও পিতৃতন্ত্র আবার কখনও বা নিছক এলিটিজম অথবা ব্যক্তিগত পর্যায়ে যা সবচেয়ে ভয়ঙ্কর, সেই ম্যাল-অ্যাডাপটিভ নার্সিসিজম।

পর্ব ১

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে দ্রুত পদে হেঁটে চলেছেন দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণ। শ্বেতাম্বর প্রৌঢ়ের শরীরের গড়ন অস্বাভাবিক শীর্ণ ও মধ্যভাগে ঈষৎ বঙ্কিম। অক্ষিদ্বয় বৃহৎ ও গোলাকার। অচ্ছৎপটলে গঞ্জিকাসক্তসুলভ কিঞ্চিৎ রক্তিমাভা। চলার ভঙ্গীমা ঋজু নয়। কিন্তু শরীরের তপ্তকাঞ্চন বর্ণ তাঁর আর্যত্বের সাক্ষর বহন করছে। দর্পিত মুখে ব্রহ্মতেজের দীপ্তি বর্তমান।

আজ কিন্তু ব্রাহ্মণের মন কিঞ্চিত বিক্ষিপ্ত। আজ প্রিয় শিষ্য অর্জুন তাঁকে অভিযোগ করেছে তিনি তাকে শব্দভেদী বাণের শিক্ষা থেকে বঞ্চিত রেখে কোনো এক শূদ্রকে সেই শিক্ষায় সমৃদ্ধ করছেন। ধৃতরাষ্ট্রের উপর দুর্যোধনকে নিয়ে যে স্নেহান্ধ পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ আকছার ওঠে, সেটা দ্রোণের ক্ষেত্রেও অর্জুনের বিষয়ে খুবই সত্য। কিন্তু দ্রোণ তাঁর সুমিষ্ট ও ভদ্র মুখোশের আড়ালে অনেক কিছু সহজে গোপন রাখতে পারেন, যা নৃপতি হয়েও ধৃতরাষ্ট্র পারেন না। কে এই শূদ্র তরুণ যে অর্জুনের অহং এ আঘাত দিয়েছে! দ্রোণ ছাড়া যে বিদ্যা ক্ষত্রিয়কূলেও কারও নাগালে আসে না, এই শূদ্র তরুণ তা রপ্ত করল কিভাবে!

একটা সারমেয় অনেকক্ষণ ধরে চিৎকার করছে। আচার্যের চিন্তাজাল মাঝে মাঝেই ছিন্ন হচ্ছিল এই শব্দদূষণে। একটা সময় খুব বিরক্ত হয়ে কুকুরটার দিকে তাকালেন আচার্য। তখনই আচমকা তাঁর নিজেকে জীবাশ্ম মনে হল। সাতটি শর নিঃশব্দে কোথা থেকে ছুটে এসে চতুষ্পদ প্রাণীটির কণ্ঠরুদ্ধ করল। সামনে তাকিয়ে দেখতে পেলেন এক কৃষ্ণাঙ্গ তরুণকে। যে বাণ নিক্ষেপ করার সময় লক্ষ্যের দিকে না তাকিয়েই লক্ষ্য ভেদ করেছে।

একবিংশ শতকের এক মিলেনিয়াল বিস্ময়বিমূঢ় চোখে এই মহাকাব্যীয় দৃশ্যপট অবলোকন করছে। মহাকাব্যের চরিত্ররা কেউ তাকে দেখতে পাচ্ছেন না। কৃষ্ণাঙ্গ তরুণের মুখের যৌবনের দীপ্তি, গৌরবর্ণ বৃদ্ধের মুখে ফুটে ওঠা ব্রহ্মতেজ – সবকিছু কি মহাকাব্যীয় ভাবে দৃষ্টিনন্দক।

একলব্য দ্বিজশ্রেষ্ঠকে দেখে আপ্লুত হয়ে এসে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করলেন।আচার্যের ললাটে চিন্তার ভাঁজ পড়ল। তাঁর মুখের অভিব্যক্তি দুর্বোধ্য। গম্ভীর স্বরে বললেন, "কার কাছে শিখলে এই বিদ্যা? তোমার অস্ত্রগুরু কে?"

একলব্য ধন্য অনুভব করলেন। আজ পর্যন্ত যাঁকে ধ্যান করেছেন দেবমূর্তির মত, সেই আচার্য আজ সামনে। তাঁকে সম্বোধন করে কথা বলছেন, তাঁর চোখে চোখ রেখে। কৃতার্থ গলায় একলব্য বললেন, "হে আচার্য, আপনি আমার অনুপ্রেরণা। আপনার মূর্তিকে সামনে রেখেই অভ্যাস করেছি।"

দ্রোণর আয়তচোখে শীতল কুটিলতার ছাপ পড়েই মিলিয়ে গেল। তিনি নিজের মনের ছাপ মুখে পড়তে দেন না। ওষ্ঠাধরে স্মিত হাসি ফুটিয়ে বললেন, "তাহলে তো আমার একটা গুরুদক্ষিণা প্রাপ্য হয় বৎস্য।"
-"আদেশ করুন আচার্য।" নতমুখে বললেন একলব্য।

দ্রোণাচার্য কিছুক্ষণ পর তাঁর গুরুদক্ষিণা গ্রহণ করে স্থানত্যাগ করলেন। পিছনে পড়ে থাকা শারীরিক ও মানসিক ভাবে রক্তাক্ত তরুণের দিকে ফিরেও দেখলেন না। এই তরুণটি কিন্তু অশ্বত্থামার সমবয়স্ক, যে অশ্বত্থামাকে রাজপুত্ররা সামান্য বিদ্রূপ করায় তিনি ক্রোধাগ্নি সংবরণ করতে পারেননি। তবে ব্রাহ্মণসন্তানের সাথে কি আর মানবেতর শূদ্রসন্তানের তুলনা হয়!

ঠিক তখন ২০১৬ র সেই নীরব দর্শক তরুণী মহাকাব্যে উপেক্ষিত একলব্যের কাছে এগিয়ে এল। তারপর একলব্যকে বুকে টেনে নিল। পৃথিবীর উষ্ণতম বন্ধুত্বের আলিঙ্গনে আবদ্ধ করে বলল, "কমরেড।"

এই আলিঙ্গন নারীপুরুষের প্রেমস্পর্শ বা যৌনগন্ধী আলিঙ্গন নয়। এই আলিঙ্গন কমরেডশিপের আলিঙ্গন, এই আলিঙ্গন ভাইকে ভগিনীর সমানুভূতি জানানোর আলিঙ্গন। তরুণীটি একলব্যকে বলল, "ক্ষমতার অলিন্দের মানুষরা সাব অল্টার্নের আপন হয় না কমরেড। নিজের রক্ত যদি ঝরাতেই হয় ওদের হয়ে নয়, ওদের সিংহাসন থেকে টেনে নামানোর প্রতিরোধ গড়ে তুলে ঝরাও। আজ তোমার রক্তের নামে শপথ রইল, দ্রোণাচার্যকে তোমার প্রতিটা রক্তবিন্দুর মূল্য শোধ করতেই হবে।"

পর্ব ২

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

বিষয়টা পুরোটাই একটা অ্যাক্সিডেন্ট ছিল। মানে আমার জীবনশৈলী বা সামাজিক অবস্থান যা তাতে এটা কোনো ভাবেই হবার ছিল না। তবে এই ধরণের ঘটনা কবেই বা নিয়ম মেনে ঘটে।

ওকে প্রথম কবে দেখেছি আমার মনে নেই। সেকেন্ড সেমেস্টার পর্যন্ত ক্লাসে প্রায় দুশো'র কাছাকাছি স্টুডেন্ট থাকায় আলাদা করে কাউকে লক্ষ করা কঠিন। একদিন গ্যালারি থেকে একটা সুন্দরী মেয়ে আমাকে র‍্যাশনাল এক্সপেকটেশন নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিল। উঠে দাঁড়ানোর সময় তাকে দেখেছিলাম, কালো জামা, সবুজ স্কার্ট আর ঈষৎ লালচে খোলা চুলের একটা গমরঙা সুন্দর মেয়ে। ওটা কি ও ছিল! হতে পারে। মোট কথা সেভাবে দাগ কাটার মত কিছু ঘটেনি। ওকে কাছ থেকে প্রথম দেখি পলিটিকাল ইকোনমির ক্লাসের দিন। চোখে পড়তেই হত কারণ মাত্র তিনটে স্টুডেন্ট ছিল, অপর্ণা, ও আর একটা ছেলে, বোধহয় বিষ্ণু নাম। খুব ব্রিলিয়ান্ট না হলে বা উল্লেখযোগ্য গোলমাল না করলে ছেলেদের কথা আমার বড় একটা মনে থাকে না। ওকে দেখতে ছিল অনেকটা স্কুলের মেয়েদের মত। মিজেট। ছোটখাট চেহারা, হাইট পাঁচ দুই এর বেশী কোনভাবেই হবে না। গায়ের রঙ উজ্জ্বল গমের মত। মুখটা

মাঝে মাঝে বেশ গোলাপি দেখাত। মানে কোন কারণে ও এমব্যারাসড বা অপমানিত বোধ করলে। আর এটা দেখার জন্যই আমার ওকে অস্বস্তিতে ফেলতে বেশ ভাল লাগত।

রূপের নানারকম উপমা ব্যবহার করা হয়। চোখ ধাঁধানো, চুম্বক, চোখ ফেরানো যায় না-ইত্যাদি ইত্যাদি। যাই হোক একই রূপকে কে কিভাবে দেখবে এটা সাবজেক্টিভ। আমার মতটা বলি। ওর ক্ষেত্রে ওর রূপটা ছিল ঠিক ওর নামের বিপরীত। একটা মানুষ যে শুধু চেরাপুঞ্জির হাজার বছরের বর্ষার সমষ্টিতে তৈরী হয়েছে। বা প্রাচীন ভারতের অজানা কোনো গহন মন্দিরের সবচেয়ে বিষাদগ্রস্তা দেবদাসীর চোখের জল দিয়ে। ওর নাম ছিল তৃষ্ণা, তৃষ্ণা চ্যাটার্জী। পৃথিবীর বুকের স্নিগ্ধতম আগুন। শুধু কি পৃথিবীর বুকেরই!

কিন্তু তা সত্ত্বেও এটা হবার কথা ছিল না। ঐ মেয়েটা, চিরাচরিত বাংলা মাধ্যমের মেয়েগুলো যেমন হয় আর কি! ইংরাজীর উচ্চারণ ক্ষেত্রবিশেষে বেশ পূর্ববঙ্গীয়দের মত, এমনকি দু একবার বানান পর্যন্ত ভুল করতে দেখা গেছে। যেমন এম ফিল বানানে দুটো এল ব্যবহার করা! তারপর ভদ্রতাবোধের চূড়ান্ত অভাব। মাঝে মাঝে ওর স্বরটা রীতিমত কন্ডেসেন্ডিং শোনাত।

ততোধিক খারাপ ড্রেস সেন্স (একটা সুন্দরী মেয়ের পোশাক দেখে যদি হাড়গিলে মূর্খ খুনী চারু মজুমদারকে মনে পড়ে তাহলে নান্দনিকতার প্রতি এর চেয়ে বড় অবিচার হয়না) এবং নিহিলিস্ট পলিটিকস তথা ফাটকা মস্তানির প্রতি বিচিত্র আকর্ষণ। ওকে ওর গুরুদেব চারু মজুমদারের মত একটা ডগম্যাটিক লেফটিস্ট ছাড়া আমার কিছুই মনে হত না। মানে খুবই গণ্ডগোলের আপ ব্রিঙ্গিং এর ফল। ওকে যারা কাছ থেকে দেখেছে তাদের একটা বিষয় ফোরকাস্ট করতে অসুবিধা হবার কথা নয়। এ মেয়ে হয় কোনো জঙ্গলে কুত্তার মত গুলি খেয়ে মারা পড়বে অথবা শেষ জীবনটা জেলে পচবে। ভবিষ্যৎ নিয়ে কোনো সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা নেই। পুরোপুরি হোপলেস কেস। আসলে চ্যালারা তো গুরুর পথেই হাঁটবে। তবে ও যখন প্রথম আমার মানসিক অশান্তির কারণ হয়, তখন এত সব জানা ছিল না।

ব্যাপারটা কবে থেকে শুরু হয়েছিল ঠিক মনে নেই। এটা একটা দুর্ঘটনা। একটা ডেলিশাসলি অ্যাট্রাকটিভ দুর্ঘটনা। ও ক্লাসে রোজ একটা ট্যাব বা কিন্ডল গোছের কিছু নিয়ে আসত। তাতে সিলেবাস এবং রেফারেন্স বইয়ের সফট কপি থাকত। ঐ ট্যাব থেকে আমাকে একটা বই দেখাচ্ছিল। এত দ্রুত পাতাগুলো সরিয়ে দিচ্ছিল যে ভারি পাওয়ারের চশমায় আমার দেখতে অসুবিধা হচ্ছিল। আমাকে চশমাটা খুলে ওর কাঁধের উপর দিয়ে ঝুঁকে পড়ে দেখতে হচ্ছিল।ও বসে ছিল বেঞ্চে, আমি ওর পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম।হঠাৎ করে একটা মেয়ের বয়সী ছাত্রীর সাথে এতটা নৈকট্য অস্বস্তিকর। তার উপর আমাকে ঝুঁকে থাকতে দেখেই বোধহয় ও একটু গুটিয়ে সরে যাচ্ছিল। এটা নিয়ে আমার দীর্ঘদিন অস্বস্তি ছিল। ও কি মনে করে আমাকে? আমি একটা পারভার্ট? ইচ্ছা করে ওর শরীর ছোঁয়ার চেষ্টা করছি? আমার আভিজাত্যের সঙ্গে হয়ত চিন্তাটা মানানসই নয়, তাও আমি জানি ডিপার্টমেন্টের প্রচুর ছাত্রী আমার একটু প্রশ্রয় পেলে ধন্য হয়ে যায়। সেখানে ও? পড়াশোনায় এমন কিছু নয়। তেমন আহামরি সুন্দরীও নয়। আমার টেস্ট এত নিম্নস্তরের নয়। ওকেও তাই প্রতিদিন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিই অপর্ণাকে আমি সবচেয়ে বেশী পছন্দ করি। একই প্রশ্নের উত্তর অপর্ণার থেকে পেলে প্রশংসা আর ওর ক্ষেত্রে না শোনার ভান। তাছাড়া পলিটিকাল ইকোনমির ক্লাসে অন্তত গোটা থার্ড সেমিস্টারটা আমি ওর অস্তিত্বটা সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করতাম। কে না জানে অবজ্ঞাও

একটা বার্তা। তার জন্য আলাদা করে রূঢ় হবার দরকার হয় না। কিন্তু সমস্যা হচ্ছে ওর প্রতি আমার এই নিস্পৃহতাটার বিষয়ে আবার ও চরম নিস্পৃহ ছিল। অবশ্য জানি না ওটা অভিনয় ছিল কিনা!

পড়াশোনার কথা বলতে গেলে অ্যাকাডেমিক রেকর্ড তৃষ্ণার সবচেয়ে ভাল, তবে এই ক্লাসে তিনজনেই ভাল পড়াশোনা করে। যাই হোক, বিষ্ণু কি করল সেটা প্রাসঙ্গিক নয়।

কোথায় যেন একটা চাপা উন্নাসিকতা রয়েছে তৃষ্ণার মধ্যে। আমার কেবিনে কখনও এলে আমাকে একটা বাড়তি কথা বলতে দেয় না। যান্ত্রিক ভাবে কাজের কথাটুকু বলেই একটা যাই যাই ভাব। যেন কত ব্যস্ত। ঠিক আছে, কুকুরের ঘি সহ্য হয় না। আমার হাতে দুটো পেপারের মার্কস আছে, আর এটা একটা বোকাও জানে যে মাস্টার্সের সময় নাইনথ পেপার বলে একটা জিনিস থাকে। শুধু পড়াশোনা করেই কেউ ভাল রেজাল্ট করে না।

ও আমাকে সবচেয়ে বেশী অফেন্ড করে বসল থার্ড সেমেস্টারের শেষ ক্লাসটার দিন। ওটা ছিল মার্কসিয়ান ইকোনমির ক্লাস। এই ক্লাসে মোট আঠেরো জন ছাত্র ছাত্রী আছে, পলিটিকাল ইকোনমি ক্লাসের মত জনশূন্য নয়। ডিসেম্বরের ঠান্ডার মধ্যেও ও একটা পাতলা লুজ ল্যাভেন্ডার টি শার্ট পরে বসেছিল। কোন শীতবস্ত্র নেই। রোজকার মতই এলোমেলো খোলা চুল, চেহারায় ন্যূনতম মেক আপ বা জুয়েলারির চিহ্ন মাত্র নেই। একটুকরো গোলাপি আলোর মত স্বপ্নালু দেখাচ্ছিল ওর ঢলঢলে মুখটা। ঐ ঠান্ডার মধ্যে ক্লাসের কিছু ছেলেমেয়ের প্রবল আপত্তি অগ্রাহ্য করে ও এসির টেম্পারেচারটা কমানোর চেষ্টা করছিল। ব্যাপারটা আমার চোখে পড়ায় আমি প্রশ্রয়ের হাসি হেসে ওর দিকে তাকিয়ে ছিলাম। ও আমাকে পাত্তা না দিয়ে এসি নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

বাইরের কেউ শুনলে ভাববে এটা সামান্য ব্যাপার। অন্তত আমার মত বয়স্ক লোকের মাথা ঘামানোর মত কিছু নয়। কিন্তু ওর এই নীরব উন্নাসিকতাটা আমায় কাঁটা ফোটাচ্ছিল অনেকদিন ধরে। সেদিন ওটা চরমে পৌঁছে গেছিল।এত স্পর্ধা হয় কি করে! কি মনে করে আমাকে! আমি ওর প্রেমে হাবুডুবু খাচ্ছি? আমি ঠিক করেছিলাম ওর যোগ্যতা আমি ওকে মার্কশিটে দেখিয়ে দেব।

পর্ব ৩

তৃষ্ণার কথা

Deification একটা অস্বাস্থ্যকর ঘটনা। যেই মুহূর্তে একটা মানুষের দেবত্ব সামাজিক ভাবে তৈরী হয়, ধূপের ধোঁয়ার আড়ালে চাপা পড়ে যায় একটা অপ্রেশনের ইতিহাস। এই ইতিহাস শুধু চাবুক হাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ তৈরী করে না, বা রাষ্ট্রশক্তি তৈরী করে না। এই ইতিহাস তৈরী হতে পারে যে কোনো প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে, যে কোনো ব্যক্তিকে ঘিরে। এমনকি যদি ঐ ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান চলতি সিস্টেমের বিরুদ্ধে সরবে বিদ্রোহী হয়, তাও। প্রায় একবছর হতে চলল, ঘটনাটার কথা আমি দু একজন বিশেষ কারোর সাথে শেয়ার করে উঠতে পারিনি। এ প্রসঙ্গে নাৎসি চিকিৎসক ডাঃ মেঙ্গেলের একটা কথা খুব প্রাসঙ্গিক, "The more we do to you, the less you seem to believe we are doing it."

খুব স্নেহপ্রবণ ফাদারলি একজন অধ্যাপকের মুখোশের আড়ালে একজন নার্সিসিস্ট লুকিয়ে থাকতে পারে। তারা ভদ্রতা ও আভিজাত্যের মূর্ত প্রতীক হতে পারে, তারা জ্ঞানী ও প্রতিভাবান হতে পারে। কোনো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যাগরিষ্ঠ মেয়েরা তার পায়ের নীচে নিজের হৃদয় বন্ধক দিয়ে বসে থাকতে পারে। কিন্তু তাতেও তার ভিতরের জম্বিটা মরে যায় না। একজন নার্সিসিস্ট আসলে একটা মুখোশ, এবং এই মুখোশের আড়ালে কারোরই অস্তিত্ব নেই। একটা মানুষ চোখের সামনে হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে, কিন্তু আসলে সে নেই। যেটা আমরা দেখছি সেটা একটা মরীচিকা মাত্র। এই চিন্তাটাই কিরকম মেরুদণ্ডের মধ্যে দিয়ে বরফের স্রোত নামিয়ে দেবার মত নয়?
আবার ভয়টা উলটো দিকেও কাজ করে। ওদের এই নেতিবাচক উপস্থিতিকে কেউ পড়ে ফেলল কিনা এটা নিয়ে ওরা সবসময় সন্ত্রস্ত থাকে। শেষের দিকে কাজলবাবুকে হয়ত এই কারণেই আমার চোখের দিকে সোজা তাকাতে বেশ পরিশ্রম করতে হত।

কে বিশ্বাস করবে আমার কথা? যখন হাওয়ার মত ঘটনাপ্রবাহে ভেসে যাচ্ছিলাম, তখন আমি নিজেও কি বিশ্বাস করতে পারছিলাম এটা হতে পারে ! বারবার এটা মনের ভুল ভেবে নিজেকে স্তোক দেবার চেষ্টা করেছি, পরমুহূর্তেই ঐ লোকটা আবার একটা ধূমকেতুর মত আমার রাস্তা আড়াল করে দাঁড়িয়েছে। পরিচিতি, খ্যাতি, ক্ষমতা সব ঐ লোকটার হাতে। এমনকি আমার বন্ধুদের থেকেও আমি সমর্থন পাওয়ার বিশেষ আশা রাখি না। পেয়ে গেলে সেটা বাড়তি পাওনা। একজন সুপ্রতিষ্ঠিত, অভিজাত, বিদেশী ডিগ্রীধারী অধ্যাপক। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অসম্ভব জনপ্রিয়। আমাদের মত ছেলেমেয়েদের চোখে প্রায় দেবত্বপ্রাপ্ত একটা ফিগার। ক্রাসাস কি কখনও হাওয়ার্ড ফার্স্টের ভেরিনিয়াদের নিয়ে ভাবার অবকাশ পেতে পারেন!

লোকটা আমার দিকে তাকিয়ে কেন মুচকি মুচকি হাসছিল আমি তখন বুঝতে পারিনি। লোকটার কি সত্যিই মাথায় ছিট আছে। আমি ভাবলাম বোধহয় আমার দিকে তাকিয়ে হাসছে না। ও আমার সাথে তখনও পর্যন্ত কোনদিন অভদ্র ব্যবহার করেছে বললে মিথ্যে বলা হবে, তবে কাজের বাইরে কখনই কথা বলত না। যদিও মার্ক্সিয়ান ইকোনমি বা পল ইকোর অন্য ছাত্রছাত্রীদের বেশ ছোটখাট ইয়ার্কি করার মত সদ্ভাব ছিল। আমি সেটা লক্ষ করলেও তখন পর্যন্ত তেমন তলিয়ে ভাবিনি। তাই ভেবেছিলাম বোধহয় কোনো কারণে পিছনের বেঞ্চের কাউকে দেখে হাসছে। মোট কথা হাসিটা রেসিপ্রোকেট করার কোনো কারণ দেখিনি। অনেক পরে বুঝেছিলাম লোকটা আমার একটু অ্যাটেনশনের জন্য পাগল ছিল।

সত্যি কথা বলতে কুত্তাঞ্জনকে প্রথম থেকে আমি বিশেষ পছন্দ করতাম না ঠিকই, তবে এতটা ঘেন্নাও করতাম না যতটা এখন করি। বরং আগে অপছন্দ করলেও থার্ড সেমের সময় বেশ পছন্দই করতাম। কুত্তাঞ্জন নামটাও অনেক পরে দেওয়া। নামটা ওকে একবার জানানো গেলে চমৎকার হত।

ওকে প্রথমদিকে অপছন্দ করার কারণ ছিল ওর ফিউডাল মানসিকতা। এবং কিছু ন্যাকামো। যেমন একদিন ক্লাসে একটা অঙ্ক দেওয়ার পর সবাই কথা বলতে থাকায় রাগ দেখিয়ে বেরিয়ে আসা এবং তারপর ক্লাস রেপ্রেজেন্টেটিভরা 'মান ভাঙাতে' ওর কেবিনে গেলে "আমি কোনদিন তোমাদের সাথে কথা বলব না।" বলে ওদের মুখের উপর দরজা বন্ধ করে দেওয়া। কিরকম সুয়োরানীর গোঁসাঘরে খিল দেওয়ার মত ব্যাপার না?

তারপর একদিন ক্লাসে একটা বাল্ব খারাপ হয়ে যাওয়ায় একজন চতুর্থ শ্রেণীর কর্মীকে ডেকে বলা, "এইচ ও ডি কে এখানে আসতে বল। বলবে আমি ডেকেছি। "যদিও শেষ পর্যন্ত এইচ ও ডি স্যর আসেননি। দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে তাঁর অর্ধেক একজন ইলেকট্রিশিয়ানকে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। কুন্তাঞ্জন বেশ বিব্রত হয়ে পড়েছিল আমাদের সামনে। অথচ এই লোকটাই আবার থার্ড ও ফোর্থ সেমে মার্ক্সবাদ পড়ায়। নিজের চা'টা পর্যন্ত আনায় ছাত্রদের দিয়ে, এঁটো ফাঁকা গ্লাসটাও তাদের হাতে করে নীচে পৌঁছে দিতে হয়। এই দ্বিচারিতাগুলোর কারণেই লোকটাকে ভাল লাগত না। আসলে মানুষকে ছোট করে কিছু লোক একটা বিচিত্র আনন্দ পায়। সম্মানবোধটা কি এতটাই ঠুনকো যে সেটা অন্যকে খাটো করার উপর দাঁড়িয়ে থাকে!

একজন কোভার্ট ম্যাল-অ্যাডাপটিভ নার্সিসিস্টের যা যা লক্ষণ দেখা যায় তার অন্তত পঁচাশি ভাগ তাঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল। এই ক্যাটিগরির একজন নার্সিসিস্টের সবচেয়ে বড় অস্ত্র হল ছদ্মবেশ। কাজলবাবুর ইন্টেলেক্ট, উইট, আপাত নিশ্ছিদ্র আত্মবিশ্বাস, নিজের অ্যাপিয়ারেন্সের বিষয়ে অতিরিক্ত সচেতনতা যেটা ডাঃ মেঙ্গেলেকে মনে করায়.....অতুলনীয় মানে সত্যিই অতুলনীয় পড়ানো-মানে পুরোটা মিলিয়ে একটা আপাত সৌম্য এবং চার্মিং ব্যক্তিত্বের মুখোশ যা সামনের মানুষটার মনে সম্ভ্রম তৈরী করবে।

আবার সেই সাথে আত্মকেন্দ্রিকতা, অতিরিক্ত মাত্রায় ভাবমূর্তির ব্যাপারে সচেতনতা, অন্যদের নিজের অধস্তন ভাবার প্রবণতা(সে কোলিগ হোক বা ছাত্রছাত্রী), কর্তৃত্বপরায়ণতা-যেগুলো একরকম সাম্যবাদী পরিবেশে বড় হবার কারণে আমার খুব দৃষ্টিকটূ ভাবে চোখে পড়ত। তবে দাড়িবুড়ো আর বাহাত্তরে খুন হওয়া সেই প্রশ্ন করতে শেখানো হেঁপো রুগীকে যদি মস্তিষ্ক ও হৃদয়ে পেনিট্রেট করতে না দেওয়া হয় তবে এই ব্যাপারগুলো চার্মের আড়ালে ঢাকা থাকবে। অবশ্য ততক্ষণই যতক্ষণ না সামনের মানুষটা ওঁর চোখে পড়ছে এবং মাথায় গেঁথে যাচ্ছে। যদি সেটা না হয় তবে ভদ্রলোক আপনার চোখে মাস্টারদা সূর্য সেন হয়ে থেকে যাবেন সারাজীবন। কিন্তু সবসময় ভাগ্য এতটা সদয় হয় না। কেউ কেউ ওঁর মস্তিষ্কে গেঁথেও যেতে পারে। আমার চোখেও একদিন উনি সূর্য সেন ছিলেন।

ঐ কারনেই একজন কোভার্ট নার্সিসিস্ট তার ওভার্ট কাউন্টারপার্টের তুলনায় বেশী বিপজ্জনক। দুপ্রকারই মারাত্মক এক্সপ্লয়টেটিভ, কিন্তু একজন কোভার্ট নার্সিসিস্টকে চেনা যায় না। এরা খুব সূক্ষ্ম কিন্তু গভীর ভাবে তোমার মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করবে। আপাতদৃষ্টিতে একজন কোভার্ট নার্সিসিস্ট অত্যন্ত ভদ্র ও সংবেদনশীল মানুষ হিসাবে প্রতিভাত হবে, কিন্তু তার সরীসৃপের মত শীতল সত্ত্বাটা একমাত্র ভিক্টিম উপলব্ধি করবে। এরা পছন্দের ভিক্টিমকে নিয়ন্ত্রণ করতে দরকার মত স্নেহ ও আবেগের মিসাইল প্রয়োগ করবে। কাজলবাবু কোভার্ট নার্সিসিস্ট ছিলেন, খুব সুন্দর শান্ত গ্রীনারির আড়ালে লুকোনো বিষধর সাপের মত।

পর্ব 4

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

পরীক্ষা শুরুর প্রথম দিন মার্ক্স ও পল ইকোর ছাত্রছাত্রীদের ইন্টারনালের পেপার জমা দিতে আসার কথা ছিল। এই দিনটা আমি ইচ্ছা করে ওদের আসতে বলেও গেলাম না। ওরা জমা দিতে এসে ফিরে যাবে। কাউকে ফিরিয়ে দেবার

মধ্যে একটা আলাদা আনন্দ আছে। এতে হুট করে কেউ তোমায় সহজলভ্য ভেবে বসবে না। আমার এই ইমেজটা একদিনে তৈরী হয়নি। এটা বিজ্ঞাপনের যুগ, লোকে তাই দেখবে তুমি যা তাদের দেখাবে। আমি কি সব্যসাচীবাবুর মত নাকি? বেশী ছাত্রদরদী হবার চেষ্টা করতে ভদ্রলোককে নিয়ে ছাত্রছাত্রীরা হাসাহাসি করে।

আচ্ছা তৃষ্ণাও নিশ্চয়ই আমার খোঁজে এসে ফিরে গেছে। তখন কি ওর একবারের জন্যও মনে হয়নি স্যর আজ এলেন না কেন!

পরদিন দুপুরে আমি কেবিনের দরজা বন্ধ করে বসে একটা পর্ন দেখছিলাম। বাড়ীতে মেয়ের সামনে এগুলো দেখা যায় না। এটা একটা রেপ পর্ন, একটা বছর কুড়ির শ্বেতাঙ্গী মেয়েকে একটা পঞ্চাশোর্ধ প্রৌঢ় জান্তবভাবে অধিকার করছে। মেয়েটা যন্ত্রণায় ছটফট করছে, চোখ থেকে নিঃশব্দে জল পড়ছে। অথচ একফোঁটা বাধা দিচ্ছে না। দাঁতে দাঁত চেপে ওর বাহুবন্ধনে থেকে নিঃসাড়ে সহ্য করছে যৌনপ্রহার। লোকটার অবশ্য একটুও মায়া হচ্ছে না।

মেয়েটার চুলের রঙ লালচে বাদামী, ভীষণ সুন্দর ক্রিস্টালের মত কৃষ্ণোজ্জ্বল চোখ। আমার দম বন্ধ হয়ে আসছিল ভাল লাগায়, একটা পাগল করা উত্তেজনায়। অস্ফুটে আমার নিজেরও অজান্তে আমি বলে উঠলাম,"তৃষ্ণা।" উফ একবার ওয়াশরুমে যাওয়া দরকার। আর কতদিন এভাবে চলবে! আমার এই মেঘটা কি কোনোদিন তৃষ্ণার মধ্যে বৃষ্টি নামাতে পারবে না!

হঠাৎ আমার হাত পা ঠান্ডা হয়ে গেল। দরজার বাইরে তৃষ্ণার গলা। ও দরজাটা ধরে বাইরে থেকে টানাটানি করছে।

আমি দ্রুত ব্রাউসার ক্লোজ করে ট্রাউজারের জিপার বন্ধ করলাম। নিজেকে সামলাতে একটু সময় লাগল। তখনই আবার ওর গলা কানে এল, কাউকে একটা বলছে, "দরজাটা খুলছে না কেন বলতো!"

দরজায় নক করার সেন্স অফ ডিসেন্সিটুকুও নেই। আমি উঠে দরজা খুলে দিলাম।

-"স্যর আমরা প্রোজেক্ট জমা দিতে এসেছি।"

ওকে দেখে আমার মুখ থেকে কোনো কথা বেরোল না। ইঙ্গিতে টেবিলটা দেখিয়ে তার উপর রাখতে বললাম। ওর পিছনে বিষ্ণুও ঘরে ঢুকল। আমি বিষ্ণুকে মধুর গলায় বললাম, "তোমার যেন কি টপিক ছিল?" কিছুক্ষণ বিষ্ণুর সাথে কথা বললাম তারপর। তৃষ্ণা আশা নিয়ে তাকিয়েছিল ওকেও কিছু বলব। বললাম না দেখে বেরিয়ে গেল। আমার ওকে ঝুল দিয়ে একটা পৈশাচিক আনন্দ হচ্ছিল। আগের দিনের নখরাটার আংশিক শোধ নেওয়া গেছে। তবে একটু হতাশও হলাম, ভেবেছিলাম ও আরেকটু বেশী সময় দাঁড়াবে। যাক গে, এখনও অনেক কিছু বাকি আছে সুইটি। জাস্ট ওয়েট অ্যান্ড ওয়াচ।

পর্ব ৫

তৃষ্ণার কথা

কাজলকে শুদ্ধ ভাষায় বলা হয় অঞ্জন। আর একজন ডগ লাভার হিসাবে বলছি আমি কুকুরকে কুত্তা মনে করি না। কুকুর মানুষের থেকে অনেক ভাল। কুত্তা হচ্ছে অত্যন্ত নিকৃষ্ট মানের চরিত্রহীন দুর্নীতিপরায়ণ একজন মানুষ। সেখান

থেকে কুত্তা আর কাজলের জায়গায় অঞ্জন – মিলে হচ্ছে কুত্তাঞ্জন। আচ্ছা আমাকে কেউ অপছন্দ করলে কি নাম দেবে? কুত্তৃষ্ণা?

অপর্ণার সাথে কুত্তাঞ্জনের কিছু একটা আছে। আমার সঙ্গে অপর্ণার একটা রেষারেষির সম্পর্ক তৈরী করতে কুত্তাঞ্জন ওকে নিয়ে যে আদিখ্যেতা করে আমি সেটার কথা বলছি না। ব্যাপারটা আরো গভীর কিছু। এবং সম্ভবত আর্থিক লেনদেন সংক্রান্ত।

থার্ড সেমের পরীক্ষা শুরু হবার পর থেকেই কুত্তাঞ্জন আমাকে দেখলে উদ্ভট আচরণ করছে। ঐ সময়ের কথা যখন হচ্ছে কুত্তাঞ্জন না বলে কেবিএইচ বলি। কিংবা কাজলবাবু। কারণ তখন আমি ওকে কুত্তাঞ্জন নামে ডাকতাম না।

কাজলবাবু কোনো কারণে আমার উপর অফেন্ডেড হয়েছেন বুঝতে পারছিলাম। লাস্ট ক্লাসের দিন লেকচার চলাকালীন আমার দিকে চোখ পড়লেই কিরকম সমমেরুর চুম্বকের মত লাফ দিয়ে মুখ ঘুরিয়ে নিচ্ছিলেন। মানে আলাদা করে ঘাড়টায় একটা লম্ফ তরঙ্গ দেখা যাচ্ছিল। কারণটা পরে নিজেই অনুমান করলাম। ওঁর হাসিটা দাঁত কেলিয়ে রেসিপ্রোকেট না করার জন্য। আচ্ছা ঝামেলা তো! বুড়োর এ কি ভীমরতি!

কাজলবাবু গোটা থার্ড সেমের ছ মাস বেশ ভদ্র হয়ে ছিলেন। মানে ভীষণ ফ্রেন্ডলি এবং ফাদারলি একজন মাস্টারমশাই। কোনো প্রশ্নেই বিরক্ত হন না। একেবারে মাটির মানুষ। এই লোকটাই ফার্স্ট সেমিস্টারের সময় অত ঘ্যাম নিয়ে চলত! দেখলে বিশ্বাসই হয় না। যে কোনো সমস্যা হলে ওঁকে গিয়ে বলা যেত। যদিও অপর্ণার প্রতি একটা পক্ষপাতিত্ব ছিল, কিন্তু সেটা কখনও দৃষ্টিকটু হয়ে ওঠেনি। এক একজন শিক্ষক কোনো বিশেষ ছাত্রকে পছন্দ করতেই পারেন। তাই বলে আমাদের সাথে তো আর কোনো বৈষম্য করছেন না। মোটকথা পরীক্ষার রেজাল্ট বেরোনোর আগে অব্দি আমার এটা নিয়ে কোনো ক্ষোভ ছিল না।

যেদিন আমি আর বিষ্ণু টার্ম পেপার জমা দিতে গেলাম, উনি খুবই অদ্ভুত আচরণ করলেন। আমাকে দেখিয়ে দেখিয়ে বিষ্ণুর সাথে গল্প করলেন। বছর তিনেক আগে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষিকা এরকম করলে আমার অভিমান হত। কিন্তু এই মুহূর্তে কেন জানি না হল না। বরং একটা বিচিত্র আতঙ্ক হল। আন্ডার গ্র্যাজুয়েট কোর্স পড়ার সময় স্যররা বারবার বলতেন, "এম এসসি পড়ার সময় কোনো ফ্যাকাল্টিকে চটাবি না।"

কারণটা নিশ্চয়ই ব্যাখ্যা করার দরকার নেই। আমার মেনস্ট্রিম ইকোনোমিকস পড়তে ভাল লাগে না, ফার্স্ট সেমের রেজাল্ট খুবই খারাপ হয়েছিল। যাই হোক প্রত্যাশিত ভাবে রেজাল্ট খারাপ হওয়া একটা জিনিস। এখানে মার্ক্স আর পল ইকো যথেষ্ট লেবার দিয়ে পড়ছি। সত্যিই যদি লোকটা খাতায় মার গেঁড়ে দেয়, আমার মাওবাদী হওয়া ছাড়া গতি থাকবে না। এমনিতে বাড়ীতে কলেজে পড়ার সময় থেকেই মা ভয়ে ভয়ে থাকে আমি যে কোনো মুহূর্তে বানপ্রস্থে গিয়ে বিপ্লবী হয়ে যাব। আমার চারু মজুমদার, চে, মারিগেল্লা আর নবারুণ ভট্টাচার্যের বইগুলোকে মা সহ্য করতে পারে না।

পরের পরীক্ষার দিনগুলোও কাজলবাবুর ন্যাকামি অব্যাহত রইল। প্রতিদিন আমাদের ঘরে গার্ড নিয়ে আমি ফার্স্ট বেঞ্চে বসা সত্ত্বেও আমাকে সবার শেষে কোয়েশ্চেন পেপার দেওয়া ও সবশেষে খাতা সই করা। একটা প্রশ্ন

নিয়ে আমার ডাউট ছিল, সেটা জিজ্ঞেস করায় সবার সামনে বাধ্য হল বলে দিতে। কিন্তু এবার কিছু একটা করতেই হবে, তাই অপর্ণার কাছে গিয়েও নিজে থেকেই ওটা বলে এল। যদিও ও জানতে চায়নি, তাও।

লোকটা কিছু একটা গন্ডগোল করছে অনুমান করতে পারছিলাম। পরীক্ষার দিনগুলো রোজ আমাদের ঘরে গার্ড নিলেও আমার সাথে সরাসরি কথা বলছে না অথচ চোখ তুললেই দেখছি আমার দিকে তাকিয়ে আছে। অথচ একদিন হলে ঢোকার আগে অন্তত দুবার এরকম হল যে আমার সাথে আরেকটু হলে ধাক্কা লাগত। খুবই বিব্রত মুখে কেমন একটা চোর চোর ভঙ্গিতে সরে গেল।

ওর আসল শয়তানিটা আমি অনেক পরে বুঝেছিলাম। অবশ্য তখন আমার হারাবার কিছু ছিল না বলেই অতটা ডেসপ্যারেট হওয়া সম্ভব হয়েছিল। লোকটা ফোর্থ সেমের প্রথম ক্লাসের দিন এসেই জিজ্ঞেস করেছিল গান্ধী আর মার্কসের ডিসএনচ্যান্টমেন্ট ও এলিয়েনেশনের উপর লেখা আর্টিকলটা আমরা পড়েছি কিনা। এবং খুবই মধু ঢালা গলায়। কিছুদিন আগে যে পাগলামি করছিল তার চিহ্ন মাত্র ছিল না। এটার উপর পরীক্ষায় প্রশ্ন এসেছিল। অপর্ণা ওটা পড়ে যায়নি আমাকে জানিয়েছিল। আমিও শেষ মুহূর্তে একবার চোখ বুলিয়ে গেছিলাম। ক্লাস নোটসের সাথে মিলিয়ে উত্তর লিখতে তেমন অসুবিধা হয়নি। পল ইকোর ইন্টারনালের নম্বরটা আগেই কায়দা করে শম্পা ম্যাডামের হাত থেকে নিয়ে পুরোটা নিজের হাতে রেখেছিল। ওর চালাকিগুলো তখন একটাও বুঝিনি।

তুলনামূলক আর্টিকেলের প্রশ্নটায় আমি বলেছিলাম মোটামুটি পড়ে লিখেছি, এর একটা কারণ হচ্ছে আমি নিজের পড়াশোনা নিয়ে সবসময়ই বেশ খুঁতখুঁতে ছিলাম। আমার দুর্বলতাটা কায়দা করে কুত্তাঞ্জনের জেনে নেওয়া-এর সঙ্গে সঙ্গেই নির্ধারিত হয়ে গেছিল অপর্ণা পল ইকোর পেপারে হায়েস্ট পেতে চলেছে। পরীক্ষার পারফর্মেন্সের এখানে কোনো ভূমিকা নেই। অপর্ণা একটা ভুল করে ফেলেছিল, আমায় জানিয়ে দিয়ে যে ও পাঁচ নম্বর পুরো ভুল লিখেছে। তাতে কিছুই যায় আসে নি, শুধু কুত্তাঞ্জন যে ঘাপলাটা করেছে খাতা বেরোনোর পর সেটা আমি বুঝতে পেরে গেছিলাম। নার্সিসিস্টের বৈশিষ্ট্য হল তারা এতটাই ভদ্রভাবে আপনাকে প্রশ্ন করবে যাতে আপনি সরল মনে নিজের বিষয়ে অনেক কিছু জানিয়ে দেবেন। তারা সেই তথ্যটা সঞ্চয় করে রাখবে ও পরে আপনার বিরুদ্ধে ব্যবহার করবে। ঠিক এটাই কাজলবাবু থার্ড সেমিস্টারের পরীক্ষার সময় আমার সাথে করেছিলেন।

পর্ব ৬

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

একটা ভালো রেপ পর্ন খুঁজে বের করা যৌনসঙ্গমের থেকেও বেশী পরিশ্রমের কাজ। পর্নহাব, ব্রেজারস আরও প্রায় গোটা তিরিশেক ওয়েবসাইট ঘেঁটে আমি পছন্দ মত মাত্র দুটো পর্ন পেলাম। একটা সেদিনের ঐ তৃষ্ণার মত দেখতে মেয়েটাকে নিয়ে, অন্যটা একটা এগারো বছরের মেয়ে এবং একটা মধ্য চল্লিশের শ্বেতাঙ্গ লোকের। আমার সেক্সুয়াল ফ্যান্টাসিতে দশ বছর আগের তৃষ্ণা এবং আমি। দ্বিতীয় পর্ন ছবির যে ব্যাপারটা আমাকে সবচেয়ে বেশী মুগ্ধ করছিল তা হল ব্লাড। একটা মেয়ের কৌমার্য ভাঙার গল্প। জেনিটাল এবং অ্যানাল ব্লিডিং এ বিপর্যস্ত মেয়েটা যখন সঙ্গম শেষে নেতিয়ে পড়েছে তখন লোকটা তার চুলের মুঠি ধরে নিজের উরুসন্ধিতে ওর মুখটা চেপে ধরে পুরো সাবস্ট্যান্সটা

গিলতে বাধ্য করল। আমি তৃষ্ণাকে এই পজিশনে দেখতে চাই, আমার উরুসন্ধির সামনে নতজানু হয়ে বসা। ওর মত মেয়েদের এভাবেই ট্রিট করা উচিত। সামান্যতম অনুকম্পা পাওয়ারও এরা যোগ্য নয়। তৃষ্ণাকে আমি একটা সুযোগ দিয়েছিলাম। তাতে আমার যেচে কাদা মাখা ছাড়া কিছু লাভ হয়নি। ও যে বইটা খুঁজছিল তার পিডিএফ আমি কমন মেল আইডিতে পাঠিয়েছিলাম। এবং যা আমি কখনই করি না, অর্থাৎ ওর পার্সোনাল ইমেল আইডিতেও মেল করে দিই। একটা ধন্যবাদ পর্যন্ত জানানোর প্রয়োজন বোধ করেনি। মানে কোনো উত্তরই দেয়নি। শুধু ওর খাতা নষ্ট করা যথেষ্ট নয়, আমি আস্ত তৃষ্ণাকে ধ্বংস করতে চাই। ওর উপর শারীরিক বলপ্রয়োগ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়। ওকে এমন জায়গায় নিয়ে আসতে হবে যাতে আমার কোনো কাজেই ও বাধা দেবার অবস্থায় না থাকে। এমনকি চরমতম নোংরা কোনো কাজেও না। ইস আজ থেকে দশ বছর আগে কেন আমার সাথে ওর দেখা হল না! অন্তত একটা ইনোসেন্স থাকত, এখনকার মত আমাকে প্রতি পদক্ষেপে এত বেশী সাবধানতা অবলম্বন করতে হত না।

-"আই হ্যাভ বট ইউ ফ্রম দ্য মার্কেট, নাউ ইউ আর মাইন। আয়াম ইওর মাস্টার, ইউ আর মাই স্লেভ।তোমার শরীরের উপর আমার একচ্ছত্র অধিকার, তুমি কি খাবে, কি করবে, বিয়ে করবে কিনা, সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স করবে কিনা, তোমার বাচ্চা হবে কিনা, তোমায় যৌন প্রয়োজনে ব্যবহার করব না অন্য কোন কাজে, সেটা আমি ঠিক করব।" কথা শেষ করে আমি পূর্ণদৃষ্টিতে তৃষ্ণার দিকে তাকালাম। আমি বসে আছি একটা বড় টেবিলে চড়ে, ও আমার সামনে একটা চেয়ারে। মুখের রঙ ক্রিমসন লাল, চোখ তুলে তাকাতে পারছে না। আমি লুব্ধ দৃষ্টিতে ওকে ভাল করে দেখলাম। এই মুহূর্তে ওর লাল হয়ে ওঠা ফর্সা মুখের চেয়ে লোভনীয় ও সুস্বাদু আমার ওর শরীরের কোনো অঙ্গ – প্রত্যঙ্গকে মনে হচ্ছে না। এত সুন্দর দেখতে হলেও মেয়েটার ড্রেস সেন্স খুব খারাপ। জঘন্য লুজ ফিটিং ও কোঁচকানো লিনেনের শার্ট পরে আসে। শরীরের গঠন ভালো বোঝা যায় না। ওর ফ্যাশন আইকন সম্ভবত কোনো বুড়ো টিবি আক্রান্ত অতি বামপন্থী নেতা। আমি জানি ও ব্যাগে চারু মজুমদার নিয়ে ঘোরে। একবার চারুবাবুর একটা থিওরির ব্যাখ্যা আমার কাছে জানতেও চেয়েছিল।

আমি এই লেচারাস ডিসকাশনের সুযোগটা বেশ ভাল মত কাজে লাগালাম। বেশ অনেকক্ষণ আলোচনা চালালাম বিষয়টা নিয়ে। আলোচনা হচ্ছিল স্লেভারি এবং ফিউডাল সিস্টেম নিয়ে। গৃহস্থালীতে স্বামী ও স্ত্রীর মধ্যে ফিউডাল সম্পর্ক গড়ে ওঠে এটা ছিল বিষয়। এবং আমার ডিবচারির উন্মুক্ত ক্ষেত্রও। যদিও আমি ইতিমধ্যেই উপলব্ধি করেছি যে প্রগলভতাটা একটু বেশী মাত্রায় হয়ে গেছে, তাই অনেক কষ্টে নিজেকে সামলে নিলাম। সম্প্রদানের সময় যে মন্ত্রটা স্বামী স্ত্রীকে বলতে হয়, সেটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক হলেও ওকে বলতে বাধ্য করলাম। ঐ "যদিদং হৃদয়ং তব, ততস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, ততস্তু হৃদয়ং তব।"

পলিটিকাল ইকোনমির ক্লাসের সেদিনের মজাটা একল্যাস্টিক ছিল। খুব ভাল হত যদি সময় ওখানেই থেমে যেত। বেরিয়ে এসে মনে হচ্ছিল এতটা বাড়াবাড়ি করা কি ঠিক হল! অবশ্য ক্লাসে মাত্র তিনজন স্টুডেন্ট। বিষ্ণু একদমই চুপচাপ আর অপর্ণার দরকার পল ইকোর খাতায় মলমূত্রাদি ত্যাগ করে এসেও হায়েস্ট মার্ক্স। ওর দাদা আমাকে বলেছে ওর ফার্স্ট ক্লাসটা তুলে দিতেই হবে। আগের সেমগুলোর মার্ক্স একদমই সুবিধার নয়। তাই যতই ক্লাসে মার্ক্সবাদ আর নারীবাদের তত্ত্ব পড়ানো হোক, এখানে তার যাপন সম্ভব নয়। একটা মেয়ে হিসাবে ও কখনই

তৃষ্ণাকে সমর্থন করবে না। ক্লাসের মধ্যে যদি আমি তৃষ্ণাকে মোলেস্টও করি, অপর্ণা বাইরে গিয়ে একটা কথাও বলবে না। বরং তৃষ্ণা আমার দুর্নাম করার চেষ্টা করলে ও চিৎকার করে সেটা অস্বীকার করবে। ওর মোটা গলায় সিন ক্রিয়েট করার ও নিজের দিকে পুরো মনোযোগ টেনে নেওয়ার একটা চমৎকার ক্ষমতা আছে। তৃষ্ণার মত মৃদুভাষী মেয়ে আমার বিরুদ্ধে একটা কথাও দাঁড় করাতে পারবে না। অন্তত অপর্ণা থাকতে তো নয়ই। যদিও আমি ক্লাসের মধ্যে তৃষ্ণাকে মোলেস্ট করার কোনো পরিকল্পনা করছি না। এত বড় রিস্ক লাভার আমি নই। লোকাল মেয়ে, কাছাকাছি বাড়ী - সরাসরি ঝামেলায় যাওয়া ঠিক হবে না। আজকাল এমনিও যত্র তত্র অধ্যাপকদের ধরে পিটিয়ে দিচ্ছে বলে খবরে আসে।

পর্ব ৭

তৃষ্ণার কথা

কোনো ঘটনা একদিন ঘটলে সেটা কাকতালীয় বলা যায়। হয়ত এমনিই বলেছেন, আমারই বিষয়টা স্পোর্টিংলি নেওয়া উচিত। সেদিন পল ইকোর ক্লাসে কুত্তাঞ্জন আমার মৌখিক শ্লীলতাহানি করার পর আমি এটাই ভাবছিলাম। কিন্তু ঘটনাটা কাকতালীয় ছিল না। পরদিন হাউজহোল্ড ডোমেনের ফিউডালিজমের টপিকটা আবার মার্ক্সের ক্লাসে আলোচিত হয়েছিল। সেখানে কিন্তু কাজলবাবু একটুও ডিবচারি করেননি। একদম ক্লাস লেকচার যেমন হওয়া উচিত সেভাবেই বিষয়টা আলোচনা করেছেন। অতটা বাড়াবাড়ি মাত্রার এবং আপত্তিকর ভাষার প্র্যাকটিকাল উদাহরণ টানার দরকার পড়েনি। একটা সময় হঠাৎ আমাকে বললেন, "আচ্ছা কালকের ক্লাসে তুমি যেন কি একটা শ্লোক বলেছিলে? ওটা আবার বল।"

আমি চমকে উঠলেও সেটা প্রকাশ করলাম না। গ্যাসলাইটিং বলে ইংরাজীতে একটা কথা আছে। আমি সেটা তখন নিজের উপর প্রয়োগ করছিলাম অবচেতন ভাবেই।

ভদ্রলোক শ্লোক আর স্তোত্রর ফারাকটাও জানেন না। আমি সেটা নিয়ে কোনো কথা না বলে স্তোত্রটা বললাম। "যদিদং হৃদয়ং তব...." চিরাচরিত বিয়ের মন্ত্র।

ভদ্রলোক পূর্ণদৃষ্টিতে আমার দিকে তাকিয়ে ছিলেন। আমার কেন জানি না চোখের দৃষ্টিটা ভাল লাগছিল না। আমার বলা শেষ হলে বললেন, "এটা বাংলায় বলে দাও।"

আমি যথা সম্ভব সপ্রতিভ ভাবে বললাম, "যাহা তোমার হৃদয়, তাহা আমার হৃদয়। যাহা আমার হৃদয়, তাহা তোমার হৃদয়।"

ভদ্রলোকের মুখের অভিব্যক্তি দুর্বোধ্য, তবে দেখে মনে হল আমার হেনস্থাটা বেশ উপভোগ করছেন। আমি বিশ্বাস করি না দুদিন পরপর ঘটে চলা এই ঘটনাগুলো কাকতালীয় ছিল। যদিও নিজের অভিজ্ঞতার ব্যাপারে ভোকাল হবার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি আমি জানি। ট্রিভিয়ালাইজেশন এবং গ্যাসলাইটিং। যেমন রায়ট ভিক্টিম বিলকিসকে বিশ্বাস করানোর চেষ্টা চলে আসলে কোনোদিন তার কোলের সন্তানকে খুন করা হয়নি। ধর্ষণের কোনো ঘটনাই ঘটেনি। যেমন হলোকস্ট পরবর্তী যুগে নিও নাৎসীরা এসে হলোকস্টের ঘটনাকেই অস্বীকার করে।

বিষয়টা এই দুদিনে সীমাবদ্ধ ছিল না। আমার হাত থেকে একটা মার্কার পেন নিতে গেলেও আমার আঙুলগুলো না খিমচে ভদ্রলোক নিতে পারতেন না। আমাকে এমন কিছু বই পাঠাতেন যাতে আবশ্যিক ভাবে কিছু ভিনিরিয়েল কন্টেন্ট থাকত। আর আমি নিজেকে বোকার মত স্তোক দিয়ে যেতাম যা ঘটছে সব আমার মনের ভুল। বাবা মাকেও তখন জানিয়ে উঠতে পারিনি। কয়েকজন বন্ধুকে বলেছিলাম অবশ্য।

আমি ওঁর এই আচরণের কোনো ব্যাখ্যা পেতাম না। কি চাইছেন ভদ্রলোক! খুব সামান্য কারণেও আমার উপর অফেন্ডেড হতে দেখেছি। অনেক সময় কারণটা পর্যন্ত বোঝা যেত না।

একদিন সোমবারের ক্লাসে যেমন তাঁর নিজের লেখা একটা বই রেফার করলেন, সেটা লাইব্রেরিতে পাওয়া যাচ্ছে না জানানোয় বেশ উদ্ধত ভাবে বললেন, "কিছু করার নেই।" এভাবে আগে কখনও কথা বলেননি।

সেদিন মার্ক্সিয়ান ইকোনমির ইন্টারনালের পেপারটার বিষয়ে একটা প্রশ্ন করার ছিল। ক্লাসে তার সুযোগ পাওয়া গেল না। তিনটে নাগাদ আমি ওঁর কেবিনে গেছিলাম। একটা বেশ অদ্ভুত ঘটনা ঘটল। আমাকে দেখা মাত্র কাজলবাবু ঘাড় গোঁজ মাথা নামিয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন। আমি বার বার ডাকছি কোনো উত্তর নেই। ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটছিল। একটা উদ্গত চার অক্ষরের স্ল্যাঙকে জোর করে বেরিয়ে আসা থেকে নিরস্ত করলাম। তখনই কাজলবাবু ঠান্ডা গলায় বললেন, "দিস ইজ নট আ গুড টাইম টু কাম।"

আমি পুরো ঘটনাতেই বেশ অবাক হচ্ছিলাম। কাজলবাবু আগে কখনও কোনো নির্দিষ্ট সময় বলে দেননি দেখা করার জন্য। যে কোনো সময়ে গেলেই কথা বলতেন। বললাম,"আচ্ছা ঠিক আছে, আমি বৃহস্পতিবার আসব।"

চলে যাচ্ছিলাম, কাজলবাবু আটকালেন।

-"কি বলছিলে বলে যাও।"

আমি অবাক হয়ে লক্ষ করলাম এবার ভদ্রলোকের গলায় একটা অনুনয়ের সুর আছে। লোকটার কি সত্যিই মাথায় ছিট!

আমি প্রয়োজনটা জানালাম।

-"আজকে তো হবে না। তুমি কাল আসতে পারবে?"

-"না কাল আমার হবে না।"

-"কাল হবে না মানে? "অসন্তুষ্ট গলায় বললেন কাজলবাবু।

-"মানে কাল ক্লাসের পর সময় হবে না।"

-"তাহলে বুধবার? "ভদ্রলোকের গলা রীতিমত কাতর শোনাল।

-"না ঐদিনও সম্ভব নয়। আমি বৃহস্পতিবার আসতে পারব।"

-"আচ্ছা ঠিক আছে।"

এর মধ্যে আরো কিছু মজার ঘটনা ঘটল। বিষ্ণু তাঁর কেবিনে যাওয়ায় তার সাথেও খুব উদ্ভট ব্যবহার করেছেন। একবার মৃদুভাবে খেঁকিয়েছেন পর্যন্ত। বিষ্ণু আমাকে বলল, "স্যারের বোধহয় মুড খারাপ ছিল।"

অথচ মঙ্গলবার মার্ক্সিয়ান ইকোনমির ক্লাসে এসে খুব স্বাভাবিক ব্যবহার করলেন। কিছু প্রশ্ন করলেও খুব অমায়িক গলায় উত্তর দিলেন। একসময় লক্ষ করলাম হাসি হাসি মুখে একদৃষ্টে আমার দিকে তাকিয়ে পড়িয়ে যাচ্ছেন। একবার আমাকে আদেশের গলায় বললেন, "হাউজহোল্ড লেবারের বইটা তোমার কাছে আছে। তুমি ওটা আপলোড করে দেবে।"

"না হাড়গিলে বুড়ো, কাল তুমি যা অসভ্যতা করেছ আমি তারপর তুমি যা বলবে সেটা করব না। বরং পারলে তার উল্টোটা করব।" আমি মনে মনে বললাম। এটাই সেই বই যেটা কাজলবাবু একবার কমন মেল আইডিতে পাঠিয়েও, আবার করে আমার পার্সোনাল আইডিতে মেল করেছিলেন। তারপর কিছুদিন কোনো কারণ ছাড়াই আমার উপর ক্ষেপে ছিলেন। সম্ভবত ধন্যবাদ না জানানোয়। কিন্তু ওঁকে কিছু পাঠালে উনিও তো ধন্যবাদ জানান না। তাই আমার মাথাতেই আসেনি যে আদৌ ধন্যবাদ জানানো উচিত।

বুড়োটা আবার বাঁদরামি শুরু করেছে। অভদ্রের মত আঙুল তুলে আমার সাথে কথা বলল। প্রায় আমার নাকটা ধরে ফেলেছিল। আমি কোনো উত্তর না দিয়ে ভুরু কুঁচকে কঠিন চোখে ওর দিকে তাকালাম। লোকটা কেমন একটা মুখ লুকিয়ে লাফ দিয়ে ঘরের অন্যপ্রান্তে চলে গেল। লেকচার চলাকালীন বাঁদরের মত লাফালাফি করে। একদিন অপর্ণার খাতা ফেলে দিয়েছিল। একদিন আমার পায়ে লাথি মেরেছিল। অথচ দুঃখপ্রকাশ করার ভদ্রতাটাও দেখায়নি। অপর্ণা সোমবার আসেনি। অতঃপর ওর কোটাটা বাকি ছিল।

বৃহস্পতিবার আমাদের ক্লাসরুমে এসির সার্ভিসিং চলছিল। অপর্ণা সেটা কাজলবাবুকে জানাতে গিয়েছিল। ফিরে এল রেগে বেগুনী হয়ে। ওকে নাকি দেখা মাত্র দূর দূর করে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এম ফিলের সৌম্যদা বলল, "এখন কেউ দোতলায় যাস না। স্যর গালাগাল করছে।"

বোঝো কান্ড। স্যর কি কুমড়োপটাশ যে ভয় পেতে হবে! আমি ঠিকই করে নিলাম আজ যদি ক্লাসে এসে ঝামেলা করে সোজা ওয়াক আউট করব। তারপর যা হয় দেখা যাবে।

কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। কাজলবাবু ক্লাসে এসে অত্যন্ত বিগলিত কণ্ঠে সবার সাথে খেজুর শুরু করলেন। আমি দু একবার বেশ উদ্ধত গলায় কথা বললাম, তাও ওঁর বৈষ্ণবীয় বিনীত ব্যবহারে কোনো পরিবর্তন হল না। আগের দিনের প্রশ্নটা করায় প্রথমে "কি বলছ?"

বলে আমার উপর এতটা ঝুঁকে পড়লেন যে আমাকে পিছিয়ে যেতে হল। তারপর আমি প্রশ্নটা রিপিট করায় বিনয়ের অবতার হয়ে কেবিনে যেতে বললেন। আমাকে দরজা নকও করতে হল না। আমার বিশ্রী নোংরা ডেনিমের জুতোটা দেখেই চিনতে পেরে আমাকে ভিতরে ডেকে নিলেন। এমনকি একটা ফোন আসায় আমার সঙ্গে কথা বলবার জন্য পরে ফোন করতে বললেন।

কাজলবাবুর মধ্যে কয়েকটা এমন অস্বাভাবিত্ব ছিল যেগুলো ঠিক সুস্থ মানুষের লক্ষণ নয়। যেমন আমাদের প্রতি ওঁর প্রত্যেকটা ফেভারে অ্যাপ্রুভাল আশা করে যাওয়া এবং না পেলে অস্বাভাবিক চাপা ক্ষোভ (যেমন আমার অনুরোধে উনি ক্লাসের সময় দু ঘন্টা পিছোনোর পর ধন্যবাদ না জানানোয় রেগে গিয়ে আবার ক্লাসটা একঘন্টা এগিয়ে দেন), আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু থেকে এক মুহূর্তের জন্য সরলেই রীতিমত অসুস্থ বোধ করা। ক্লাসে কিছু ছেলেমেয়ে নিজেদের মধ্যে কথা বলায় (হয়ত অঙ্কটা নিয়েই আলোচনা করছিল) ওঁর অদ্ভুত ভাবে অফেন্ডেড হয়ে বেরিয়ে যাওয়াটা ফার্স্ট

সেমিস্টারের ক্লাসে বেশ দৃষ্টিকটু মনে হয়েছিল। তাও এটা ততটা অস্বাভাবিকতার নজির নয়। থার্ড সেমিস্টারে পলিটিকাল ইকোনমির ক্লাসে আমি আর বিষ্ণু একটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করছিলাম, মানে পড়ারই বিষয় তাই ভদ্রলোক সরাসরি কিছু বলতে পারছিলেন না, কিন্তু অদ্ভুত ভাবে ছটফট করছিলেন। মানে তাঁর ঐ মুহূর্তের শারীরিক মুভমেন্টের মধ্যে এমন একটা অস্থিরতা ছিল যেটা একমাত্র মানসিক রোগীদের মধ্যে দেখা যায়। আমি একদিন বিষ্ণুর কানে কানে একটা কথা বলায় সেটা জানা নিয়ে ওঁর আগ্রহটা রীতিমতো প্যাসিভ অ্যাগ্রেসিভনেসের পর্যায়ে পৌঁছে গেছিল। আমাদের যখন কোনো ইমেল পাঠাতেন, তার নীচে নিজের নাম না লিখে লিখতেন 'স্যর'। ক্লাসের শেষে কোনোদিন বোর্ডটা পর্যন্ত নিজে মুছতেন না, আমাদের মুছতে বলে বেরিয়ে যেতেন। যেহেতু উনি জানতেন আমি ওঁর কথা শুনব না, তাই একদিন নিজেকে দরজা বন্ধ করতে হওয়ায় সাংঘাতিক রেগে গিয়েছিলেন (যদিও মৌখিক ভাবে প্রকাশ করেননি, কারণ আমার সামনে সেটা করা অনেকটা পাথরে মাথা ঠোকার সমর্থক হত।)। রীতিমতো নিরাপত্তাহীনতায় না ভুগলে কারোর মধ্যে এই মাত্রায় সুপিরিয়রিটি কমপ্লেক্স দেখা যায় না। যে কোনো একটা ঘটনা দিয়ে বিচার করলে হয়ত ব্যাপারটা এতটা অস্বাভাবিক লাগত না, কিন্তু যেহেতু ভদ্রলোককে খুব কাছ থেকে দেখার দুর্ভাগ্য হয়েছে তাই একটার পর একটা ঘটনা স্টাডি করে ওঁর সাইকোপ্যাথ হবার ব্যাপারে নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়েছে।

ওঁর আমার প্রতি আকৃষ্ট হবার কারণও সম্ভবত এই মনস্তত্ত্বই। যেখানে গোটা ডিপার্টমেন্টের ছাত্রছাত্রী বিশেষ করে মেয়েরা ওঁকে বন্দনা করছে সেখানে একজনের নিস্পৃহ থাকা উনি মেনে নিতে পারছিলেন না। উনি ঝামেলা শুরু করার আগে পর্যন্ত আমি কোনোদিন একবারের জন্যও ওঁকে অসম্মান করিনি। কিন্তু উনি তো শুধু গুরু শিষ্যা সম্পর্কে সন্তুষ্ট থাকতে চাননি!

আমার অনেক বান্ধবীই হয়ত আমার জায়গায় থাকলে প্রথম দিকে বেশ গর্বিত বোধ করত। ওঁর কাছ থেকে এই ধরনের অ্যাটেনশন পাওয়ার কারণে। কিন্তু টানা সাত আট মাস আমার এই মনোযোগটা পাওয়ার দুর্ভাগ্য হয়েছে বলেই ভুক্তভোগী হিসাবে বলতে পারি, এই ধরনের মনোযোগ যাতে কোনো মেয়েকে কোনো প্রতিষ্ঠানে না পেতে হয়। একজন নার্সিসিস্ট একটা প্রতিষ্ঠানকে তার হারেম বানিয়ে ফেলতে পারে, সে সেলিব্রিটি হতে পারে, তার ছবি জাতীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়ের পত্রিকায় থাকতে পারে, কিন্তু তারপরেও সে বা তার মনোযোগ একজন ভিক্টিমের মানসিক স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক। "রেসপেক্ট ইওর বেটার্স" প্রবাদে আমি বিশ্বাস করি না। কেউ যত উঁচু সিংহাসনেই বসে থাকুক তৃণমূলস্তরে থাকা একটা মানুষেরও ক্ষতি করার অধিকার তার নেই। দুঃখের ব্যাপার হল এই মার্ক্সবাদী শিক্ষাগুলো হাতে ধরে, যত্ন করে যে মানুষটা শিখিয়েছেন সেই মানুষটার নামই ডঃ কাজল ভট্টাচার্য।

পর্ব ৮

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

প্রিয় তৃষ্ণা, আমাকে এতটা তৃষ্ণার্ত করে তুলে তুমি কি আনন্দ পাও? তুমি কি বুঝতে পারছ না এটা করে তুমি

নিজের বিপদ ডেকে আনছ? ছুরি আপেলে পড়ুক বা আপেল ছুরিতে, আখেরে কিন্তু ছুরিটাই আস্ত থাকে। আপেলটা টুকরো হয়ে যায়।

আমার অবস্থা যে ক্রমশ একটা ভ্যাম্পায়ারের মত হয়ে যাচ্ছে সেটা আমি বুঝতে পারছি। অসহ্য বুক ফাটানো, দম বন্ধ করা একটা তৃষ্ণা। এই তৃষ্ণাটা যে তোমার উরুসন্ধি বেয়ে নেমে আসা রক্ত ছাড়া কিছুতেই মেটার নয় তা কি তুমি জান? কিছুতেই তোমার সাথে ভদ্র ব্যবহার করার সুযোগ দেবে না, তাই না প্রিয়তমা?

শি ইজ সাচ আ বিচ। আ ডেলিশাসলি টেন্ডার, চার্মিং, ডিলেকটেবল বিচ। ওভারডিটারমিনেশন ওয়ার্ক্স ওনলি অন পেপার। দ্য ওয়ার্ল্ড ইজ অ্যাকচুয়ালি ফ্যালোসেন্ট্রিক। আখেরে পুরুষাঙ্গের সামনে সমাজ এবং নারীকে ঝুঁকতে হয়। আর কোথাও না হোক, অন্তত মন্দিরে এসে। আমরা ভারতীয়রা শিবলিঙ্গের পূজারী। এখানেই ফ্যালোসেন্ট্রিজমের জয়। আমি মুখে যাই বলি না কেন আমি হৃদয়ের অন্তঃস্থল থেকে ফ্যালোসেন্ট্রিজমে বিশ্বাসী। কি বলা উচিত আমায়? ভণ্ড? ভণ্ড আমরা প্রত্যেকেই। তুমি যাদের আইডলাইজ কর সেই স্ট্যালিন বা চারু মজুমদারও।

গত চারদিন ধরে আমার তোমার সাথে কি করতে ইচ্ছা করছিল জান? জাস্ট থাবড়ে তোমার পশ্চাদ্দেশ এবং গালদুটো লাল করে দিতে। তোমার ঐ মাওবাদী শিটের জন্যও আমি নিজের সময় খরচা করতে প্রস্তুত ছিলাম। তুমি তার বদলে কি করলে? আবার ঐ অসহ্য, পশ্চাদ্দেশে আগুন লাগিয়ে দেওয়া উপেক্ষা। আমি টানা চার দিন রাতে ঘুমোতে পারিনি। বারবার উঠে মেল চেক করেছি। তারপর চারদিন পর তুমি রিপ্লাই করলে। কি মনে কর আমাকে? রাস্তার নেড়ি কুকুর? তোমার বাসি রুটি ছুঁড়ে দেবার অপেক্ষায় বসে ল্যাজ নাড়বে? ঐ কুকুরটাই কামড়ালে কিন্তু জলাতঙ্ক হতে পারে। তার অবশ্যম্ভাবী ফল - মৃত্যু।

কিন্তু পুরো পর্বটাই এতটা তিক্ত ছিল না। খুব কম সময়, কয়েকটা মাত্র ঘন্টা হলেও এমন সময়ও ছিল যা আমাদের প্রতিকূল ছিল না। ঐ সময়গুলো এখন আমার কাছে মলমের কাজ করে। আমার আহত ভঙ্গুর পৌরুষের মলম অথবা হয়ত আমার ক্ষত তৈরী হওয়া বুকের।

তৃষ্ণার জন্য আমি অপেক্ষা করছিলাম। সৌম্য কয়েকটা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার কেবিনে এসেছিল। মন দিতে পারছিলাম না। ওহ ঐ মুহূর্তগুলো! এক একটা সেকেণ্ড এক একটা শতাব্দীর মত দীর্ঘ মনে হচ্ছিল। আমি বার বার দরজার নীচ দিয়ে বাইরের দিকে দেখছিলাম ও এল কিনা। তারপরেই ওর নোংরা ডেনিমের জুতো আর উপর দিয়ে কাদা মাখা ছেঁড়া ট্রাউজার্স দেখা গেছিল। ও দরজা নক করার আগেই আমি উচ্ছ্বাসের ফলে ওকে ডেকে ফেলি। হয়ত সংযত থাকা উচিত ছিল। এতটা আগ্রহ দেখিয়ে ফেলা ঠিক হয়নি। যাই হোক পরে পরীক্ষার খাতায় সেটা পুষিয়ে দিয়েছিলাম। তৃষ্ণা ঘুনাক্ষরেও আর কোনদিন ভাবতে পারবে না যে আমি কয়েক দিনের জন্যও......

আমি একজন ফিলোফোবিক মানুষ। সে প্রেম বা যৌনতা নিয়ে লিখিত ভাবে যতই বক্তৃতা করি না কেন! চিরাচরিত বাঙালী পুরুষ যেমন হয়। শ্রেণীযুদ্ধ আমার চোখে শুধু মাত্র একটা দর্শন, বিস্তৃততর কিছু নয়। আমার কাছে প্র্যাক্সিস হল শুধুমাত্র নিজের মস্তিষ্কের পুলিশটাকে হত্যা করা। কার্টেজীয় দ্বিপাক্ষিক গঠনে শ্রেণীশত্রুচিহ্নিতকরণের ক্লাসিকাল

মার্ক্সবাদী ধারণাকে আমি ডগমার অভিধা দিয়ে ডিসকার্ড করেছি। কারণ অ্যাকটিভিজমের পথ কণ্টকময়, প্রতিঘাত নেওয়ার ক্ষমতা আমার নেই। তাই আরামকেদারার বিপ্লব। তাই তত্ত্বকেই যাপনের মুখোশে ঢেকে দেখানো। আমার কাছে প্রেম বা বিপ্লবের সাহসিকতা ক্লাসরুম আর ফেসবুকেই সীমাবদ্ধ। প্রেমকে বিপ্লবে এবং বিপ্লবকে প্রেমে বদলাবার মত মেরুদণ্ডের জোর আমার নেই। আমি চে গ্যেভারা বা সিরাজ শিকদার নই যে পরকীয়ায় জড়িয়েও বুক চিতিয়ে দয়িতার হাত ধরে দাঁড়িয়ে দায়িত্ব নিয়ে প্রেমকে স্বীকৃতি দেব। আমি চারু মজুমদারও নই যে সারাজীবন একনিষ্ঠ প্রেমে নিজের স্ত্রীর কাছে হৃদয় বন্ধক দিয়ে রাখব। আমি পছন্দ করি দায়িত্বহীন প্রেম, ক্যাজুয়াল যৌনতা। কেউ কমিটমেন্টের কথা বলতে গেলে থার্ড ওয়েভ ফেমিনিজমের ভাষায় তাকে কিঙ্ক শেমিং এর জন্য ধিক্কার দিই। না আমি যে আদর্শ বেছেছি তাতে কমিটমেন্ট বা আত্মবলিদানের কোনো জায়গা নেই। না প্রেমে না রাজনীতিতে। স্ট্যালিন বা চারু মজুমদারের প্রতি আমার এই বিচিত্র বিদ্বেষের কারণ আসলে লুকিয়ে থাকা একটা হীনমন্যতা। যে কারণে ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করে। আমি আদর্শের জন্য আত্মনিগ্রহ করার কথা ভাবতেও পারি না, প্রেমের জন্যও না। ঐ লোকগুলোর মত মহাপুরুষ আমি কোনদিন হতে পারব না। যে পথে হাঁটলে সফলতা দেখে যাওয়ার আসা কম, সমাজে লোকনিন্দা, পরিবার, বন্ধুবান্ধব সবার দূরে সরে যাওয়া, স্বীকৃতি নেই, স্তুতি নেই, বন্দনা নেই, আছে শুধু আত্মত্যাগ -সেই পথে হেঁটে লাভ কি! চারু মজুমদার বা স্ট্যালিন আজকের যুগে ইতিহাসে খলনায়ক নামে পরিচিত। কিন্তু তাদের থেকে অনেক বেশী মানুষকে স্রেফ না খাইয়ে মারা চরম অসংবেদনশীল বর্ণবিদ্বেষী চার্চিল শ্রেষ্ঠ রাজনীতিবিদের তকমা পেয়েছে। মুখের কোনো স্বীকৃতি নেই, স্বীকৃতি আছে শুধু মুখোশের।

ঐ জন্য আমি এবং আমার মত অনেক বাঙালী ইন্টেলেকচুয়াল আরামকেদারার বিপ্লবী এবং সমালোচক। ছাত্রছাত্রীরা আমাকে দেবতার আসনে বসিয়েছে। সত্যি সত্যি কুরবতের পথে হাঁটলে আমাকে মাটিতে নেমে আসতে হত। ধূলো এমনকি রক্তঘাম মাখতে হত। আমি আমার সিংহাসন থেকে নামতে প্রস্তুত ছিলাম না কোনদিনই। মার্ক্সবাদ পড়ার কারণে আমি জানি পেটি বুর্জোয়া মানসিকতার উৎস মেনস্ট্রিম ইকোনোমিকসের সবচেয়ে অপটিমাল বিনিয়োগে ম্যাক্সিমাম পে অফের ধারণা। মধ্যবিত্ত মানসিকতার ইন্টেলেকচুয়াল বিপ্লবে নামলেও সফল হওয়া নিশ্চিত জেনে তবেই নামে। অস্বীকৃতির অন্ধকারে সে কাজ করতে চায় না। ন্যূনতম আত্মনিগ্রহের বিনিময়ে সে সর্বোচ্চ খ্যাতি ও স্বীকৃতি চায়। আমি নিজেও এই মানসিকতা থেকে মুক্ত নই। ফলাফলের চেয়ে আত্মরতিটা আমাদের কাছে বড় হয়ে দাঁড়ায়। আমি বিপ্লব কোনদিনই চাইনি, বিপ্লবের নামাবলী পড়ে সম্ভ্রম আদায় করতে চেয়েছিলাম। যে কোনো বাঙালী এই সেন্টিমেন্টটার সাথে রিলেট করতে পারবে। আর ঠিক এই কারণেই ভারতে কালচারাল রেভলিউশনের কাণ্ডারী সরোজ দত্তকে আমি অপছন্দ করি। বদ্ধোন্মাদ!লেখাপড়া শিখেও যে এরকম নির্বোধ কি করে হয়! বাঙালী মধ্যবিত্তের হিপোক্রিসিটাই দেখতে পায়নি। মধ্যবিত্ত এবং সামন্ততান্ত্রিক হেজিমনি ভেঙে প্রলেতারিয়ান হেজিমনি তৈরী করতে চেয়েছিল। তার মূল্য দিতে হয়েছে নিজের জীবন দিয়ে। তৃষ্ণাও ওটাই ভুল করেছিল। আমাকে মাটিতে টেনে নামাতে চেষ্টা করেছিল। তার শাস্তি ও নিজের মার্কশিটে পেয়েছে।

থাক এসব অপ্রিয় প্রসঙ্গ। কয়েক মুহূর্তের জন্য বরং আবার ঐ ইউফোরিক স্মৃতিতে ফিরে যাই। তৃষ্ণা আমার সামনে দাঁড়িয়েছিল চোখে একরাশ অভিমান মেখে। আমি মুগ্ধ হয়ে ওকে দেখছিলাম। অভিমানের ছাপ একটা মানুষের মুখকে এতটা সুন্দর করে! কোমর পর্যন্ত খোলা চুল, মলিন পোশাক আর ওর উজ্জ্বল নরম অপাপবিদ্ধ মুখ। আচ্ছা ঐ মুহূর্তে

যদি ওকে বুকে টেনে নিতাম ও কি আমাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিত? নাকি বালির ভিতের মত আমার বাহুবন্ধনে চূর্ণ হয়ে ভেঙে পড়ত? যাই হোক প্রথম আশঙ্কাটা তো ছিলই, তাছাড়া আরও বহু সঙ্গত কারণেই সেটা করার অপচেষ্টা করিনি।

আগের দিন ওকে আমার কেবিনে আসার অনুমতি দিইনি। ও আজ আমার থেকে অনেকটা দূরত্ব রেখে দাঁড়িয়েছিল। আমার প্রথম অরগ্যাজমের সময়েও এতটা আনন্দ হয়নি। ও আমার উপর অভিমান করেছে। মানে ও আমার প্রতি বরফশীতল নয়। আমি ওকে হাতের ইঙ্গিতে কাছে এসে দাঁড়াতে বললাম। ওফ এই মুহূর্তটা সত্যিই স্বর্গীয়। আমার এতদিনের বিনিদ্র রাত্রির ঋণ যার কাছে, আমার চোখের কালির ঋণ যার কাছে-সে আমার উপর অভিমান না করলে জীবনের মানে কি হয়! ও অভিমান করবে, আমি ওর মান ভাঙাব। বার বার। কয়েক শতাব্দী ধরে, জন্মজন্মান্তর ধরে। বিছানায় রক্তঘামের সঙ্গমের চেয়েও এটা কত বড় সুখানুভূতি কেউ বুঝবে না। অথবা একমাত্র সেই বুঝবে যে এই ব্যাপারটার মধ্যে দিয়ে গেছে, এই মুহূর্তগুলো যাপন করেছে।

ওকে যাবার সময় খুবই মধুর গলায় অনুরোধ করলাম যদি ও একবার বাড়ী যাবার সময় ক্যান্টিনে আমার জন্য চা বলে যায়! (মানে এটা আমি নিজেও ক্যান্টিনে ফোন করে বলতে পারতাম কিন্তু তৃষ্ণার আনুগত্যের প্রমাণটাও দরকার ছিল।) ও সম্মতি জানিয়ে চলে গেল।

আমি এই তৃষ্ণাকে চেয়েছিলাম। নম্র, ভদ্র, অনুগত। যার সাথে হালকা চালে একটু আধটু ফ্লার্টিং করা যায় বা শরীর ছোঁয়া যায়। ও তখন নিশ্চয়ই লজ্জায় লাল হয়ে উঠবে। কিন্তু তৃষ্ণা সেটা ছিল না। তৃষ্ণা সেই আগুন ছিল না যে পতঙ্গকে নিজের মধ্যে টানে। তৃষ্ণা সেই বিপ্লববহ্নি ছিল যা হোমাগ্নির মত পবিত্র। মানুষকে শুদ্ধ করে এবং বিপ্লবের রক্তিম আত্মত্যাগের পথে টেনে নিয়ে যায়।

তৃষ্ণা সেই শঙ্খিনী নারী ছিল না যাকে স্বাভাবিক ভাবে আমরা পুরুষরা চাইলেও মনে মনে ভয় পাই। কিন্তু তাও আমি ওকে ভয় পেতাম। ওর পবিত্রতাকে, ওর মধ্যে থাকা অদ্ভুত একটা অবসেশনকে। এই অবসেশন আমাদের পশ্চিমবাংলার অজস্র ছেলেমেয়েকে একদিন অকথ্য অত্যাচার ও মৃত্যুর পথে নিয়ে গেছে। আমি অ্যাটাচমেন্টকে ভয় পেতাম। আমি ভয় পেতাম কোনো দুর্বল মুহূর্তে ওর প্রেমে না পড়ে যাই।

সাদা পরী দেখেছেন কোনো পাঠক? আমি দেখেছিলাম। এসির হাওয়ায় ওর খোলা চুল সারা মুখে অবাধ্য ভাবে ছড়িয়ে পড়ছিল। একবার তো পেনের ঢাকনাও চুলে আটকে গেল। সাদা সালোয়ার কামিজে পৃথিবীর সবচেয়ে নরম কাদামাটির মূর্তি, অবাধ্য চুল ওড়না নিয়ে বিপর্যস্ত(সালোয়ারকামিজে মেয়েটা একদম স্বচ্ছন্দ বোধ করত না)। আর ঐ চুলের মধ্যে ফুটে থাকা সদ্যস্ফুট গোলাপের মত ওর মুখ। সেদিন গোটা পৃথিবীর কেন্দ্রটা ঐ দুঘন্টার জন্য এসির পাশের লাল চেয়ারটায় উঠে এসেছিল। বার বার ডিসট্র্যাকশন ঘটছিল। অন্যান্য ছাত্রছাত্রীরা বিরক্ত হচ্ছিল। তৃষ্ণা পর্যন্ত অস্বস্তি বোধ করছিল। অপর্ণা সম্ভবত রেগে যাচ্ছিল। কিন্তু আমার মস্তিষ্ক ঐ দুঘন্টার জন্য তৃষ্ণার পায়ের নীচে পড়েছিল। শালীন অশালীন বোধ, ন্যায় অন্যায় কিছুই কাজ করছিল না।

কিন্তু ঐ মুহূর্তগুলো কালবৈশাখীর মত হয়। একরাশ ঝড় বৃষ্টি এনে ভিজিয়ে দিয়ে যায়। ভেজার সময়টা আমরা একরকম ডিলিরিয়ামের মধ্যে থাকি। মস্তিষ্ক অবশ হয়ে থাকে।পরে ড্যামেজটা উপলব্ধি করা যায়। তখন ঝড় থাকে না, ঝড়ের কারণও আমাদের ছেড়ে নিজের জীবনে অনেকদূর এগিয়ে চলে যায়। শুধু আমরা পড়ে থাকি শ্মশানের ধূসর নিস্তব্ধতার মধ্যে। প্রচণ্ড ভিড়েও একা হয়ে। তৃষ্ণা তখন রূপকথার চরিত্র হয়ে আমার জীবনে ছিল, এখন নেই। কিন্তু আবার আছেও। আমার মধ্যে একটা জম্বি হয়ে। প্রেতাত্মা হয়ে। এই তৃষ্ণা কিন্তু বাস্তবের তৃষ্ণার চেয়ে আলাদা। এই তৃষ্ণা কোন মানুষ নয়। এই তৃষ্ণা শুধুই অপূর্ণ থাকা বুক ফাটা একটা তৃষ্ণা। যা আমার ভঙ্গুর পৌরুষে প্রতিনিয়ত চিড় ধরায়।

পর্ব ৯

তৃষ্ণার কথা

প্রশ্ন উঠবে। কুৎসা, অপ্রাপ্তির হাহাকার, ব্যর্থতার পক্ষে সাফাই গাওয়া, দৃষ্টি আকর্ষণ করার চেষ্টা ইত্যাদি নানা বিশেষণে এই লেখাটা অলংকৃত হবে। এমনকি আমার ব্যক্তিগত জীবনের দিকে কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি হওয়াও অসম্ভব নয়। আরেকটাও চমৎকার পন্হা আছে। অভিযোগকারীর মানসিক সুস্হতা নিয়ে প্রশ্ন তোল। ক্ষমতাশালীরা বিরুদ্ধবাদীর উপর অন্যতম যে অস্ত্রটা প্রয়োগ করে থাকে।

গড্ডালিকাপ্রবাহের প্রতিকূলের পথ বন্ধুরতম। সবাই যখন বাহুতে স্বস্তিকা এঁকে হাঁটে তখন সোফি স্কোলদের গন্তব্য হয় গিলোটিন। সহনাগরিক, এক্ষেত্রে সহপাঠী- কারোর কাছ থেকেই আমি কমরেডলি অনুভূতি আশা করছি না। আমার কাজ সিদ্ধান্ত জানানো নয়, শুধু ঘটনাবলী তুলে ধরা। বিচার এবং সিদ্ধান্তের দায়িত্ব পাঠকের। হিউমিলিয়েশন, বিদ্রূপ, প্রতিকূলতা, এমনকি শারীরিক আঘাতের বিষয়ে একটা সুফিসুলভ নিস্পৃহতা আনতে এতদিনে সক্ষম হয়েছি বলেই হয়ত কলম ধরতে পেরেছি। একজন অ্যাকটিভিস্টের কর্তব্য শুধু ক্রিয়া নয়, সেই ক্রিয়ার ফলস্বরূপ যে পরিণতিটা আসছে তার ধাক্কাটাও সামলানো। হ্যাঁ সেই ধাক্কাটা নেবার মেরুদন্ড আমি গড়ে তুলেছি, এই একবছর ধরে তিলে তিলে।

আপনার আসল চেহারাটা তুলে ধরার কনসিকোয়েন্স কি হতে পারে? আপনি যে ক্ষমতার জায়গায় রয়েছেন তার নানারকম অপপ্রয়োগ! যেমন মিডিয়ার সামনে আমার চরিত্রহনন, আইনি পথে বিপর্যস্ত করার চেষ্টা। অথবা যাদের মস্তিষ্কে আপনি প্রায় প্রফেটের স্হান অর্জন করেছেন, আপনার প্ররোচনায় তাদের অ্যাসিড অ্যাটাক, কিংবা তুলে নিয়ে গিয়ে গণধর্ষণ। ক্ষমতাবানের পক্ষে ক্ষুদ্রকে শিক্ষা দেওয়া খুব একটা কঠিন কাজ নয়। বিশেষ করে মেয়ে হলে কথাই নেই। আমার উপর যদি একটাও শারীরিক আক্রমণ রাস্তায় ঘটে তার জন্য আমি আপনাকে দায়ী মনে করব। একটা আপাত সৌম্য, ভদ্র চেহারার পিছনে আপনার চরিত্রের নোংরা দিকটা আমার চোখে আপনি লুকোতে পারেননি। জাহান্নামে যাক অন্যদের মতামত, এই লেখাটা পড়ে আপনি একবার তাকাতে পারবেন আয়নার দিকে? নিজেকে প্রশ্ন করুন ডঃ ভট্টাচার্য, আমার বক্তব্যে কতটা মিথ্যে আছে। অস্বীকার করতে পারবেন করিডর দিয়ে হেঁটে যাবার সময়

আড়চোখে আমাকে দেখতেন? আমাকে ফলো করে প্রেজেন্টেশনের দিন পর্যন্ত চলে এসেছিলেন? আপনার গ্রুপের প্রেজেন্টেশনের টাইম স্লট আমাদের ঠিক পরপর হওয়ার ঘটনাও কাকতালীয়? আমি অন্তত সেটা মনে করি না।

কন্যাসমা একজন ছাত্রীকে কি চোখে দেখেছিলেন আপনি? আপনার নিজের আমার বয়সী একটা মেয়ে আছে, আপনার বয়সী কোনো অধ্যাপক তার দিকে ঐ চোখে তাকালে এবং পরে ব্যর্থ মনোরথ হয়ে মার্কশিটে শোধ তুললে ক্ষমা করতে পারতেন তাকে? আপনার নিজের ছেলেমেয়েরা শুধু মানুষ, অন্যরা রাস্তার কুকুরবিড়াল বলুন? আপনি অসাধারণ লেকচারার, দারুণ স্পিকার কিন্তু একজন মাস্টারমশাই হয়ে উঠতে পারেননি। একজন শিক্ষকের চরিত্র কিরকম হওয়া উচিত এটা যদি সব্যসাচী স্যরকে দেখে শিখতে পারতেন! আপনার কেবিনের মুখোমুখি কেবিনেই বসেন ভদ্রলোক।

উন্নাসিকতা আপনি বাইরে দেখাতে পারেন, আমাকে বিদ্রূপ করতে পারেন, ইউনিভার্সিটি আপনার জায়গা, আপনার পক্ষে দাঁড়ানো লোকজনের অভাব নেই, সেখানে দাঁড়িয়ে প্রশ্ন তুললে আপনি চিৎকার চেঁচামেচি করে একটা সিন ক্রিয়েট করলেও বিস্মিত হব না। প্রশ্নের উত্তর এড়ানোর ওটাই তো চমৎকার উপায়।

কিন্তু একান্তে আমার মুখোমুখি দাঁড়াবার সাহস আপনি কোনোদিন অর্জন করে উঠতে পারবেন না। সত্যি বলতে সামনাসামনি আমাদের কখনও দেখা হোক এটা আমি চাইও না। আমার জীবনে আপনি একটা দুঃস্বপ্ন ছাড়া কিছু নন। আপনার চোখের দৃষ্টিটুকুও আমার উপর পড়লে আমার মনে হত আমার সারা শরীর জুড়ে অজস্র আরশোলা হাঁটছে। মলয়া দেবীর চোখে রুণু নিয়োগী যা, আমার কাছেও আপনার ঠিক সেই অবস্থান। কোনোদিন আপনার মুখ দেখতে চাই না। এতটা ঘেন্না কেন করি জানেন আপনাকে? কারণ একসময় শ্রদ্ধা করতাম। কারণ আমি যে দর্শনটাকে আমার জীবনের উপজীব্য মনে করি আপনি সেটা আমাদের পড়াতেন। এবং প্রত্যেক পলে পলে যাপনের ক্ষেত্রে আপনি সেই দর্শনের বিপরীত পথে হেঁটেছেন। আপনার মত ভন্ডের চেয়ে আমি একজন স্পষ্টবাদী ধর্মান্ধকে বেশী শ্রদ্ধা করি।

শিক্ষক তো দূরের কথা, আমি আপনাকে মানুষ বলেও মনে করি না। অন্তত যদি মেরুদণ্ডী প্রাণী হন, আমাকে confront করুন। আমার এই প্রশ্নগুলোর উত্তর দিন।

থার্ড সেমে শম্পা ম্যাডামের হাত থেকে কায়দা করে ইন্টারনালের নম্বরটা সরিয়ে নেওয়া হল কেন? অপর্ণা এলিয়েনেশনের প্রশ্নটা বই থেকে না লিখে ও অন্য একটা প্রশ্ন ভুল লিখেও কি করে পল ইকোয় হায়েস্ট পেল থার্ড সেমে? ফোর্থ সেমে শম্পা ম্যাডামকে আপনি শুধু এপ্রিলের শেষ দু সপ্তাহের ক্লাস ছেড়েছেন, এবং পঞ্চাশের মধ্যে পুরো চল্লিশ নিজের হাতে রাখলেন। তাঁর হাতে মাত্র দশ নম্বর রইল। এবং তাঁকে মিথ্যে বললেন যে সারা মে মাসটা উনি ক্লাস পাচ্ছেন। অথচ আপনি খুব ভাল করে জানতেন যে মে মাসের মাঝামাঝি আমাদের পরীক্ষা। এবং এপ্রিলের পর থেকে ইউনিভার্সিটি ছুটি পড়ে যাচ্ছে। পল ইকোর নম্বরের অস্বাভাবিক ডিস্ট্রিবিউশন এবং তারপর সারা সেমিস্টার বেশীরভাগ ক্লাস না করেও অপর্ণার ৪১ তথা হায়েস্ট পাওয়া - এরকম মিরাকল বোধহয় আপনি

খাতা দেখলেই একমাত্র সম্ভব। আমি না হয় আপনার মেল ইগোকে অ্যাপিজ না করার ধৃষ্টতা দেখিয়েছি। সায়ন্তনী তো সেটা করেনি। সব সময় নিজের মাথা আপনার সামনে নীচু রেখেছে। নম্র, ভদ্র, পলিশড এবং মেধাবী। যে মেয়েটা মাস্টার্সে প্রায় ৭২% নম্বর নিয়ে বেরোল সে এম ফিলের রিটন পরীক্ষায় চান্স পেল না। বিশেষ করে অপর্ণা তার উপর ক্ষেপে ওঠার পরপরই এটা ঘটে। কিসের দায় ছিল আপনার অপর্ণাকে এত তোষণ করবার? যে প্রশ্নগুলো ক্লাসে বা ইমেলে আলোচনা করা যায়, সেগুলোর জন্য আমাকে বার বার ঘরে ডাকতেন কেন? পলিটিকাল ইকোনমি পেপারটা পড়ানো এক বছরের জন্য বন্ধ করে দেওয়া হল কেন? বা বন্ধ করতে বাধ্য হলেন কেন? এম ফিলে মার্ক্সিয়ান ইকোনোমিকসের বিষয়ে পাঁচ ছটা ছেলেমেয়ে এস ও পি দেওয়ার পরও ইন্টারভিউ বোর্ডে আপনার বিচিত্র ও রহস্যময় অনুপস্থিতি। কেন কাজলবাবু? ইন্টারভিউতে অপর্ণাকে সিলেক্ট করতেই হত আর আমার মুখোমুখি হবার সাহস সঞ্চয় করে উঠতে পারেননি? নাকি আপনার ধারণা ছিল যদি আপনার হস্তক্ষেপ ছাড়াও অপর্ণা সিলেক্টেড হয় তাহলে আমি আপনাকে ছেড়ে কথা বলব না? একটা সামান্য ছাত্রীকে এত কিসের ভয় কাজলবাবু? কত জনপ্রিয়, ক্ষমতাবান, বিখ্যাত মানুষ আপনি! আচ্ছা আপনাকে হঠাৎ অভিযোগ করতে যাব কেন বলুন তো!

অপর্ণার আপনার উপর একটা বিচিত্র অধিকারবোধ ছিল। দৃষ্টিকটু ভাবে বিচিত্র। আপনার ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে প্রচুর আগ্রহ ছিল তার। ওর এই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে আপনার প্রসঙ্গ সব কিছুতে টেনে আনা একটা বিরক্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল আমার পক্ষে। যেমন একদিন আমি ক্যাজুয়াল মিস্যান্ড্রিস্ট একটা জোক ক্র্যাক করছিলাম, "ধুর ছেলেরা আবার সচ্চরিত্র হয় নাকি?"

অপর্ণা ওর স্বভাবসিদ্ধ পদ্ধতিতে ঘোঁতঘোঁতিয়ে উঠল, "মানে কেবিএইচ দুশ্চরিত্র? "

তারপর গ্রুপ প্রোজেক্টের ব্যাপারে ও একরকম নিশ্চিত ছিল অ্যাডমিনিস্ট্রেটর আপনি হবেন। সেটা না হওয়ায় এবং সায়ন্তনীদের গ্রুপের দায়িত্ব নেওয়ায় ও রীতিমত অফেন্ডেড হয়েছিল সায়ন্তনীর উপর। তারপর আপনি প্রেজেন্টেশনে ওদের নাকি খুব সাহায্য করেছিলেন। এটা অপর্ণা নিতে পারেনি। অথচ একজন মেন্টরের পক্ষে নিজের গ্রুপকে সাহায্য করাই স্বাভাবিক নয় কি? এরপরই ও সায়ন্তনীর উপর ক্ষেপে যায় এবং কাকতালীয় ভাবে সায়ন্তনীকে এম ফিলের রিটন টেস্ট থেকে বাদ পড়তে হয়।

ছাত্রছাত্রীদের কনভার্সেশনে শিক্ষকের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গটা উঠে আসার কথা নয়। যদিও অপর্ণা সেটা প্রায়ই অপ্রাসঙ্গিক ভাবে টেনে আনত। সায়ন্তনীকে ও যেমন পছন্দ করত না, তেমনি আপনার স্ত্রীকেও করত না। ওর একটা উদ্ধৃতি তুলে দিই।

"কেবিএইচের ওয়াইফকে কি জঘন্য দেখতে। কালো বিচ্ছিরি।"

আমি বলেছিলাম, "এভাবে কারোর ব্যাপারে বলতে নেই।"

আসলে কাজলবাবু আমি একটা মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে। তাই বডি শেমিং এর কালচারে অভ্যস্ত নই। আসলে আমার তো আপনার বা অপর্ণার মত অভিজাত ব্যাকগ্রাউন্ডে আপ ব্রিঙ্গিং হয়নি। ইউরোপিয়ান কনস্ট্রাক্ট অফ বিউটিকে স্ট্যান্ডার্ডাইজ করা আপনাদের মত অভিজাত মানুষদের পক্ষে স্বাভাবিক। বডি শেমিং এর সংস্কৃতি আপনার বা অপর্ণার

মত লোকেদের পরিবারে তৈরী হয়। অথচ ক্লাসে ইউরোসেন্ট্রিজম বা ওরিন্টালিজম নিয়ে কত বড় বড় বক্তৃতা দিতেন আপনি। ফেমিনিজমের বিভিন্ন স্কুলগুলোর প্রথম ধারণা আপনার কাছেই পাওয়া আমাদের। অথচ... ভাবছেন আপনাকে কেন অভিযোগ করছি?

এই কথাগুলো ওর মাথায় এল কোথা থেকে কাজলবাবু? ওর তো আপনার স্ত্রীকে চেনার কথা নয়। আপনার কাছ থেকে শুনেছে বিশেষণগুলো? যদি এটা সত্যি হয় তাহলে আপনার এই বোধটাও নেই ছাত্রীর কাছে নিজের স্ত্রীর নিন্দে করলে নিজেরও সম্ভ্রমহানি হয়? আর কত নীচে নামবেন আপনি? ভালো কথা আপনার পিএইচডির বিষয় ইন্টারসেকশনাল ফেমিনিজম ছিল না?

পর্ব ১০

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

অপর্ণার উরুসন্ধির মধ্যে আমার অসম্ভব বিবমিষা হচ্ছিল। এই দুর্গন্ধময় দম আটকানো অভিজ্ঞতার জন্যই আজকাল আমি ক্লসট্রোফোবিক হয়ে যাচ্ছি। ও আমার মাথাটা চেপে ধরে রেখেছে, কোনমতে নিজেকে ওর হাত থেকে ছাড়িয়ে আমি বেসিনে গিয়ে ঝুঁকে পড়লাম। হড়হড় করে খানিকটা বমি হল। এই ওরাল সেক্স জিনিসটা আমার একদম পোষায় না। গা ঘিনঘিন করে। অন্তত অপর্ণার সাথে। কিন্তু আজ ওকে শান্ত করার এটাই একমাত্র উপায় ছিল। যা সাংঘাতিক ক্ষেপে গেছে!

আমি ওর পুরো সাবস্ট্যান্সটা বমি করে ফেলায় ও ফিউরিয়াস হয়ে উঠে এসে আমার উন্মুক্ত নিতম্বে সপাটে লাথি কষাল। আমি টাল সামলাতে না পেরে মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেলাম।

ও আমার চুলের মুঠি ধরে আমার মাথাটা উঁচু করে তুলে ধরল। তারপর হিসহিসে গলায় বলল, "এখন আর আমাকে পছন্দ হচ্ছে না, তাই না?"

বলে একটা অত্যন্ত অশ্লীল গালি দিল।

আমি ওর হাত থেকে নিজেকে ছাড়ালাম না। কাতর গলায় বললাম, "তোমাকে অদেয় আমার কিছুই নেই অপর্ণা।" ও আমার চুল ছেড়ে দিল ঠিকই, তবে শান্ত হল না। একইরকম জিঘাংসা পূর্ণ গলায় বলল, "সায়ন্তনীর বুকে কনুই ঠেকাতে খুব মজা লাগে বলো? আমি সব খুলে দিচ্ছি তাতেও হচ্ছে না।"

-"আমি কিছু করিনি। তুমি ভুল বুঝছ।"

-"আমি ঘাসে মুখ দিয়ে চলিনা শুওরের বাচ্চা," চিৎকার করে উঠল অপর্ণা, "কি ভেবেছ কিছু দেখতে পাব না? ঐ মাখো মাখো করে ছবি তোলা, সারাক্ষণ লেপ্টে থাকা..."

-"ও আমার পিছনে এলে আমি কি করব?" অসহায় ভাবে বললাম আমি।

-"সায়ন্তনী যেন এম ফিলের রিটনেই ছাঁটা হয়ে যায়। নইলে তোমার ন্যাংটো ভিডিওগুলো ফেসবুকে তোমার বউ, বাচ্চা, ছাত্রছাত্রী, কোলিগস সবাই দেখবে। সেটা কি খুব ভাল হবে?"

-"প্লিজ অপর্ণা"

-"শাট দ্য ফাক আপ। কি পেয়েছ আমাকে? প্রস্টিটিউট?"

-"মাইন্ড ইওর ল্যাঙ্গুয়েজ, প্লিজ। "আমি দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললাম, "তুমি যা চাইছ তাই হবে। আমাকে এখন একটু একা থাকতে দাও।"

অপর্ণা আমার পাশে বসে হেঁচকি তুলে কাঁদছিল, "ভালবাসি তোমাকে কাজল, ভালবাসা। তোমার মত শরীর সর্বস্ব একটা পশু কথাটার মানে বোঝে?"

-"আমি তো তোমার কোনো কথারই অবাধ্য হচ্ছি না অপর্ণা।"

-"তাহলে তৃষ্ণার দিকে ঐভাবে কেন দেখ? আমাকে সাথে সবচেয়ে ইন্টিমেট মুহূর্তগুলোয় ওর নাম কেন বলছিলে কাজল?" ভেঙে পড়া গলায় বলল অপর্ণা। আমি ওকে বুকে টেনে নিতে পারলাম না। একটা ঠান্ডা স্রোত আমার শিরদাঁড়া দিয়ে নেমে গেল। কোনো উত্তর না দিয়ে চুপ করে বসে রইলাম আমি। কখন ওর নাম করেছি সেটা মনেও নেই। তবে এই ঘটনাটা বোধহয় বাড়ীতেও একবার ঘটেছে। শর্মিষ্ঠা ইদানীং আমাকে সন্দেহ করতে শুরু করেছে। একদিন ও ও আমাকে জিজ্ঞেস করছিল "তৃষ্ণা কে?" কোনোমতে কাটিয়েছি। বাড়ীর কথা মনে পড়তেই ভয়টা আরো বেশী করে আমাকে চেপে ধরল।

অপর্ণা আমার মুখটা দুহাতে তুলে ধরল যাতে ওর চোখের দিকে আমি তাকাতে বাধ্য হই। তারপর বলল, "তুমি তৃষ্ণাকে ভালবাস কাজল?"

আমি ফসিল হয়ে বসে রইলাম। এবারও কোনো উত্তর দিলাম না। ও বলল, "তৃষ্ণা আসলে মাওবাদীদের গোপন সমর্থক। ও ইন্দ্র মজুমদার নামে একটা ছেলের সাথে প্রেম করে। শি ইজ আ পিউরিস্ট বিচ। তোমাকে ও ঘেন্না করে। অশ্রদ্ধা করে। কোনোদিন শরীর দেবে না। ওর পিছনে ঘোরা বন্ধ কর।"

আমার পক্ষে আর ওকে সহ্য করা সম্ভব হল না। ওকে সরিয়ে দিয়ে জামাকাপড়গুলো তুলে নিয়ে বাথরুমে ঢুকে গেলাম। অপর্ণাদের বয়সে এই 'ভালবাসা' জাতীয় শব্দগুলোর প্রাসঙ্গিকতা থাকে। ও জানে না আমার অভিধানে এরকম কোনো শব্দ নেই। মানে অন্য কোন মেয়ের জন্য। ভালবাসা শব্দটার ব্যাপ্তি অনেক গভীর। এটা শুধু শরীরী টান নয়। এটা এমন একটা অনুভূতি যা নিজেকে দয়িতের কাছে তুচ্ছ করে তোলে। ভালবাসার পাত্রীর জন্য আত্মনিগ্রহ

করতে, এমনকি নিজেকে ধ্বংস করতেও এতটুকু দ্বিধা থাকে না। এটা সারা পৃথিবীতে একজনের জন্যই তোলা আছে। সে আমার রক্তের অংশ, আমার আত্মজা, শ্রেয়সী।

হ্যাঁ, ভালবাসি বলেই শরীরী ভাবে ওকে চেয়েও আমি আজ পর্যন্ত ওর দিকে হাত বাড়াইনি। ও অন্য একটা ছেলেকে ভালবাসে। এই বিষয়টা আমাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করলেও ওর আনন্দের জন্য মেনে নিয়েছি। সমাজের, এমনকি প্রগতিশীল বামপন্থীদের পর্যন্ত প্রেম বা যৌনতা নিয়ে এই ছুঁতমার্গগুলো আমার পোষায় না। প্রেমের কোন বাধ্যবাধকতা থাকতে আছে নাকি! প্রেম হবে মুক্ত। ইনসেস্ট প্রেম বা বিয়ে কেন নিষিদ্ধ হবে! এই যৌনতা সংক্রান্ত ছুঁতমার্গের জন্যই আমার লেনিন বা স্ট্যালিনকে পছন্দ হয় না। স্ট্যালিনটা আবার মার্ক্সবাদের কিছু জানত নাকি? প্রকৃত মার্ক্সবাদী যদি কেউ থেকে থাকে সে হচ্ছে আলথুজার। আর তার একমাত্র উত্তরাধিকারী হচ্ছি আমি। অবশ্য ট্রটস্কি বা টিটোকেও আমার মার্ক্সবাদী বলতে তেমন আপত্তি নেই। স্ট্যালিনকে ওরাই উপযুক্ত শিক্ষা দিয়েছিল। তারপর বরফ পরিষ্কার করার কুঠারটাই সব গন্ডগোল করে দিল।

তাত্ত্বিক আলোচনা থাক। কিন্তু অপর্ণা আমার একটা দুঃস্বপ্নকে এক্সপ্লোর করে দিয়েছে। বিষয়টা আর খেলায় সীমাবদ্ধ নেই। আমি তৃষ্ণার প্রতি অ্যাডিক্টেড হয়ে পড়ছি। কোন কিছু আর আগের মত নেই। আমার কাজ কর্ম, গবেষণা – সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। একদিন ক্লাসে গিয়ে লেনিনের স্ত্রীর নাম ভুল বললাম। বাড়ীতেও নানারকম গন্ডগোল করে ফেলছি।

আমি এটা চাইনি। আমি চেয়েছিলাম ওর বালিশ ভেজার কারণ হতে, ওর রাত জাগার কারণ হতে। ও এভাবে আমার সর্বস্ব জুড়ে বসবে কল্পনাও করতে পারিনি। ওকে এমন জায়গায় নিয়ে আসতে চেয়েছিলাম যে ও আমার প্রেমে হাবুডুবু খাবে, এভাবে ওকে ভালনারেবল করে তুলে ওকে নিয়ে যা ইচ্ছা তাই করব। কখনও আদর, কখনও ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া। আজ আমি এমন একটা মানসিক অবস্থায় পৌঁছেছি যে ও একটু ভাল করে কথা বললেই সারাটা দিন অবশ হয়ে থাকে। বিশ্বাস কর তৃষ্ণা, আজ তোমাকে একবার চোখে দেখতে পেলে, তুমি একটু ভাল ভাবে আমার সাথে কথা বললে আর কিছু চাই না। তোমার শরীরটাও না। অপর্ণা আমাকে বলছে তৃষ্ণার ফার্স্ট ক্লাসটা আটকাতে। কিন্তু সেটা করলে ও আমার সাথে কোনদিন যোগাযোগ রাখবে না। কেমন হবে আমার তৃষ্ণাবিহীন জীবন! মস্তিষ্ক আর হৃদপিন্ডে আমি তৃষ্ণার থেকে কোনোদিন আদৌ কি মুক্ত হতে পারব? এমনকি ওর থেকে দূরে গিয়েও? জানি না। সবাই জানে মস্তিষ্ক আর হৃদয় সবসময় বিপরীত পথে হাঁটে। আমি জানি তৃষ্ণার প্রতি আমার যা কিছু ব্যাখ্যাতীত তৈরী হচ্ছে সেটা আমার পক্ষে ভাল হবে না। এই নেশাটা কাটা দরকার। খুব দরকার। আর হৃদয় বলছে ওকে ধরে রাখতে। এই প্রথমবার খুব অসহায় লাগল আমার। শাওয়ারটা খুলে দিয়ে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললাম।

এই বাথরুম জায়গাটা আমার সমস্ত অনুভূতির সাক্ষী। মেঘ বুকের ভিতর জমুক বা আকাশে, সবসময় পরিষ্কার হতে একটা বৃষ্টিপাত দরকার। এতদিন ঐ বৃষ্টিটা সিমেন হয়ে ঝরেছে। আজ প্রথমবার চোখ থেকে নামল। তৃষ্ণা আমার থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। আগে যেটুকু অভিমান বা রাগ করতে দেখেছি সেটাও আস্তে আস্তে অবশিষ্ট থাকছে না। তিন চারদিন ধরে আক্ষরিক অর্থে ওর পিছনে ঘুরছি, একবার মুখ তুলেও দেখছে না। এর আগে কয়েকবার ঘরে

ডেকেছিলাম, আসেনি। এমনকি যেদিন বাকি ছাত্রছাত্রীরা আমার সাথে শেষবার দেখা করতে এল সেদিনও না। আমিই একবার বাধ্য হয়ে ডেকে কথা বললাম, একটা দায়সারা গোছের উত্তর দিল। ওর ঘৃণা আমি সহ্য করতে পারি, কিন্তু এই নিস্পৃহতা?

টেলিপ্যাথি বলে সত্যিই কি কিছু হয়? দেখ তৃষ্ণা, এই ভাদুরে কুত্তা চরিত্রহীন কাজল ভট্টাচার্য তোমার জন্য কাঁদছে। পাথরে মাথা ঠুকলেও পাথর ভাঙতে পারে, তুমি একটু ভাঙবে না! বেশীটা না হয় তোমার ইন্দ্রের জন্যই রাখলে, আমাকে একটুও কিছু দেবে না?

পর্ব ১১

তৃষ্ণার কথা

একদম কোণঠাসা না হয়ে গেলে কেউ মাওবাদী বা নকশালপন্থী রাজনীতিকে বেছে নেয় না। বা রক্তের অশ্রু না ঝরাতে হলে। যদিও আমি নিজের জীবনী লিখতে বসিনি। শুধু মাস্টার্সের সেই পর্বের ঘটনাগুলো। তাও ছোট করে স্মরণজিৎ বাবুকে স্মরণ করে কয়েকটা কথা লিখে ফেলা যায়।

যে লোকটা আমার শ্লীলতাহানি করার চেষ্টা করেছিল ক্লাস টেনে, সে ব্যর্থ হয়ে আমাকে চড় মেরেছিল। আমি তারপর তাকে বাড়ী থেকে বের করে দিই। লোকটা আমাকে ইংরাজী পড়াত। আমার মায়ের কলিগ ছিল। মা ওকে নিজের দাদার মত দেখতেন। ভাইফোঁটাও দিতেন। ঘটনাটায় মা খুব অফেন্ডেড হয়েছিলেন আমার উপর। আমার মা বাবা দুজনেই তার সাথে দীর্ঘদিন সুসম্পর্ক রেখেছেন। যদিও আমি তাকে আর বাড়ীতে আসতে অ্যালাউ করিনি। পরে লোকটা তাদের বাড়ীর ডোমেস্টিক হেল্পের সাথে বলপ্রয়োগ করার সময় ঘটনাটা চাউর হয়ে যায়। ও হ্যাঁ আমাদের কাজের মাসির সাথেও লোকটা আলাপ করার চেষ্টা করত।

এবং তখন আমার মা বাবা আমার অভিজ্ঞতাটাকে লঘু করে দেখা বন্ধ করেন। এটা নয় যে তাঁরা আগে আমাকে অবিশ্বাস করেছিলেন। তাঁদের বক্তব্য ছিল একদিনে দেবুদার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করা যায় না। লোকে কি বলবে! "লোকে কি বলবে!" আমাদের দেশে সবচেয়ে অপব্যবহৃত তিনটে শব্দ। কাজল ভট্টাচার্য, দেবপ্রসাদ ঘোষেরা এই তিনটে শব্দের আড়ালে সুন্দর বেরিয়ে যায়। কাজলবাবু পেন, বই বা ট্যাব নেবার অজুহাতে আমার আঙুল খামচানো ছাড়া কখনও আমাকে স্পর্শ করেননি। কিছু অশ্লীল দৃষ্টি, কিছু অস্বস্তিতে ফেলা কথা ও ব্যবহার-কাউকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে পারে না। খাতায় নম্বরের কিছু কারচুপিও না। কত প্রভাবশালী, কত দেবত্বপ্রাপ্ত, কত......অ্যাটোমিক এজেন্টের মূল্য কি তার সামনে! ফুলের মালা, ধূপের ধোঁয়া আর "লোকে কি বলবে" এর আড়ালে কত অপর ফোরক্লোজড হয়ে যায়। অভিধান এবং ইতিহাস বই থেকে বাদ পড়ে। অশোক, আলেকজান্ডার, আকবররা কত মৃতদেহের স্তূপ এবং ধর্ষিতার ছিন্নবস্ত্রের ভিত্তিপ্রস্তরে ক্রমশ সিংহাসন উঁচুতর করেন। তারপরও ইতিহাস বইতে তাঁরা মহান সম্রাট হিসাবে খ্যাতি পান। হিটলারের দুর্নাম হয়েছে ইউরোপের মত জায়গায় প্রতিষ্ঠিত ইহুদী ও জেন্টাইলদের

গায়ে হাত দেওয়ায়। চার্চিল কিন্তু ভারতের অজস্র মানুষের কঙ্কালসার মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়েও ঘৃণিত নন। সিপাহী বিদ্রোহের ভারত, বা ভিক্টোরিয়ার ভারত কিংবা আফ্রিকা, আমেরিকায় কত হলোকস্ট ঘটে গেছে। আমরা জানি না। কারণ প্রায়োরিটি। তৃণের নিয়তিই পদদলিত হওয়া। আমরা এই বিষয়টাকে স্বাভাবিক করে নিয়েছি। তৃণমূলস্তরে কোনো ইতিহাস লেখা হয় না যে।

আমি অপর্ণা নই, আমার দাদা ইকোনোমিস্ট নয়। আমি খুব মডেস্ট ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে এসেছি। এই কথাগুলো অপর্ণা আমাকে ঠাট্টার ছলে প্রায়ই বলত। যেমন একদিন বলল আমি কোনোদিন নাকি আসল সিল্ক দেখিনি। ওদের আর্থিক অবস্থা খুবই ভাল, তাই ওর সিল্কের বিষয়ে জ্ঞান বেশী। তখন ও নিয়মিত দুটো সিল্কের ওড়না নিয়ে আসত। তারপরদিনই ওদের বাড়ীতে চুরি হয়ে যায়। টিভি, রেফ্রিজারেটর সহ জামাকাপড় পর্যন্ত।

অপর্ণার এই অন্তঃসারশূন্য আত্মম্ভরিতার পিছনে একটা অসহায়ত্ব দেখতে পেতাম। ওকে দেখে করুণা হত। প্রতিমুহূর্তে প্রাসঙ্গিক এবং অপ্রাসঙ্গিক ভাবে নিজের শ্রেষ্ঠত্ব জাহির করে চলেছে। এর পিছনে ছিল একটা গভীর হীনমন্যতা। আমাকে চারটে অপমানজনক কথা বললেও ও কাজল ভট্টাচার্যকে পুরোপুরি ধরে রাখতে পারছিল না। ওর বশংবদ হয়েও কাজলবাবু আমার প্রতি নির্লিপ্ত থাকতে পারছিলেন না। সেটাই ও সহ্য করতে পারছিল না। অথচ কাজলবাবু ওর সামনে প্রায় অনুগত সারমেয়র মত আচরণ করতেন। কিন্তু আসল জায়গায় সব বাঁধ ভেঙে পড়ছিল। সেটা ওদের দুজনের পক্ষেই অস্বস্তির কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কাজলবাবুর প্রতিও আমার সত্যিই করুণা হত।

কাজলবাবুকে আমি ডেভেলপমেন্টের মাওবাদী ধারণা নিয়ে একটা প্রশ্ন করেছিলাম ক্লাসে। তিনি যথারীতি ক্লাসে সেটা আলোচনা না করে একটু নার্ভাস ভাবে ওঁর ঘরে দেখা করতে বললেন। আমার বিষয়টা নিয়ে সঙ্গত কারণেই অস্বস্তি ছিল। মাসতিনেক আগে আমি বইমেলা থেকে মার্ক্সবাদী সাহিত্যের কি বই কেনা যায় সে ব্যাপারে সাজেশন চাওয়ায় আমাকে ইমেলে কিছু বইয়ের কথা বলেছিলেন। পরদিন মারাত্মক প্রসন্ন ছিলেন আমার উপর। পরে বুঝেছিলাম ওটা সম্ভবত নিজে থেকে মেল করা ও ধন্যবাদ জানানোর কারণে। আমার বই কেনা হয়ে গেছিল। আর বইমেলায় যাবার কথা নেই শুনেও প্রায় জোর করে দুটো বইয়ের নাম লিখে দিলেন। তার একটা ছিল অ্যালেন বাদিউর ইন প্রেইজ অফ লাভ। বইটায় রাজনীতি ও বিপ্লবের সাথে প্রেমের সম্পর্কে আলোচনা আছে বলে কাজলবাবু আমাকে কিনিয়েছিলেন। হতে পারে প্রকাশকের থেকে ওঁর কিছু কমিশন প্রাপ্য ছিল। অথবা....সেই গরুর রচনা। ভদ্রলোক জানতেন আমাকে বিপ্লবের কথা বলে দরকার হলে দণ্ডকারণ্যেও পাঠিয়ে দেওয়া যায়। মানে আমাকে উত্তেজিত করতে ঐ একটা শব্দই যথেষ্ট।

-"লাভ মানে? হাউজহোল্ড লেবারের ব্যাপারে?"

-"নো, নট অ্যাট অল। লাভ, নারীপুরুষের চিরন্তন প্রেম। "হাসিমুখে বলেছিলেন কাজলবাবু।

-"এটা তাহলে আমরা ...মানে কি কাজে লাগবে?"

-"আরে বিপ্লব আর প্রেম নিয়ে এটা একটা অসাধারণ বিশ্লেষণ। পড়ে দেখোই না।"

বইটা আমি গত সপ্তাহে পড়ার সময় পেয়েছি। এবং যা দেখলাম বিষয়টা মোটেই রাজনীতির ব্যাপারে সীমাবদ্ধ নয়। ওটা একটা অংশ মাত্র। বইটা সবরকম বাধা অস্বীকার করা প্রেমের। মানে বিবাহবন্ধন, রাষ্ট্র, পরিবার সব প্রেমের কাছে তুচ্ছ। ঐ বাঁধভাঙা ঝোড়ো প্রেমকেই বিপ্লবের সাথে তুলনা করা হয়েছে। যদিও বইটা অপর্ণার জন্য বলেননি, তাও সে চরম উৎসাহে আমার আগেই ওটা কিনে ফেলেছিল।

বয়স্ক একজন অধ্যাপকের কাছ থেকে নানাবিধ অস্বস্তিকর ব্যবহার এবং তারপর এরকম একটা বইয়ের অযাচিত রেফারেন্স। আমার মনে হয় না কোনো ছাত্রীই এত কিছুর পর একান্তে তার মাস্টারমশাই এর সাথে দেখা করতে স্বচ্ছন্দ বোধ করবে। তাই গেলাম না। পরদিন আবার প্রশ্নটা ইমেলে লিখে পাঠালাম যদি বলে দেন এই আশায়। সেখানেও রিপ্লাই করলেন ক্লাসের পর কেবিনে এসে দেখা করতে বলে।

একটুও পছন্দ হল না প্রস্তাবটা। রিপ্লাই করতেও ইচ্ছা করছিল না। যাক গে সেদিনের মিসবিহেভিয়ারের বদলা নেবার সুযোগ হিসাবে ব্যাপারটা মন্দ নয়। আমি আজকাল সচেতনভাবে ওকে উপেক্ষা করি। জানি আমার উপেক্ষাটাই ওকে সবচেয়ে বেশী কাঁটা ফোঁটায়। থার্ড সেমের খাতায় পল ইকো, মার্ক্স দুটো পেপারেই অপর্ণা আমার থেকে দু নম্বর করে বেশী পেয়েছে। অথচ সাত্যকী স্যারের পার্টে, মার্ক্সের খাতায় যে কুড়ি নম্বর ছিল, ওটা ও প্রায় ছেড়ে এসেছে। আর পল ইকোয় একটা চার নম্বরের প্রশ্ন ভুল, গান্ধিজীকে নিয়ে পাঁচ নম্বরের প্রশ্নটা বইটা না পড়ে শুধু নোটভিত্তিক লেখা। তাও কোন যাদুমন্ত্রবলে যথাক্রমে পঁয়ত্রিশ ও সাঁইত্রিশ। পেতেই পারে। কাজল বাবু সবসময় গর্ব করে বলেন, "আমার হাতে একদম নম্বর ওঠে না।" বাক্যটায় সম্ভবত কিছু কথা উহ্য থেকে যায়।

এভাবে ভাবা উচিত নয়। হতেই পারে ও আমাদের অনেকের তুলনায় কয়েকগুণ বেশী মেধাবী। যদিও ও গ্র্যাজুয়েশনে ফার্স্ট ক্লাসও পায়নি। এমনকি আগের দুটো সেমিস্টার মিলেও ফার্স্ট ক্লাস নেই। যাই হোক থার্ড সেম থেকে কাজলবাবুর সংস্পৃষ্ট হয়েই বোধহয় ওর মেধাটা বেড়ে গেছে। সত্য বা দ্বাপর – ত্রেতা যুগে তো এরকম আকছার হত। ও রেজাল্ট বেরোনোর পর থেকে পড়াশোনায় আমার থেকে কত ভাল, আর কেবিএইচ ওর প্রতি কতটা ইমপ্রেসড - এইদুটো কথা নিয়ম করে প্রতিদিন একবার করে জানিয়ে যাচ্ছে।

আমার ক্ষোভটা ঐ বিষয়টা নিয়ে পুরোটা ছিল না। ছিল কম্প্রিহেনসিভ নিয়ে। এম সি কিউ প্রশ্ন। জানা উত্তর। ভুল হবার কোনো জায়গা নেই। পঞ্চাশের মধ্যে ম্যাক্রো ইকোনোমিকসে কাজলবাবুর হাতে থাকা দশ নম্বর সম্ভবত নির্বিচারে কেটে নিয়েছিলেন। ওখানেই আমার টোটালটা মারাত্মকভাবে কমে যায়। অপর্ণা বেশ খুশী ছিল বিষয়টায়। যে ফার্স্ট ক্লাস ও আজ অব্দি তুলতে পারেনি, ওটা কাজলবাবুর 'ইনভিজিবল হ্যান্ড' এর দরাজ আশীর্বাদে বেশ উঠে যাচ্ছিল। ও এতটাই নিশ্চিন্ত ছিল নিজের রেজাল্টের ব্যাপারে, যে ফোর্থ সেমের মার্ক্স ও পল ইকোর বেশীর ভাগ ক্লাস করত না। আমার থেকে নোট নিয়ে নিত। মার্ক্সে ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা বেশী, ওখানে কাজলবাবু সুবিধা করতে পারবেন না। তাছাড়া ফোর্থ সেমে রাজর্ষি স্যারের হাতে কুড়ি নম্বর আছে। কিন্তু পল ইকোয় কে হায়েস্ট পাবে এটা পরীক্ষা হবারও অনেক আগে থেকে নির্ধারিত হয়ে আছে। গতবারের সাথে একটাই ফারাক যে এবার সব কিছু আমি বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু অসহায় ভাবে দেখে যেতে হচ্ছিল। কিছু করার ছিল না। কাজলবাবুকে সরাসরি চার্জ করাও

সম্ভব ছিল না। রিভিউ করতে দিলে নম্বর আরো কমিয়ে দিতে পারে। তাছাড়া ফোর্থ সেমে মার্ক্সিয়ান ইকোনমির পঞ্চাশের মধ্যে তিরিশ আর পলিটিকাল ইকোনমির পঞ্চাশের মধ্যে চল্লিশ ঐ লোকটার হাতে। কাজলবাবু নিয়ন্ত্রণ জিনিসটা নিজের হাতে রাখতে খুব পছন্দ করেন। শম্পা ম্যাডামকে মিথ্যে বলে এপ্রিলের শেষ দু সপ্তাহের আগে ক্লাস ছাড়েননি। আগের সেমে ইন্টারনালের দশ নম্বরের পাঁচ ওঁর হাতে ছিল। বিষ্ণু আর অপর্ণার সাথে কথা বলে উনি পুরো দশ নিজের হাতে রাখেন। বিষয়টা জানতাম না বলে আমি বা বিষ্ণু কেউই আপত্তি করিনি।

আমি লোকটাকে দেখা করব জানিয়ে রিপ্লাই দিলাম চারদিন বাদে। মঙ্গলবার ওঁর ক্লাস ছিল। সেদিন ক্লাসে আরেকবার নিজের উপর নিয়ন্ত্রণ হারালেন ভদ্রলোক। আমার উপর ক্ষেপে গেছেন বুঝতে পারছিলাম। একসময় আমি ফ্যাসিজম নিয়ে একটা প্রশ্ন করায় বোঝাতে গিয়ে সেল্ফ আদারের সম্পর্কে চলে গেলেন। ফ্যাসিজমের ক্ষেত্রে এই আদারিং ব্যাপারটা গুরুত্বপূর্ণ। তারপর সেখান থেকে প্রায় অপ্রাসঙ্গিক ভাবে চলে গেলেন নারী পুরুষের সম্পর্কে। আমি তখন খাতায় নোট নিচ্ছিলাম। ওঁর দিকে দেখিনি। হঠাৎ বললেন, "নারীপুরুষের সম্পর্ক কি একরকম হয় সবসময়? নারীপুরুষের সম্পর্ক তো কতরকম হয়!"

আমি চমকে উঠে ওঁর দিকে তাকালাম। কথাগুলো আবার বেসুরো মনে হচ্ছিল। উনি অপ্রস্তুত মুখে চোখ নামিয়ে ক্লাসের অন্য প্রান্তে চলে গেলেন। আমি একটা কোণার দিকে, এসির ঠিক পাশটায় বসে ছিলাম। সেদিন ক্লাসের পর দেখা করতে বলেছিলেন। আমি ওঁর কেবিনে যেতেই খুব ঠাণ্ডা গলায় একটা মাত্র শব্দ বললেন, "কালকে।"

-"আচ্ছা ঠিক আছে।" বলে আমি চলে এলাম। হয় মালটা প্রশ্নের উত্তর জানে না, নইলে আবার কলির কেষ্টপানা শুরু করেছে। শালা বুড়ো ভাম! পড়াশোনার সময় ন্যাকামো পোষায় না। ধুর শম্পা ম্যাডামের থেকেই ব্যাপারটা জানতে হবে।

লোকটা বুধবার দিন, মানে ঠিক পরের দিনই ক্লাসে এসে কোন কথা না বলে আমার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে ছিল। আমি সেটা বুঝতে পারছিলাম। কিন্তু ওর দিকে তাকাচ্ছিলাম না। ওর নানারকম করা দেখে বেশ মজা লাগছিল। কাজলবাবু একবার গলা খাঁকারি দিয়ে আমাকে বললেন, "এই যে..."

প্রসঙ্গত বলে রাখি কাজলবাবু কখনও আমাকে নাম ধরে ডাকেন না। সবসময় এটাই সম্বোধন করেন, "এই যে"। আমি তাকালাম ওঁর দিকে। উনি খুব গম্ভীর গলায় বললেন, "আমার কিন্তু আজ একদম সময় হবে না। আই'ল বি বিজি। কখন কোথায় থাকব ঠিক নেই। ইউ হ্যাভ টু ফাইন্ড মি।"

আস্তে আস্তে ওঁর মুখের কঠিন ভাব সরে একটা নার্ভাসনেসের ছাপ পড়ছিল, "আজকে মানে ক্লাস আছে? আসতে পারবে না?"

লোকটার অবস্থা দেখে, পাকিস্তানের দিব্যি দিয়ে বলছি আমার মায়া হচ্ছিল। এদিকে নাকটা নীচু করা চলবে না, আর ওদিকে আমাকে একমুহূর্তের জন্য লোকটা মাথা থেকে সরাতে পারছে না। আমি শিওর কাল সারাদিন এবং আজ ঘুম থেকে উঠে এই কথাগুলো বলবে বলে মনে মনে রিহার্স করেছে।

আমি বললাম, "নাহ আজ হবে না। আজ এইচ ও ডির সাথে দেখা করার কথা আছে।"

(কোনও ব্যাপার না বুড়ো, নম্বর তো দেবে না। একটু ছটফট কর বরং। আমার কিচ্ছু নেই, কিন্তু তোমাকে আঘাত করার ক্ষমতা আছে। তোমার মানসিক শান্তি নষ্ট করার ক্ষমতা আছে।)

-"আজকে দেখা করতে হবে? ওহ্।" মলিন মুখে বললেন কাজলবাবু। গলার হতাশাটা চেয়েও লুকোতে পারলেন না।
-"নেক্সট উইক আপনার সাথে কথা বলে নেব। কেমন? আমার আরো কয়েকটা কোয়েশ্চেনস আছে, পাঠিয়ে দেব আপনাকে।"
-"ঠিক আছে।" বলে মুখে আবার গাম্ভীর্য ফিরিয়ে এনে পড়াতে শুরু করলেন কাজল বাবু।

হুম বদমাশ বুড়ো, অপেক্ষা কর। দেখ জ্বলুনির ৫০% কিরকম হয়। আমারও মার্কশিট দেখে এইরকম রাগ হয়েছিল। এই ফোর্থ সেমটা জ্বর, উঠতে পারছি না এরকম পিঠেব্যথা, আক্কেল দাঁতের বীভৎস ব্যথা - ইত্যাদি ইত্যাদি হলেও আমি প্যারাসিটামল খেয়ে ক্লাস করেছি। আর একজন কখনও চুরি হওয়া, কখনও ঘুম থেকে উঠতে না পারা ইত্যাদি খঞ্জ অজুহাতে ক্লাস না করেও হায়েস্ট পেয়ে যাবে। আর আমি ব্যাঙের মত ড্যাবডেবে চোখে সেটা ব্রহ্মজ্ঞানীর মত দেখে যাব। একটু যন্ত্রণা যে তোমারও পাওনা হয় প্রিয় পার্ভার্ট জেঠু। তুমি আমাকে নম্বর দেবে না। আমি তোমাকে দেখা দেব না। উফ নিজেকে কিরকম ছিন্নমস্তা ছিন্নমস্তা লাগছে। লোকটা আমার জন্য সামনের সপ্তাহে অপেক্ষা করবে আর আমি যাব না। কিরকম একটা হাড়মুড়মুড়ে পৈশাচিক উল্লাস হচ্ছে ভাবলেই।

পর্ব ১২

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

সেদিন ফোর্থ সেমের কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষা ছিল। ঐদিন আমার সাথে মার্ক্সিয়ান ইকোনোমিকসের ছেলেমেয়েদের শেষ বারের মত দেখা করতে আসার কথা ছিল। সঙ্গত কারণেই আমি অডিটোরিয়ামে গার্ড নিইনি। কারণ ওখানে তুমি ছিলে। আমি ডাকা সত্ত্বেও সেই মাওবাদী প্রশ্নটা নিয়ে তুমি আমার কাছে আসোনি। এমনকি গ্রুপ ফোটো তোলার দিনেও ক্লাস করে ফোটো সেশনের ঠিক আগের মুহূর্তে কেটে পড়লে। কেন? অনুপস্থিতি দিয়ে আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চেয়েছিলে? নাকি আমার সাথে এক ফ্রেমে থাকতেও ঘেন্না হচ্ছিল তোমার? কারণটা আমার পক্ষে টেলিপ্যাথিতে বোঝা সম্ভব নয়। তোমায় কোনোদিনই পড়তে পারিনি। একেকসময় এই ভ্রমও হয়েছে তোমার চোখ দেখে যে তুমি আমাকে ভালবাস। যাই হোক নিজের উপর আস্থাটা প্রয়োজনাতিরিক্ত বেশী থাকার কারণে আমার প্রথমটাই মনে হয়েছিল। মানে তুমি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাও। এটা ভেবে সেদিন দারুণ একটা কৌতুক অনুভব করেছিলাম মনে মনে। এরপর ঠিক বৃহস্পতিবার, শম্পাদির ক্লাসের পরে তুমি নিশ্চয়ই আমার কেবিনে হাজির হবে। এরকম প্রত্যাশা যদিও ভিত্তিহীন, তাও মানুষ তো আশাকে সম্বল করেই সার্ভাইভ করে।

আমার ঐ তুরীয়ানন্দে ভাঁটা পড়ছিল একটু একটু করে। তুমি আসনি। এমনকি পরে হয়ত প্রশ্নটা তুমি মেল করতে পার এরকম একটা আশা ছিল। সেখানেও নিরাশ হতে হল। পলিটিকাল ইকোনমির পরীক্ষার দিন অপর্ণাকে চটাবার রিস্ক নিয়েও ভীরু প্রেমিকের মত দাঁড়িয়েছিলাম তোমার সামনে। আমার হৃদস্পন্দন সেদিন কৈশোরের প্রথম পূর্বরাগের সামনে দাঁড়ানোর মত অস্বাভাবিক দ্রুত ছিল। তুমি আমার প্রশ্নের একটা দায়সারা উত্তর দিয়ে খাতায় মুখ গুঁজলে। সেদিন পরীক্ষার পর কেবিনে তোমার অপেক্ষা করছিলাম। জানতাম তোমাকে আসতেই হবে, কারণ এখানে হৃদ্যতার টানের প্রশ্ন নেই, টার্ম পেপার জমা দিতে হত। তোমার একটা শাস্তি পাওনা ছিল। আমাকে নিরাশ করার জন্য। শাস্তিটা হল আমার নীরবতা। তুমি হিয়ার সাথে ঢুকলে, কিন্তু শাস্তিটা দেবার আমাকে কোনো সুযোগ দিলে না। এই ধরনের শাস্তির মূল্য বুঝতে গেলে একটা রক্ত মাংসের তৈরী হৃদপিণ্ড থাকতে হয়। সেটা কি তোমার ছিল তৃষ্ণা? কোনদিন? আমাকে একটা নম্বর দেবার যন্ত্র ছাড়া কোনকিছু ভেবেছ কখনও?

হিয়া আমাকে বারবার ডাকা সত্ত্বেও আমি উত্তর দিচ্ছিলাম না। ঘাড় নীচু করে বসে রইলাম। শেষে ওর হাত থেকে টার্ম পেপারের ফাইলটা নিয়ে টেবিলে রাখলাম। ভেবেছিলাম তুমি আগের মত প্রত্যাশা করবে তোমার থেকেও ফাইলটা নিজের হাতে নেব। সেখানেই তোমাকে নিরাশ করব ভেবেছিলাম। কিন্তু তুমি বিষয়টাকে আমলই দিলে না। সব যেন খুব স্বাভাবিক এভাবে টেবিলে ফাইলটা নামিয়ে রেখে চলে গেলে। এমনকি আমার সাথে ফর্মালিটি রক্ষার্থেও একটা কথা খরচ করলে না।

পরদিন আবার গিয়েছিলাম তোমাদের পরীক্ষার হলে। কারও কোনও প্রশ্ন নিয়ে অসুবিধা আছে কিনা জিজ্ঞেস করতে। যেহেতু আগে দেখেছি এই সাইলেন্ট ট্রিটমেন্টটা তোমার উপর ফলপ্রসূ হয়, তাই এদিনও প্রত্যাশা ছিল তুমি আমাকে যে কোনো অজুহাতে ডেকে কিছু একটা ঠিক বলবে। তুমি আমার দিকে ফিরেও তাকালে না। আমি নিজেই প্রথমটা এগিয়েছিলাম কিছু একটা বলার অজুহাতে। পরে সামলে নিলাম। আরও ষোলো জন মার্ক্সিয়ান ইকোনোমিকসের ছাত্রছাত্রী রয়েছে। তারা কি ভাববে? আমার এই অতিরিক্ত আগ্রহ কি দৃষ্টিকটূ লাগবে না? তার চেয়েও বড় ভয় ছিল তোমার কাছে যদি ধরা পড়ে যাই!

কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষার দিন কিশোরী মেয়ের অনিশ্চয়তা নিয়ে আমার কেবিনে অপেক্ষা করছিলাম। মার্ক্সিয়ান ইকোনোমিকসের ছাত্রছাত্রীরা আমার সাথে দেখা করতে এসেছিল। তুমি আসনি। এইদিন কিন্তু ফটো সেশনের দিনের মত আনন্দিত হতে পারিনি। উদ্বেগ বাড়ছিল। আমাদের পথ আলাদা হবার দিন এগিয়ে আসছে। যদি আর কোনোদিনও তোমাকে দেখার সুযোগ না পাই। একবার, মাত্র একবার। শেষবারের মত!

আমি আমার মধ্যের সমস্ত মিষ্টত্ব ঢেলে ওদের বিদায় জানিয়েছিলাম। তুমি নিশ্চয়ই খোঁজ নেবে এদিনের ব্যাপারে। তোমার কাছে এই বার্তাটা পৌঁছে দেওয়া খুব দরকার ছিল যে তোমার অনুপস্থিতি আমার মধ্যে বিন্দুমাত্র প্রভাব ফেলতে পারেনি। আমাকে আঘাত করার ক্ষমতা তোমার নেই।

গ্রুপ প্রোজেক্টের মিটিং এর জন্য এর হপ্তাখানেক পর তোমাদের গ্রুপটাকে দেখেছিলাম। সব্যসাচীবাবুর কেবিনে। সব্যসাচীবাবুর পাশের চেয়ার, একটা কালো পোশাক, লালচে পশমি খোলা চুল। চেয়ারের হাতলে উজ্জ্বল গমরঙা

মসৃণ হাতের আভাস। মুখ দেখা যাচ্ছিল না। তাও আমার চিনতে দেরী হয়নি। ঐ চেহারার অণুপরমাণু আমার রক্তবিন্দুর চেয়েও বেশী চেনা। একবার এদিকে তাকাবে না তৃষ্ণা?

ওহ ভগবান আর কোনোদিন তোমায় দেখতে পাব না আমি। দুদিন আমার সামনে, হয়ত বাধ্য হয়েই সেই অমোঘ স্তোত্রটা উচ্চারণ করেছিলে তুমি। এত সহজে ভুলে গেলে সব? "যদিদং হৃদয়ং তব, ততস্তু হৃদয়ং মম। যদিদং হৃদয়ং মম, ততস্তু হৃদয়ং তব।" অস্বস্তি আর লজ্জায় গোলাপি হওয়া মুখে আমাকে বাংলা অনুবাদটাও বলতে বাধ্য হয়েছিলে, কম্পিত চোখের পাতা তুলে, "যা তোমার হৃদয়, তাই আমার হৃদয়। যা আমার হৃদয় তাই তোমার হৃদয়।" জানো তৃষ্ণা, আজ পর্যন্ত অজস্র মেয়ে ও মহিলার বিছানা গরম করলেও কোনো নারী আমার জন্য এই মন্ত্রটা উচ্চারণ করেনি। এমনকি শর্মিষ্ঠাও না। যেহেতু আমাকে লোকসমাজে নাস্তিক সাজতে হয় তাই আমাদের বিয়েটা মন্ত্র পড়ে হয়নি। তোমার জীবনেও তো কোনো পুরুষের সাথে কখনও এই মন্ত্রটা বলার সুযোগ হয়নি। আমি জানি তুমি শুয়ে বেড়ানোর মেয়ে নও। ঐ উচ্চারিত মন্ত্রের লয়ালটি থেকেই না হয় একবার ফিরে তাকাও। নইলে আমরা তো সমান্তরাল রেখা হয়েই আছি। ঘৃণা বা বড়জোর নিস্পৃহতা ছাড়া কিচ্ছু থাকার ছিল না আমাদের মধ্যে। শুধু একবার, শেষবারের মত তোমার মুখটা দেখতে চাই। অপর্ণা আমাকে প্রতিদিন রিপোর্ট করে তুমি একজন মানুষ হিসাবেও কতটা নিকৃষ্ট। ওকে একটাও নোট দিচ্ছ না। আমার ব্যাপারে অসংখ্য অশ্রদ্ধাপূর্ণ মন্তব্য কর অপর্ণার কাছে। আমি জানি তোমার মত নিম্নস্তরের মানুষের পক্ষে এটা সম্ভব। এর উত্তরও তোমায় দেব। অপর্ণা মিথ্যে বলতে পারে, তবে কথাগুলো সত্যি না হবারও কোনো কারণ নেই। আগের দিন তুমি ইচ্ছাকৃত ভাবে পা এগিয়ে দিয়ে আমাকে ফেলে দেবার চেষ্টা করেছিলে। অনেকদিন ধরে অধ্যাপনা করছি, মাথার চুলগুলো রোদে পাকেনি, এগুলো বুঝতে পারি। তাও ঘৃণা ঘৃণার জায়গায়, একটা কোথাও তো অন্তত ঐ স্তোত্রটা তোমায় বেঁধে রেখেছে, ওটার নামেই একবার ফিরে তাকাও। শেষ পর্যন্ত আমি দরজায় তোমার দৃষ্টি টানার জন্য খুব জোর দড়াম করে লাথি মারলাম তাও তুমি তাকালে না। যেন জেদ করেই সামনে ফিরে বসে রইলে। অথচ শব্দটা এত জোরে হয়েছিল যে সব্যসাচীবাবু ও তোমার গ্রুপের অন্য ছেলেমেয়েরা পর্যন্ত ফিরে তাকিয়েছিল আমার দিকে। আর কত হাস্যস্পদ করব নিজেকে তোমার জন্য? তোমার মত একটা হৃদয়হীন অনুভূতিবিহীন নার্সিসিস্ট মরীচিকার জন্য?

আমি ক্রমশই ডেসপ্যারেট হয়ে উঠছিলাম। প্রেজেন্টেশনের দিন তোমাদের ঠিক পরের স্লটটা বাছলাম। ঐ একটাই সুযোগ অবশিষ্ট ছিল। তারপর হাজার শতক কালাহারি পার হয়ে মরুদ্যান, তোমাকে দেখতে পেলাম। তোমার শরীরের রঙের সাথে প্রায় মিশে যাওয়া মাখন মাখন একটা সালোয়ার কামিজ, আর নববধূর মত লাল তোমার ওড়না। তোমাকে ক্লান্ত দেখাচ্ছিল। নরম শরীর, চট করে ক্লান্তির ছাপ পড়ে যায়। আমি তোমার ঐ মুখটা ঘরভর্তি লোকের মধ্যেও কল্পনা করছিলাম রতিক্লান্ত হয়ে আমার বুকে পড়ে আছে। ওহ ভগবান এসব কি ভাবছি, আমি তোমার প্রেমে পড়তে চাই না।

সেদিন যেন ইচ্ছাকৃতভাবেই তুমি আমার দিকে তাকাচ্ছিলে না। সবার চোখ যখন প্রোজেক্টরের দিকে তখন আমি তোমার দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য ঘরের পিছনে, যেখানে ছাত্রছাত্রী বা কোলিগরা আমাকে দেখলে চরম অপ্রস্তুত হতে হবে জেনেও আমি এত বড় রিস্কটা নিয়েছিলাম। তুমি যাতে একবার তাকাও তার জন্য দেওয়ালে টিকটিকির মত

শরীর লাগিয়ে হাত পা নাড়াচ্ছিলাম। তুমি আমার দিকে তাকালে না। তোমার বেরিয়ে যাবার সময় তোমার পথে একবার চলে এলাম, তুমি থেমে গেলেও আমাকে দেখলে না। অগত্যা আমাকে নিজের জায়গায় আবার ফিরে যেতে হল। তুমি নিস্পৃহভাবে চলে গেলে।

আমি কিন্তু হাল ছাড়ার লোক নই। পরেরদিন আমার লেখা একটা আর্টিকেল মেল করেছিলাম পল ইকোর মেল আইডিতে। জানতাম ওটা তুমি অপারেট কর। যদিও সাবধানতা রক্ষার্থে ঐ মেলটা আরও অনেকগুলো অ্যাড্রেসে পাঠিয়েছিলাম। আমাকে তোমার ক্ষেত্রে প্রতিমুহূর্তে সাবধানতা অবলম্বন করতে হত। যাতে তুমি ছাড়া কেউ না বোঝে আমি কত বড় শুওরের বাচ্চা। যাতে তুমি কোনদিন কাউকে কনভিন্স করতে সক্ষম না হও যে ডঃ কাজল ভট্টাচার্য প্রকৃতপক্ষেই একটা শুওরের বাচ্চা। যাই হোক যথারীতি ঐ মেলটারও কোনো উত্তর পেলাম না। তোমার জন্য খুব ভয়ঙ্কর একটা শাস্তির পরিকল্পনা করছিলাম। স্বঘোষিত মার্ক্সবাদী আমি, প্রতিদিন ভগবানের কাছে প্রার্থনা করছিলাম তোমার তরফ থেকে একটা কিছু প্রতিক্রিয়ার।

এরকম একটা দিনেই তোমার সেই মেলটা আমার কাছে এসেছিল। এস ও পি দেখে দেবার অনুরোধ করে। আমার আহত পৌরুষের মলম হয়ে। আমার কাছে ওটাই তোমার সমর্পণ ছিল। নাহ আর হয়ত তোমাকে প্রয়োজন হবে না। কেন অত বিনীত ভাষায় মেলটা লিখেছিলে তৃষ্ণা? আমি বিহ্বল হয়ে গেলেও আগের মত অসংযমের পরিচয় দিইনি। তোমার তরফে কতটা তৃষ্ণা আছে পরীক্ষা করছিলাম। মেলটার কোনো উত্তর দিইনি। ঘণ্টাখানেক বাদে আবার তোমার একটা মেল এসেছিল যাতে তুমি লিখেছিলে তুমি শম্পাদির আন্ডারে রিসার্চ করতে চাও, তাই এম ফিলের নিয়মের ব্যাপারটা জানতে চেয়ে। এম ফিল বানানটা ভুল ছিল, দুটো এল। টাইপের ভুল অথবা তোমার অজ্ঞতা। আমি সারারাত সেদিন ঘুমোতে পারিনি। এতদিনে একটা সুযোগ পেয়েছি। তোমার এস ও পি আমি দেখে দেব না। আমি এমন কোনো সুবিধা তোমায় দেব না যা অপর্ণা পাচ্ছে না। অপর্ণা অবশ্য আমাকে এস ও পি নিয়ে কোনো অনুরোধই করেনি, তাও তোমার একটা কথা জেনে রাখা দরকার যে অপর্ণা আমার প্রায়োরিটি তালিকায় সবসময় তোমার আগে আসবে।

তোমার অত মধুমিশ্রিত শব্দচয়নের কারণটা অনুমান করতে পারছিলাম। পরীক্ষার খাতাটা যাতে আগের সেমের মত নির্মম হাতে না দেখি। আর এস ও পি টাও দেখিয়ে নেওয়া যাবে। আমি তোমার চোখে তো একজন পরীক্ষক আর শিক্ষকের বেশী কিছুই নই। তাই যে কর্তব্যটা তুমি বিনয়ের অবতার সেজে আশা করছ সেটাও আমি পালন করব না। তবে কি জান তো তৃষ্ণা, তুমি একবার সবটুকু সমর্পণ করে ডাকলে হয়ত সব ভাসিয়ে দিয়ে চলে...... ধুর কিসব অকিঞ্চিৎকর চিন্তা করছি। তোমাকে একটা লেবুর মত নিংড়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়া উচিত। আমি যেহেতু তোমাকে আরও অনেক বেশী হেনস্থা করার সুযোগ হাতে রাখতে রাখতে চাই, তাই মেলটার উত্তর দেওয়াই শ্রেয় মনে করলাম। সত্যি বলতে তর সইছিল না। খুব সকাল সকাল উঠেই তোমার মেলটার উত্তর দিলাম। আমিও তোমার মত আবেগ বোমা ফাটালাম যাতে ভবিষ্যতেও তুমি ধ্বংস হতে আমার কাছে ফেরো। যদিও তোমার এস ও পিটা শহরের বাইরে থাকার খঞ্জ অজুহাতে দেখে দিলাম না। বললাম বাড়ী ফিরলে এম ফিলের নিয়মটা তোমায় জানাতে পারব, যাতে তুমি পরে আবার আমাকে মেল কর।

"প্রিয় তৃষ্ণা"

হ্যাঁ ইচ্ছাকৃত ভাবে এই সম্বোধনটাই লিখেছিলাম। একমাত্র বিশেষ উদ্দেশ্য না থাকলে ছাত্রছাত্রীদের জন্য আমি 'প্রিয়' শব্দটা ব্যবহার করি না। কিন্তু ঈশ্বর জানেন তোমায় কত শতাব্দী ধরে এটা সম্বোধন করতে চেয়েছি। প্রিয়, প্রিয়া, প্রিয়তমা।

পর্ব ১৩

তৃষ্ণার কথা

অপর্ণার বাড়ী ছিল দক্ষিণ কলকাতায়। ফোর্থ সেমিস্টারটা অপর্ণা পরিশ্রম করে এত দূরে ক্লাস করতে আসাটাই প্রায় বন্ধ করে দিয়েছিল। কি দরকার! যখন জানাই আছে পল ইকোয় হায়েস্ট নম্বরটা বাঁধা। সময়মত কোয়েশ্চেন পেপারও হাতে এসে যাবে। আর আমি, সব জেনেও ওকে প্রত্যেক ক্লাসের নোট যোগান দিয়ে গেছি। সন্দেহ নেই আমার এই বোকামিগুলো দীর্ঘদিন কুত্তাঞ্জন আর অপর্ণাকে হাসির রসদ যুগিয়েছে। হয়ত আমার নির্বুদ্ধিতা আজ ওদের কাছে একটা প্রবাদে পরিণত। মাঝে মাঝে খুব ইচ্ছা করে কুত্তাঞ্জনকে একটা ইমেল পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করি, "আচ্ছা মাস্টারমশাই, আপনার নিজের মেয়েটা যদি কারোর হাস্যরসের উপাদান হয়? এইভাবে?"

প্রশ্নটা অর্থহীন। নিজের মেয়ে আর অন্যের মেয়ে এক নয়। কুত্তাঞ্জন স্ট্যালিনকে মার্ক্সবাদী বলে স্বীকার করত না। গুলাগ, হলোডোমোর ইত্যাদি রটনা বা ঘটনা সত্ত্বেও ঐ লোকটাকে আমি শ্রদ্ধা করি। স্ট্যালিন নিজের ছেলেকে কনসেন্ট্রেশন ক্যাম্পে মরার জন্য ছেড়ে দিয়েছিলেন। সুযোগ পেয়েও একজন যুদ্ধবন্দীর বিনিময়ে তার মুক্তিপণ মেটাননি। তাঁর যুক্তি ছিল "আমার দেশের আর যে হাজার হাজার ছেলে যুদ্ধবন্দী হয়ে রয়েছে তারাও তো আমারই ছেলে। নিজেরটাকে ছাড়িয়ে নিলে তাদের মায়ের কাছে কি কৈফিয়ত দেব?"

আর কে না জানে ধ্বনিকে প্রতিধ্বনি ব্যঙ্গ করে!

একটা জায়গায় ওদের কাছে অ্যাডাপটিভ ইনফর্মেশন ছিল। মানে ইনফর্মেশনটা পুরোপুরি আপডেটেড ছিল না। কি ঘটছে সেটা আমি জানতাম, তাও অপর্ণাকে নোট দিতে কোনদিন আপত্তি করিনি। শেষের দিকে ও এতটাই গা ছাড়া হয়ে গেছিল যে কয়েকটা ক্লাসের ডেট পর্যন্ত মনে ছিল না। কুত্তাঞ্জন ওর জন্য প্রতিটা ক্লাসের ডেট আমার আর বিষ্ণুর কাছে চেয়েছিল। অবশ্য তখন জানতাম না অপর্ণার জন্য চাইছে। শুধু কুত্তাঞ্জনকে ডিফাই করব বলেই দিইনি। পরীক্ষার মাত্র কয়েকদিন আগে বিষ্ণু কুত্তাঞ্জনকে ডেটগুলো পাঠায়। তার পরপরই অপর্ণা আমার কাছে ডেটগুলো পাঠিয়ে সেই দিনের নোট চায়। তখন আর ওর জন্য খুঁজে দেখার মত ধৈর্য অবশিষ্ট ছিল না। এতদিনেও কি আমি অপর্ণার মন জয় করতে পেরেছি? এত কিছু করেও? অনেকের মনে প্রশ্ন আসতে পারে আমি সব জেনেও কেন ওকে নোটের যোগান দিচ্ছিলাম?

দিচ্ছিলাম আদর্শগত কারণে। দুটো মেয়ের মধ্যে বিভেদ তৈরী করার যে চিরাচরিত পুরুষতান্ত্রিক নোংরামিটা কাজল ভট্টাচার্য করছিল তার বিরুদ্ধে এটা আমার বিপ্লব ছিল। যদি অপর্ণা নিজের ভুল বোঝে। যদি বোঝে আমি ওর প্রতিদ্বন্দ্বী নই, কমরেড।

কিন্তু সেটা হয়নি। তবে আমি আমার ভুল বুঝতে পেরেছি। কমরেডশিপ আজকের আত্মরতির যুগে মূল্যহীন। বিপ্লবের মূল্যবোধ সত্তরের দশকের সাথে ইতিহাসে প্রবেশ করেছে। শুধু আমি, আজও সত্তরের দশক আঁকড়ে অ্যানা ফ্র্যাঙ্কের বিশ্বাস ধরে বসে আছি। যে বিশ্বাস বলে মানুষ আসলে খারাপ নয়। অপর্ণা আমাকে নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ছাড়া কিছুই মনে করেনি। আমার আর্থিক অবস্থা থেকে শুরু করে যে কোনো বিষয়ে আমাকে প্রতি পদক্ষেপে হেয় করেছে। সেটাকেও আমি সহানুভূতির চোখে দেখতাম। কারণ জানতাম ঐ মানুষের চেহারার দৈত্যটাকে ও ভালবাসে। আমি এখানে নিমিত্তমাত্র, যে বিষয়টা ওকে দগ্ধ করত তা হল ডঃ ভট্টাচার্যের আমার প্রতি অযাচিত মনোযোগ।

নার্সিসিস্টদের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে আপনি এদের সাথে যে সম্পর্কেই যুক্ত থাকুন, এরা আপনার মধ্যে নার্সিসিস্টিক সাপ্লাই খুঁজবে। মানে এদের কোনোকিছু বলেই কোনো লাভ নেই। এমনকি তাদের পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডার সম্পর্কে সচেতন করে দিয়েও না। রেকর্ডিং বা নকল করায় এদের দক্ষতা নব্বইয়ের দশকের দামী টেপ রেকর্ডারের মত। কাজলবাবু মুখে মাঝে মাঝেই বলতেন বটে তাঁর ভুলে যাওয়ার একটা প্রবণতা আছে, কিন্তু আমি নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি আমি কবে কি বলেছি এই কথাগুলোও ভদ্রলোক(!) পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে মাথায় রাখতেন। তারপর কবে কে ক্লাসে এল বা এল না -এই বিষয়গুলোও। এই বিষয়গুলোয় নিস্পৃহতা দেখানো ওঁর একটা অভিনয় ছিল। অনেকেই (বিশেষত ফেমিনিন জেন্ডারের কেউ) নিজের প্রতি ওঁর মনোযোগ দেখে খুশী হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু সত্যি কথা হচ্ছে ওঁর নিস্পৃহতা বা মনোযোগ, শীতলতা বা উষ্ণতা – সবটাই অভিনয়।

নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিজঅর্ডারে আক্রান্ত মানুষরা প্রতি মুহূর্তে নিজের প্রত্যেকটা কথা, অভিব্যক্তি, মুখের ভাব, দেহের ভাষা- সব কিছু রিহার্স করে এবং সেটা পারফেকশনের পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার বিষয়ে সচেতন থাকে। এদের মানসিক গঠন এমন হয় যে এরা কোনরকম ইমোশন উপলব্ধি করতে অক্ষম হয়। সেটা এদের মানসিক সুস্থতার পক্ষেও খারাপ কারণ আমরা মানুষরা পৃথিবীতে অন্তত একটা জায়গায় নিজেকে মানসিক ভাবে উন্মুক্ত করতে চাই, আশ্রয় খুঁজি। সেই আশ্রয়স্থল বাবা মা, স্পাউস, সন্তান, বন্ধু, প্রেমিক-প্রেমিকা-যে কেউ হতে পারে। এরা নিজেদের চারিত্রিক গঠনের কারণেই ইমোশনালি ডিপ্রাইভড থেকে যায়। কারণ নিজেকে উন্মুক্ত করা বা মানসিক বন্ধন তৈরী করা এদের চোখে ঘৃণিত দুর্বলতার সামিল। ফলে এরা ফিলোফোবিক হয়। এরা পৃথিবীর কোনো প্রান্তেই শান্তি খুঁজে পায় না। কারণ প্রথমত, এরা নিজেকে নিয়ে তৃপ্ত হতে পারে না, প্রতি মুহূর্তে সামনের লোকটার থেকে অ্যাপ্রুভালের প্রয়োজন হয়। সেটা সবসময় নাও পাওয়া যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, এরা আবেগের অভিনয় জানলেও আবেগকে উপলব্ধি করতে পারে না। এরা এদের নার্সিসিস্টিক সাপ্লাই এর উৎসকে খুব মনোযোগ সহকারে স্টাডি করে। ঠিক কোন আচরণ, কোন অভিব্যক্তি বা কোন শব্দটা ব্যবহার করলে সামনের লোকটার থেকে এমপ্যাথিক প্রতিক্রিয়া পাওয়া যাবে, তাকে প্রভাবিত করা সম্ভব হবে, সেটা বুঝে নিয়ে এরা সেই মত আচরণ করে(যেমন, আমার অভিজ্ঞতায়

বলতে পারি, আমি বাংলা শব্দচয়ন ইংরাজীর তুলনায় বেশী পছন্দ করতাম বা নকশাল আন্দোলনের প্রতি দুর্বলতা ছিল লক্ষ করে উনি ক্লাসে মাঝে মাঝে অপ্রাসঙ্গিক ভাবে নকশালবাড়ী বা মাও এর প্রসঙ্গ টেনে আনতেন বা বাংলায় তেমন স্বচ্ছন্দ না হয়েও আমার সাথে কথা বলার সময় বেশী বেশী বাংলা শব্দ ব্যবহার করতেন)। এটা খারাপ, ভাল দুরকম আচরণের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য।

একটা কথা ভাবলে খারাপ লাগে, আমি নিজেও শেষ মুহূর্তে নির্লিপ্ত থাকতে পারিনি। রেজাল্ট আউট হবার পর সারা সেমিস্টার ক্লাস না করেও যখন দেখি অপর্ণা পঞ্চাশে ৪১ পেয়েছে, আর আমার নম্বর অস্বাভাবিক ভাবে কমে ৩৯,আমি একটা পুরোনো অভিজ্ঞতার শোধ তুলতে চেয়েছিলাম। থার্ড সেমিস্টারের পরে আমাকে নম্বর নিয়ে বিদ্রূপ করার ঘটনাটার। আমি ওকে বলেছিলাম আমি ৪৩ পেয়েছি। ভীষণ শকড হয়েছিল। পরে ওর হাতে নির্ঘাৎ কাজলবাবু দু চারটে থাবড়া খেয়ে গেছে। তারপর হয়ত ধীরে ধীরে ওকে কনভিন্স করতে সক্ষম হয়েছে যে তৃষ্ণা সত্যি বলেনি।

পর্ব ১৪

কাজল ভট্টাচার্যের কথা

"কোনো প্রাপ্তিই পূর্ণ প্রাপ্তি নয়
কোনো প্রাপ্তিই দেয় না পূর্ণ তৃপ্তি
সব প্রাপ্তি ও তৃপ্তি লালন করে
গোপনে গহীনে তৃষ্ণা তৃষ্ণা তৃষ্ণা।
আমার তো ছিলো কিছু না কিছু যে প্রাপ্য
আমার তো ছিলো কাম্য স্বল্প তৃপ্তি
অথচ এ পোড়া কপালের ক্যানভাসে
আজন্ম শুধু শুন্য শুন্য শুন্য।
তবে বেঁচে আছি একা নিদারুণ সুখে
অনাবিষ্কৃত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বুকে
অবর্ণনীয় শুশ্রূষাহীন কষ্টে
যায় যায় দিন ক্লান্ত ক্লান্ত ক্লান্ত।"

ইদানীং আমার কেমন যেন মনে হয় আমরা নরকের পঙ্কিলতম স্তরে ডুবে থাকা দুটো প্রেতাত্মা। আমি আর অপর্ণা। হাবিয়া দোজখের সম্রাজ্ঞী অপর্ণা। আর আমি ওর পদানত দাসানুদাস। এই দুনিয়ায় তৃষ্ণা নামের কোনো দেবীর অস্তিত্ব নেই। শুধু ধূমকেতুর মত আমার স্মৃতিতে বা স্বপ্নে ওর একটা গোলাপি কুয়াশা হয়ে জেগে ওঠা ছাড়া। একটা প্রশ্ন এত মাস পরেও আমাকে হন্ট করে। আমি কি ওকে কয়েক মুহূর্তের জন্য হলেও ভালবেসেছিলাম?

উত্তরটা হচ্ছে 'না'। উত্তরটা যে নঞর্থক,সেটা প্রমাণ করার দায় আমার শুধু অপর্ণার কাছে নয়, নিজের কাছেও ছিল। আমি তৃষ্ণাকে ভালবাসিনা, কোনদিন বাসতামও না। ভালবাসলে কেউ কারোর ক্ষতি করতে পারে না। আমি ওর ক্ষতি করেছি। ওদের থার্ড সেমে কম্প্রিহেনসিভের পেপারে আমার হাতে থাকা ম্যাক্রোইকোনোমিকসের পার্টে পুরো দশ নম্বর কেটে নিয়েছিলাম। মার্ক্স আর পলিটিকাল ইকোনোমির খাতাও যতটা সম্ভব চেপে দেখেছি। কিন্তু থার্ড সেমের সময়ই আমি বুঝেছিলাম অপর্ণার বিদ্যাবুদ্ধির যা দৌড়, শম্পাদির হাতে কুড়ি নম্বরও ছাড়লে ও তাতে শূন্য পাবে। গ্র্যাজুয়েশনে ইকোনোমিকসের মত সাবজেক্টে ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট পাওয়া মেয়েকে আর যাই হোক পলিটিকাল ইকোনমিতে এইট্টি পার্সেন্ট পাওয়ানো যায় না। তাই শম্পাদিকে মিথ্যে বলে আমি এপ্রিলের শেষের আগে ক্লাস ছাড়িনি।

ফোর্থ সেমে কি মার্ক্স, কি পলিটিকাল ইকোনমি-তৃষ্ণার খাতায় একটা দাগ দেবারও জায়গা ছিল না। তৃষ্ণা দারুণ কিছু ছাত্রী নয়, তাও একটা ফার্স্ট ক্লাস পাওয়া মেয়ে।তবে ও মেনস্ট্রিম ইকোনোমিকসে খুব ভাল না হলেও মার্ক্সবাদে ওর জ্ঞানের গভীরতা আছে। ওর পড়াশোনার অভ্যাস আছে। এবং ও এমন অনেক বিষয় বিশদে জানে যা সবসময় আমারও জানা থাকে না।

রাজর্ষির হাতে মার্ক্সের পেপারে কুড়ি নম্বর ছিল। আমি আগেই জানতাম অপর্ণা ওখানটা ঝোলাবে। আমার পার্টে থাকা তিরিশ, পেপারে কুড়ি আর ইন্টারনালে দশ। খাতা ঠিকমত চেক না করেই ওকে প্রায় ফুলমার্ক্স বসিয়ে দিলাম। তৃষ্ণার খাতায় যতটা সম্ভব চাপতে হল। বেশ অন্যায্য ভাবে কিছু জায়গা কাটাকুটি করলাম। কারণ আমি জানি ও রাজর্ষির পার্টে নিশ্চয়ই ভাল নম্বর তুলবে। ও কোনোভাবে চল্লিশের উপর পেয়ে গেলে অপর্ণা আমাকে ছাড়ত না। আমার এত চেষ্টা সত্ত্বেও অপর্ণা মাত্র একতিরিশ পেল মার্ক্সের পেপারে। তৃষ্ণা ওর থেকে অনেকটা বেশী পাওয়ায় আমাকে অপর্ণার কাছে বেশ কিছু অশ্লীল কথা শুনতে হয়েছে। ওর বক্তব্য আমি আমার পার্টে আরও কেন কমিয়ে দিলাম না। অপর্ণা যেটা বোঝে না সেটা হল তৃষ্ণা আর টি আই এ খাতা দেখতে চাইলে আমি ঝামেলায় পড়ে যাব। আমাকে এমন সূক্ষ্মভাবে কাজটা করতে হবে যাতে তৃষ্ণা সব বুঝেও আমার বিরুদ্ধে কোনো আইনি পদক্ষেপে না যেতে পারে। তৃষ্ণার সাথে সরাসরি শত্রুতায় আমি যেতে চাই নি। সেটা শুধু আমার নিজের দুর্বলতার কারণে নয়। কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে পড়তে পারে। আমি যে পলিটিকাল ইকোনমির কোয়েশ্চেন পেপার পরীক্ষার আগেই অপর্ণাকে দিয়ে দিয়েছিলাম এটা জানাজানি হলে আমার চাকরি চলে যাবে। যদিও তারপরও অপর্ণা খাতায় বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি।

কোনো খাতা ইভ্যালুয়েট করার সময় যদি ছাত্রছাত্রীদের মুখ চেনা থাকে, তাহলে পারফর্মেন্স ছাড়াও অনেকগুলো বিষয় মাথায় রাখতে হয়। যেমন কেউ যাতে আমাকে বায়াসড না ভাবে। বিশেষ করে আমি যেখানে নিজে জানি আমি কতটা চরম মাত্রায় বায়াসড। যেমন গত বছর সায়ন্তনী মার্ক্সের পেপারে হায়েস্ট পেয়েছিল। তাই এবছর ও যাতে হায়েস্ট না পায় সেদিকে দৃষ্টি রাখা। তাছাড়া ও হায়েস্ট পেলে অপর্ণা আমাকে মেরে ফেলত। আরেকটা জিনিস হচ্ছে পলিটিকাল ইকোনোমির ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা মাত্র তিনজন। ওদের সাথে সপ্তাহে মার্ক্স আর পল ইকোর ক্লাস

মিলিয়ে আমার চারদিন দেখা হচ্ছে। তাই কেউ যাতে না ভাবে আমি ওদের বেশী ঘনিষ্ঠ, তাই ওদের মার্কের খাতার নম্বরটা চেপে দেওয়া। অপর্ণাকে পল ইকোয় হায়েস্ট পেয়েই তাই খুশী থাকতে হচ্ছে। আসলে ওরও তো কয়েকটা বাধ্যতা আছে। শি কান্ট এফোর্ড টু লুজ মি। ওর মত একটা ব্রেনলেস ক্রিচারের অ্যাকাডেমিয়ায় আমি না থাকলে কোনো ভবিষ্যৎ নেই। আরেকটা বিষয়, যা ওতোপ্রোতভাবে ওকে আমার সাথে জড়িয়ে রেখেছে তা হল আমাদের একই জাতীয় যৌন পছন্দ। যেটা স্বাভাবিক মানুষরা অনেকেই বিকৃত বলে ভাববে। এমনকি আঁতকে উঠবে।

আমরা দুজনেই স্ক্যাটোফাইল। মানুষের যে রেচন বা বর্জ্য পদার্থ দেখলে সাধারণত লোকে নাক সিঁটকায় সেগুলো আমরা দুজনেই পছন্দ করি। আমার ডার্কেস্ট ফ্যান্টাসিগুলো একমাত্র ওর কাছে আমি ডিসক্লোজ করতে পারি। ব্রথেলগুলোতে আমার স্ট্যান্ডার্ডের মেয়ে পাওয়া কঠিন, পাওয়া গেলেও তাদের এক রাতের রেট দেড় থেকে দু লাখের কম হয় না। অবশ্য আমার এটুকু খরচ করার মত সঙ্গতি আছে, তবে নিয়মিত না হলেই ভাল। আমি একটা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ও একটা নেপালী মেয়ের কাছে গেছি। প্রচুর খরচা করেই গেছি। কিন্তু ওরা আমার প্রয়োজনগুলো পূর্ণ করতে চায়নি। ওগুলোর জন্য আমাকে যে স্তরের মেয়েদের কাছে যেতে হবে, সেটা আবার আমার রুচিতে পোষাবে না। তাই অপর্ণা। সর্বোপরি, তৃষ্ণাকে নিয়ন্ত্রণের আমার হাতের সব চেয়ে বড় অস্ত্র ছিল অপর্ণা। একটা ট্রায়াঙ্গেল তৈরী রাখা, তৃষ্ণাকে সবসময় একটা অনিশ্চয়তার মধ্যে রাখা ওর প্রতি আমার যা কিছু সেই বিষয়ে-যাতে প্রতি মুহূর্তে আমার মনোযোগের জন্য তৃষ্ণাকে আরেকজনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নিয়োজিত থাকতে হয়। ওটাই যে কোনো সম্পর্কে নিয়ন্ত্রণের রাশ। যে কোনো নারীকে, কিছুদিনের জন্য হলেও দারুণ ফলপ্রসূভাবে ওটা দিয়ে নিয়ন্ত্রণ করা যায়। যদিও তৃষ্ণার ক্ষেত্রে এই বিষয়টার প্রয়োগ আমাদের মধ্যে দিনের পর দিন ক্রমশ দূরত্ব বাড়িয়েছে। তৃষ্ণা ঐ ত্রিভুজটাকেই প্রত্যাখ্যান করেছে। একটা কটূ শব্দ, একফোঁটা স্যাভেজারি এড়িয়েও কিভাবে বিদ্রোহ করা যায়, তার জ্বলন্ত দলিল আমার মুখের উপর ছুঁড়ে দিয়ে নিস্পৃহভাবে বিপ্রতীপে হেঁটে চলে গেছে তৃষ্ণা।

এই ডিবচারিগুলো আমাকে শর্মিষ্ঠার থেকে লুকিয়ে করতে হয়। তাও কয়েকবার ধরা পড়ে গেছি। যদি কখনও ও সত্যিই ফেড আপ হয়ে আমাকে ডিভোর্স দিয়ে দেয় তাহলে আমি অপর্ণাকে বিয়ে করতে পারি। কিন্তু তাতে সমস্যা আছে। শুধু যৌন প্রয়োজনে বিয়েটা আমার মত লোকের পক্ষে হেলদি নয়। শর্মিষ্ঠার আত্মসমর্পণ, বিশ্বস্ততা, ভালবাসা বা আণুগত্যের ছিঁটেফোঁটাও কি আমি অপর্ণার কাছে পাব! অবশ্য আমার মত নোংরা লোকের কাছে ওসবের মূল্য খুব বেশী নয়, তাও একটা জায়গায় দরকার আছে। অপর্ণা যা প্রতিহিংসাপরায়ণ মেয়ে, কোনো কারণে আমার উপর অফেন্ডেড হলে ৪৯৮ ঠুকে আমাকে জেল খাটিয়ে দিতে পারে। শর্মিষ্ঠা শুধু ভালবাসে বলেই আমার মত একটা সাক্ষাৎ বরাহনন্দনকে এতবছর সহ্য করছে। কিন্তু আমি আমার পছন্দগুলো শর্মিষ্ঠা বা আমার অন্যান্য যৌনসঙ্গীদের বলতে পারব না। তাতে প্রথমে জুতো খাবার ও পরে সমাজে দানব হিসাবে পরিচিতি লাভের সম্ভাবনা আছে। আমি যে কোনো চিরাচরিত মধ্যবিত্ত মানসিকতার বাঙালী আঁতেলের মতই নিজের ইমেজ সম্পর্কে সচেতন। আমার চরিত্র যেমনই হোক ইমেজে একটুও কালি লাগাতে আমি পছন্দ করি না। সত্যি কথা বলতে অতটা দম নেই। ক্লাসে বা ফেসবুকে বিপ্লবী সাজা যায়, সমাজে থাকতে গেলে তো সমাজের নর্মস মেনেই চলতে হবে রে বাবা। তাতে কেউ আমাকে ভণ্ড ভাবলে আমার কিচ্ছু যায় আসে না। সারাজীবনে অনেক বড় বড় আগুনখেকো বিপ্লবী তো দেখলাম। ভিতর থেকে প্রত্যেকটা লোক তিনপেয়ে। এবং শুওরের বাচ্চা।

পর্ব ১৫

তৃষ্ণার কথা

সময় তখন বিয়াসের স্রোতের গতিতে এগোচ্ছিল। পরপর অনেকগুলো ঘটনা, বাইরের কারো কাছে হয়ত আপাতদৃশ্যে কিছুই উল্লেখযোগ্য নয়। আমারও কি সব মনে আছে! আমিও তো ঐ দিনগুলো মনে রাখতে চাইনি। তখন এগুলো লেখার কথা সেভাবে মনে হয়নি! মানে একেবারে যে হয়নি তা নয়, কিন্তু এই উদ্দেশ্য ঐ স্মৃতিগুলো ধরে রেখে মানসিক ক্ষয় করতে চাইনি।

ডঃ কাজল ভট্টাচার্য আমার নিস্পৃহতা নিতে পারতেন না। আমার চিন্তাক্ষেত্রের একচ্ছত্র দখল চেয়েছিলেন। একজন নার্সিসিস্টের যা যা বৈশিষ্ট্য থাকে তার প্রত্যেকটাই ওঁর মধ্যে উপস্থিত ছিল। আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দু না হতে পারলে চরম ফ্রাস্ট্রেশনে ভোগা, নিজেকে আকর্ষণের কেন্দ্রস্থলে রাখবার জন্য নিজের একটা রহস্যময় অথচ চার্মিং ভাবমূর্তি তৈরী করা, নিজেকে অন্তর্মুখী দেখানোর চেষ্টা, আশেপাশের মানুষদের থেকে আশা করা যে তারা ওঁর নার্সিসিজমকে প্রশ্রয় দেবে, নিজের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রয়োজন বা ইগোকে প্রায়োরিটি লিস্টে সবচেয়ে উপরে রাখা এবং আশা করা যে অন্যরাও সেটা করবে, এবং ম্যানিপুলেশনে দক্ষতা অর্জন করা। নার্সিসিজম একপ্রকার পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। এরা সবচেয়ে বেশী যেটা ঘৃণা করে তা হল বাউন্ডারি। যেটা টেনে রাখার ফলে আমাকে ওঁর অস্বাভাবিক বিদ্বেষের স্বীকার হতে হয়েছে। কিন্তু এটা টেনে রাখার ফলে আমি একটা বিশাল বড় বিপর্যয় থেকে রক্ষা পেয়েছি। বিপর্যয়টার নাম প্রেম। উনি যেটা করছিলেন সেটা মনঃস্তত্ত্ব পড়ে আসা কোনো মানুষ একটাই উদ্দেশ্যে করে। কখনও অনাদর, ক্ষেত্রবিশেষে রীতিমত অভদ্রতা কখনও আবার আবেগের মিসাইল নিক্ষেপ। যেন ঐ মুহূর্তে ওঁর পৃথিবীতে আমি ছাড়া কিছুর অস্তিত্বই নেই। উনি চেয়েছিলেন আমি ওঁর প্রেমে পড়ি। কেন চেয়েছিলেন তার উত্তরটা আজও আমার কাছে ধোঁয়াশা। শুধু আমাকে খাদের ধারে ঠেলে মজা দেখতে? নাকি প্রত্যাখ্যানের সুযোগ পেয়ে নিজের আহত পৌরুষে মলম লাগানো! অথবা, যেটা আমার বিশ্বাস করতে বেশ কষ্ট হয় অর্থাৎ আমাকে বিছানায় টানা। হয়ত সুপ্ত তিয়াসা সেটাই ছিল, তবে অতটা ওঁর সাহসে কুলোত না। পৃথিবীর সবচেয়ে ট্র্যাজিক কেস হল ইমেজের দায়ে হাত পা এবং পুরুষাঙ্গ বাঁধা পড়া কামুক বাঙালী ইন্টেলেকচুয়াল। তার উপর অধ্যাপক হলে তো কথাই নেই। কারণটা যাই হোক, আমাকে মানসিক ভাবে পুরোপুরি ধ্বংস করার পরিকল্পনা করেছিলেন ভদ্রলোক। কাউকে নিজের কারণে কষ্ট পেতে দেখলে (সে প্রেমঘটিত হোক আর না হোক) এদের একটা বিচিত্র আনন্দ হয়। অতঃপর নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের জন্য যেটা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ তা হল এদের সঙ্গে সমস্তরকম সংশ্রব বর্জন করা।

উনি বিবাহিত, ওঁর আমার বয়সী একটা মেয়ে আছে, ওঁর চেহারাটা মিশরের লোমহীন বেড়ালের মত। ভদ্রলোক অস্বাভাবিক রোগা, বাঁদরের মত লাফালাফি করতেন। ভদ্রলোককে দেখলে কোনো একটা অজ্ঞাত কারণে ছাল ছাড়ানো মুরগীর কথা মনে পড়ে। ইত্যাদি বিভিন্ন কারণ থাকলেও সেগুলো আমার ওঁর প্রেমে না পড়ার মত কিছু শক্তপোক্ত কারণ ছিল না। আমাদের বয়সী মেয়েরা সাধারণত বুদ্ধির গোড়ায় এবং চোখের উপর পর্দা ফেলে রাখে। ব্রিটিশদের মত গায়ের রঙ আর ব্যক্তিত্ব দেখলেই তাদের মাথার ঠিক থাকে না। আমার ক্ষেত্রে ওখানেই একটা সমস্যা হয়ে

গেছিল। মানে ঐ চার্মটা ভেঙে যাওয়া। নিজেকে ভদ্রলোক প্রয়োজনের তুলনায় একটু বেশী মাত্রায় প্রকাশ করে ফেলেছিলেন আমার কাছে। আমার মত নাস্তিকের উপর পরওয়রবিগারের আশীর্বাদ কিনা জানি না, ওঁর উদ্দেশ্য সবটা না বুঝলেও আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় ইঙ্গিত দিচ্ছিল লোকটা ভাল নয়। আমার চারপাশের লোহার দুর্গটা একটুও শিথিল করলে তার ফল আমার পক্ষে ভাল হবে না।

লোকটা ভীতু ছিল, কিন্তু একটা চিরাচরিত নার্সিসিস্টের মতই মেগ্যালোম্যানিয়াক ছিল। আসলে কি ঘটছিল এটা মার্ক্সের ক্লাসের ছেলেমেয়েরা আঁচ করতে পারত না। পলিটিকাল ইকোনমির ছেলেমেয়েরা কিছুটা হয়ত পারত, কিন্তু ওর আন্ডারে থাকা রিসার্চ ফেলো সৌম্যদা বা অপর্ণা কেনই বা আমার জন্য ওর বিরুদ্ধে যাবে! লোকটা সূক্ষ্মভাবে আমাকে অপমান করার সুযোগ বড় একটা ছাড়ত না। অবশ্য আমার ক্ষেত্রেও কথাটা সত্যি, আমিও ঠাণ্ডা বিদ্রোহ চালিয়ে গেছি বরাবর।লোকটার সবচেয়ে অদ্ভুত বৈশিষ্ট্য ছিল আমাকে প্রতিমুহূর্তে অস্বস্তিতে ফেলা বা হিউমিলিয়েট করার চেষ্টার পরও, এমনকি থার্ড সেমে সরাসরি আমার ক্ষতি করার পরও আশা করত আমার আচরণ ওর প্রতি সম্পূর্ণ স্বাভাবিক হবে। এখানেই মেঙ্গেলের সাথে ওর মিল খুঁজে পেতাম। কিন্তু একটা জায়গায় আমার জয় হয়েছিল। লোকটা মেঙ্গেলের মত নিস্পৃহ থাকতে পারেনি। আমাকে লোকটা যখন চোখ দিয়ে লেহন করত, তখন ওর চোখে লালসা আর ঘেন্নার সাথে একরকম অসহায়ত্বও দেখেছি। শেষের দিকটায় পুরোপুরি আত্মসংযম হারিয়ে লোকটা দৃষ্টিকটুভাবে উদ্ভট কিছু আচরণ করছিল।

আগের সেমিস্টারের পরীক্ষার সময় কাজলবাবু প্রায় প্রতিদিন আমাদের ঘরে গার্ডের দায়িত্ব নিচ্ছিলেন। এবং আমি সামনে থাকলেও বেশ দৃষ্টিকটুভাবে পিছিয়ে গিয়ে আগে অপর্ণাকে কোয়েশ্চেন পেপার দিচ্ছিলেন, তারপর বিষ্ণুকে, তারপর অন্যদের, সবশেষে আমাকে। উলটোটা করা কোনো অজ্ঞাত কারণে তাঁর পক্ষে অসম্ভব ছিল। তাই বোধ হয় ভয়ে এবার আমাদের ঘরে গার্ড নেননি। আমাকে বা অপর্ণাকে কাউকেই তিনি চটাতে চাইছিলেন না। এমনকি আমি শেষদিনের ক্লাসে তাঁকে পা এগিয়ে দিয়ে ফেলে দেবার চেষ্টা সত্ত্বেও না। তাঁর ইগোর মলম পাবার ডেসপ্যারেসি এতটাই বেশী ছিল যে ঐ ঘটনার পরও আমাকে পরিতোষণ করার চেষ্টা করছিলেন। এত ধূর্ত মানুষ, এটা কি আর বোঝেননি যে ঘটনাটা ইচ্ছাকৃত ছিল!

কাজলবাবু আমাদের মত অল্পবয়সী মেয়েদের মস্তিষ্ক নিয়ে খেলতে খুব ভালবাসতেন। সফট টার্গেট ছিল ছাত্রীরা। কারণ কোলিগদের ক্ষেত্রে এগোতে গেলে জুতো খাবার সম্ভাবনা প্রবল। জায়গামত উনি ভদ্রতার প্রতিমূর্তি সাজতে পারতেন। যে অভিজ্ঞতাটা আমার হয়েছে জানিনা আমাদের ব্যাচের আরও কোনো মেয়ের হয়েছে কিনা! এটা নিয়ে নিজেদের আলোচনা করা সম্ভব ছিল না। পরবর্তী সময়ে নিজের অভিজ্ঞতায় দেখেছি মেয়েরা নিজেদের মধ্যে খোলাখুলি আলোচনায় বসতে পারলে, পরস্পরের সমর্থনে থাকতে পারলে কাজলবাবুর মত অজস্র পারভার্ট বেত্রাহত সারমেয়র মত দৌড়ে পালায়। আমার লোকটার প্রতি মাঝে মাঝে করুণাও হত। এত সফল একজন মানুষ, কিরকম মিডল এজ ক্রাইসিসে ভুগছে। চিরাচরিত নার্সিসিস্টিক পার্সোনালিটি ডিসঅর্ডার। তখন মনে হয় বিশ্বচরাচরের সব মেয়েই বোধহয় আমার প্রেমে পড়ছে। একজনের কাছ থেকে একটু কম গুরুত্ব পেলে এদের কাছে সেটা জীবনমরণ সমস্যা

হয়ে দাঁড়ায়। ফলস্বরূপ এরা গভীর ডিপ্রেশনে চলে যেতে পারে, আবার চরম ফ্রাস্ট্রেশনের ফলে হিংস্র হয়ে উঠে অন্যদের ক্ষতি করার চেষ্টা করতে পারে। নীতিবোধ ব্যাপারটা এই জাতীয় মানসিক রোগীদের কাছে আশা করা বাহুল্য। কাজলবাবুর দ্বিতীয় অবস্থাটা হয়েছিল। পলিটিকাল ইকোনমির ক্লাসটাকে ভদ্রলোক নিজের হারেম ভাবতে শুরু করেছিলেন। আর নিজেকে সম্রাট গোছের কিছু একটা। এই সময় তাঁর উচিত ছিল মনোবিদের সাথে যোগাযোগ করা। কিন্তু তা না করে তিনি এদিক ওদিক গুঁতিয়ে বেড়াচ্ছিলেন। মাথাটা শেষের দিকে তিনি পরিপাটি করে চুল আঁচড়ানো আর গুঁতোনো ছাড়া কোনোকাজেই ব্যবহার করতেন না। কোনো প্রশ্ন করলে ঠিকঠাক উত্তর পর্যন্ত দিতে পারতেন না। শুধু আমার ক্ষেত্রে নয়, অনেকের ক্ষেত্রেই। যেমন একটা ছেলে হলোকাস্ট নিয়ে প্রশ্ন করায় এড়িয়ে গেলেন। ক্লাসে এসে একটা বইয়ের চ্যাপ্টারের নাম রোজ ভুল বলতেন, লেনিনের স্ত্রীয়ের নামটা পর্যন্ত ভয়ঙ্কর ভাবে ভুল বলেছিলেন। ম্যাডাম কোল্লনতাইকে তাঁর স্ত্রী বলে দিলেন।

শেষদিন আমার সিজিওর অফ পাওয়ার নিয়ে ভায়োলেন্ট মতকে পর্যন্ত সমর্থন করে মেনে নিলেন প্রতিরোধ দরকার। সম্ভবত চাইছিলেন যাতে মাওবাদীর প্রশ্নটা নিয়ে আমি আবার ওঁর কেবিনে যাই। আগের সপ্তাহে কয়েকবার ডেকেছেন, এড়িয়ে গেছি।যাই হোক তা সত্ত্বেও যাইনি। উত্তরটা শম্পা ম্যাডামের সাথে আলোচনা করে নিয়েছিলাম। আমাদের পলিটিকাল ইকোনমি পরীক্ষার দিন ভদ্রলোক যখন হলে এসেছিলেন আমি তাঁকে লক্ষ করিনি। মানে খাতার দিকে মনোযোগ ছিল। হঠাৎ উপলব্ধি করলাম অপর্ণার সামনে দাঁড়িয়ে কিরকম চোর চোর ভঙ্গিতে ওকে জিজ্ঞেস করছেন, "কোয়েশ্চেন ঠিক আছে তো?"

অপর্ণা আমার সামনের বেঞ্চে বসেছিল।

আমি যেহেতু কাজলবাবুর নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব দেখে অভ্যস্ত তাই ওদিকে তাকানোর প্রয়োজনবোধ করলাম না। প্রশ্নটা অপর্ণাকে করে বেরিয়ে যাবেন, এটাই স্বাভাবিক। কখনও আমি আর অপর্ণা একসাথে থাকলে এরকম ঘটনা বেশ কয়েকবার হয়েছে যে ভদ্রলোক আমাকে চিনতেই পারলেন না, ওর সাথে কথা বলে গেলেন। একসময় যে সেগুলো খারাপ লাগত না তা নয়, তবে এখন লাগে না। কারণ এই চোখে আঙুল দিয়ে দেখানো উপেক্ষাগুলোর কারণটা উপলব্ধি করতে পারি। আমি লিখছিলাম, হঠাৎ ফিল করলাম কাজলবাবু তাঁর সাদা কঙ্কালসার হাতটা আমার সামনে এসে অদ্ভুত ভাবে নাড়ছেন। আমি একটু অবাক হয়ে তাকালাম। (ভদ্রলোক কেন যে আমায় নাম ধরে সরাসরি সম্বোধন করেন না!) উনি অপ্রতিভ ভাবে বললেন, "কোয়েশ্চেন ইজি আছে?"

"হুম।" প্রায় অস্ফুটে কথাটা বলে আমি আবার লিখতে শুরু করলাম। পরে লক্ষ করছিলাম ভদ্রলোক মাঝে মাঝেই ঘরটার সামনে দিয়ে যাতায়াত করছেন। যেতে যেতে বারবার আমাকে দেখছেন। সেদিন টার্ম পেপার জমা দেওয়ার সময় ওঁর কেবিনে যেতেই হল। আমি একা ঢুকব না বলে কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, হিয়াকে আসতে দেখে ওর সঙ্গে ঢুকলাম। "স্যর আসব?" "থ্যাঙ্ক ইউ স্যর" গোছের ফর্মালিটিগুলো যাতে হিয়ার দায়িত্বে মিটে যায়। আমার কাজলবাবুর সাথে একটা বাক্যবিনিময় করারও প্রবৃত্তি হচ্ছিল না। লোকটা নির্ঘাত কোয়েশ্চেন পেপার অপর্ণাকে পরীক্ষার আগেই দিয়ে দিয়েছে। আজ সেই কারণেই খোঁজ নিতে এসেছিল অপর্ণার কোনো অসুবিধা হচ্ছে কিনা!

নইলে অত কাণ্ড করে ডেকে কথা বলবার লোক কাজলবাবু নন। একটা মিথ্যেকে চাপা দিতে মানুষকে কতরকম আত্মনিগ্রহ করতে হয়!

কেবিনে আবার ওঁর পুরোনো নাটকটা শুরু করলেন। হিয়া বারবার ডাকছে, "স্যর এটা কোথায় জমা দেব?" ভদ্রলোক কোনো উত্তর না দিয়ে ঘাড় শক্ত করে সাইকোপ্যাথদের মত বসে। একসময় ফাইলটা ওর হাত থেকে নিয়ে নিজের টেবিলে রাখলেন। আমি সশব্দে আমারটাও টেবিলে রেখে বেরিয়ে এলাম। হিয়া "থ্যাঙ্ক ইউ স্যর" বলে আমাকে অনুসরণ করল। (কিসের জন্য ধন্যবাদ দিল কে জানে!)

তার একদিন পর মার্ক্সের পেপার। সেদিন অসম্ভব ব্যথা হয়েছিল ডান হাতে। কিভাবে পরীক্ষা দিয়েছি আমিই জানি। তবে পেপারটা বেশ ভাল হয়েছিল। পলিটিকাল ইকোনোমির পেপারটার মত অতটা ভাল না হলেও। যদিও জানি কোনো লাভ নেই। একরকম হতাশা কাজ করছিল। খাতাটা ঐ দুর্নীতিপরায়ণ পারভার্টটা দেখবে ।আবার আগের সেমিস্টারের মত.....পড়াশোনা করার কোনো মূল্য নেই! মার্ক্সের পেপারে অবশ্য কুড়ি নম্বর রাজর্ষি স্যরের হাতে।

মার্ক্সে প্রায় সতেরো জন পরীক্ষার্থী। কাজলবাবুকে ঘরে আসতে দেখে আমি আড়চোখে তাঁকে লক্ষ করছিলাম। সরাসরি তাকানো যাবে না, আনন্দিত হয়ে উঠবেন। আর ওঁকে আনন্দিত হতে দেখলে, অন্তত আমার কারণে-আমার একটুও ভাল লাগবে না। ভদ্রলোক কোনোদিকে না তাকিয়ে হঠাৎ আমার সিটের দিকে এগিয়ে আসছিলেন, তারপর কি ভেবে সরে গেলেন। গার্ডে থাকা সব্যসাচী স্যরের সাথে কুশল বিনিময় করলেন, কারো কোথাও অসুবিধা আছে কিনা জিজ্ঞেস করলেন। (আগের দিনের মত আলাদা আলাদা করে নয়, সামনে দাঁড়িয়ে একসঙ্গে সবার উদ্দেশ্য প্রশ্ন করে)।তারপর বার বার আমার দিকে পিছন ফিরে দেখতে দেখতে দরজার দিকে এগিয়ে গেলেন। দরজায় দাঁড়িয়ে শেষবারের মত যেন কিছুর প্রত্যাশায় আরও একবার ঘুরে দেখলেন।তারপর বেরিয়ে গেলেন।

কম্প্রিহেনসিভ পরীক্ষার দিন ছাত্রছাত্রীদের ওঁর সাথে শেষবারের মত দেখা করে গিফট দেবার কথা ছিল। ওঁর র্যাডিকাল ফলোয়ার আলি আগেই গিফট কিনে ফেলেছিল। পরে আমাদের কিছু কন্ট্রিবিউট করার অনুরোধ করে। আমি ঠিকই করেছিলাম লোকটার উপর একটা পয়সাও নষ্ট করব না। তাই সেদিন পরীক্ষার পর ওঁর কেবিনে যাইনি। অবশ্য এটাই একমাত্র কারণ নয়। ওঁর প্রতি আমার নীরব বিদ্রোহের অন্যতম কর্মসূচি ছিল ওঁর কেবিন বয়কট করা। ব্যাপারটা যে কোনো কারোর কাছে হাস্যোদ্দীপক হতে পারে। কিন্তু ঐ মুহূর্তে শীতলতা ছাড়া আমার আর কোনো অস্ত্র ছিল না।

রিটন পরীক্ষা হয়ে যাবার পরও আমাদের গ্রুপ প্রোজেক্টের প্রেজেন্টেশন বাকি ছিল। গ্রুপে একটি বদ ছেলের জন্য বেশ ঝামেলা হচ্ছিল। আমাদের মেন্টর সব্যসাচী স্যরের কারণে তাকে সংযত হতে হয়। যাই হোক, সেদিন আমরা সব্যসাচী স্যরের কেবিনে বসে ছিলাম, কাজলবাবুর কেবিনটা তাঁর ঠিক মুখোমুখিই। হঠাৎ কাজলবাবুর কেবিনের থেকে খুব জোরে জোরে শব্দ আসা শুরু হল। সব্যসাচী স্যর এবং আমাদের গ্রুপের অন্যান্য ছেলেমেয়েরা অবাক হয়ে সেদিকে তাকিয়েছিলেন। আমি চোখ বন্ধ করে আমার চেয়ারে বসে রইলাম। আমার আশঙ্কা হচ্ছিল কাজলবাবু আমাকে দেখতে পেয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য কিছু করছেন কিনা!

এরপরের ঘটনাটা প্রেজেন্টেশনের দিনের।কাজলবাবুর গ্রুপের প্রেজেন্টেশনের স্লট আমাদের ঠিক পরপরই। জানিনা এটা কাকতালীয় না ইচ্ছাকৃত। আমি শুধু জানতাম যা হচ্ছে সেটা আমার পক্ষে ভাল না। অসম্ভব দুশ্চিন্তায় কেটেছে সেই সময়গুলো। ঐ অভিজ্ঞতাগুলো স্মরণ করে লেখা অনেকটা পুরোনো ঘা খুঁড়ে তাজা রক্ত বের করার মত। আমাদের প্রেজেন্টেশনের শেষের দিকটায়, মানে শেষ হবার বেশ কিছুক্ষণ আগে থেকেই হলে ঢুকে বসে ছিলেন। আমরা যখন বেরিয়ে যাচ্ছি উনি হঠাৎ উঠে দেওয়ালের গায়ে কিরকম টিকটিকির মত করতে শুরু করলেন। মানে যেন চার হাত পা দিয়ে হেঁটে দেওয়ালে উঠে যাবেন। একসময় আমাদের সাথে দরজা দিয়ে বেরিয়ে যেতে উদ্যত হলেন। আবার কি মনে করে ভিতরের দিকে চলে গেলেন।

এর পরের ঘটনাটা এম ফিলের পরীক্ষার পর। পরীক্ষাটা খুব একটা সিরিয়াসলি দিইনি। নেহাত পাঁচশ টাকা দিয়ে ফর্ম ফিল আপ করা বলেই দিতে যেতে হয়েছিল। রিটনে অপর্ণা এমনকি অপর্ণার চেয়েও কম নম্বর পাওয়া একটি ছেলে কোয়ালিফাই করলেও খুব বিস্ময়কর ভাবে সায়ন্তনী চান্স পেল না। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য প্রেজেন্টেশনে কাজলবাবু তাঁর গ্রুপকে খুবই সাহায্য করায় সায়ন্তনীর উপর অপর্ণা রীতিমত ক্ষেপে ছিল। সায়ন্তনী ওদের গ্রুপ লিডার ছিল।

যারা রিটনে কোয়ালিফাই করেছে তাদের এস ও পি টা ইন্টারভিউয়ের আগে জমা দিতে হত। ওটা লিখতে সমস্যা হচ্ছিল। গুগল করেও কিছু উদ্ধার করতে পারছিলাম না। শম্পা ম্যাডামকে দেখাতে চাওয়ায় বলেছিলে, "কাজলকে দেখিয়ে নিলে বোধহয় ভাল হত।"

আমি ওঁর আন্ডারে কাজ করতে চাই জানানোতেও বেশ সংকুচিত হয়ে বললেন ডিপার্টমেন্টের অন্য অধ্যাপকরা হয়ত রাজী হবেন না।বললেন, "কাজলকে বরং নিয়মটা একবার জিজ্ঞেস করে নাও।"

যাই বলি ম্যাডাম কাজল ভট্টাচার্যের কোর্টে বল ঠেলেন। আচ্ছা ঝামেলা! ঐ লোকটাকে মেল করতে হবে! তাও নিজে থেকে! চিন্তাটাই কিরকম শরীর খারাপ লাগার মত! আবার কি করবে কে জানে! আমার এই অনিশ্চয়তায় ভোগা, মানসিক অস্থিরতা এই প্রত্যেকটা টানাপোড়েন ভদ্রলোক আমন গোয়েথের সমান সেডিজমে উপভোগ করেন। ম্যাডাম এমনিতে খুবই সাপোর্টিভ এবং ফ্রেন্ডলি, সবসময়ে সাহায্য করেন। কখনও বিরক্ত হতে দেখিনি, এত প্রতিষ্ঠিত ও সিনিয়র হয়েও অদ্ভুত নিরহঙ্কার, কিন্তু ভিজিটিং ফ্যাকাল্টি হবার কারণে সম্ভবত ওঁর মধ্যে একরকম দ্বিধা কাজ করছিল।
অতঃপর বাধ্য হয়ে কাজলবাবুকে ইমেল করে জিজ্ঞেস করলাম এস ও পি টা যদি দেখে দেন। ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় পরেও কোনো উত্তর দিলেন না। হলটা কি! আমি নিজে থেকে মেল করায় আনন্দের চোটে বুড়োর হার্ট ফেল করে যায়নি তো! অথবা হতে পারে ওকে উপেক্ষা করার বদলা নিচ্ছে। আমি কাজলবাবুকে এম ফিলের নিয়মের ব্যাপারে জিজ্ঞেস করে আরেকটা ইমেল করে দিলাম। মানে যেটা ম্যাডাম আমাকে ওঁর থেকে জানতে বলেছিলেন সেই বিষয়ে। আমি নিশ্চিত হয়ে গেছিলাম ভদ্রলোক উত্তর দেবেন না। সেটাই না হয় ম্যাডামকে জানাব। পরদিন সকালে ম্যাডামকে এস ও পি টা মেল করার জন্য জিমেইল খুলে দেখলাম কাজলবাবু আমার মেলটার উত্তর দিয়েছেন। ভদ্রলোক আমাকে বিস্মিত করার একটা সুযোগও ছাড়বেন না।

"প্রিয় তৃষ্ণা,

আমি এম ফিলের নিয়মটা জানি না। আমি এখন ছুটিতে আছি কিন্তু ফিরে এলে খোঁজ নিয়ে নিশ্চয়ই জানতে পারব। তোমার এস ও পি তে যে এরিয়াটা তুমি স্টাডি করতে চাও সেটা দেবে এবং কোন ডিরেকশনে এগোতে চাও সেটাও লিখবে। যে রেফারেন্সগুলো কনসাল্ট করেছ সেগুলোও অবশ্যই উল্লেখ করবে।

স্যর।"

এটাই আমাদের শেষ কথোপথন। এস ও পিটা শেষ পর্যন্ত ম্যাডামই দেখে দিয়েছিলেন। এম ফিলের ইন্টারভিউয়ের দিন খুব বিস্ময়কর ভাবে কাজলবাবু অনুপস্থিত ছিলেন। অপর্ণা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করছিল, "আজ কেবিএইচ এলেন না কেন বলত? "আমার ওর প্রতি বিরক্তির উদ্রেক হচ্ছিল। জানি না সব জেনে ন্যাকামি করছিল কিনা! আমার ষষ্ঠ ইন্দ্রিয় বলছিল কাজলবাবু পরীক্ষায় টানা কারচুপি করে আসায় এখানে আর আমার মুখোমুখি হতে সাহস পাচ্ছেন না। মানে ভয় পাবার কিছুই নেই, তাও....হয়ত অপরাধবোধ!হয়ত এই আশঙ্কা যে অপর্ণা সিলেক্টেড হল আর আমি হলাম না সেক্ষেত্রে ওঁকে অভিযুক্ত করতে পারি!

পর্ব ১৬
কাজল ভট্টাচার্যের কথা

"বিদ্যত্বং চ নৃপত্বং চ নৈবতুল্য কদাচন।
স্বদেশে পূজ্যতে রাজা, বিদ্বান সর্বত্র পূজ্যতে।"

ফুকো বলেছিলেন, "নলেজ ইজ পাওয়ার। "আধুনিক যুগের ক্ষমতাকে যদি বুঝতে চাও আগে রাজাদের মাথাগুলো কেটে ফেল। হ্যাঁ এখানেই একবিংশ শতাব্দীতে ইডিওলজিকাল স্টেট অ্যাপারেটাসের সার্থকতা। রিপ্রেসিভ স্টেট অ্যাপারেটাসের দরকারটা সেকেণ্ডারি। তবে শুধুই আধুনিক যুগ কেন? চাণক্য শ্লোক পড়েছেন আপনি পাঠক? পড়েছেন মুদ্রারাক্ষস? দুই সহস্রাব্দী আগের এক পলিটিকাল ইকোনমির অধ্যাপক, শ্রী বিষ্ণুগুপ্ত। তিনিও আমার মতই একটা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াতেন, বিষয়টাও এক। ক্ষমতার প্রতিমূর্তি। ওহ সে কি দাপট। যাঁর মেধা ছিল তাঁর ক্ষমতার উৎস। প্রজ্ঞাই ক্ষমতা, ক্ষমতাই প্রজ্ঞা। কে না জানে মণিভূষিত সর্প তথা বিদ্বান শয়তান অশিক্ষিত শয়তানের চেয়ে অনেকগুণ বেশী বিষাক্ত। খোদ সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত লোকটার ক্ষমতার খিদেয় অতীষ্ঠ হয়ে বানপ্রস্থে পালালেন। ওখানেই মেধাস্বরূপ ক্ষমতার জয়। চাণক্যের প্রভাব মুক্ত হওয়া বা তাঁকে অপসারিত করা সম্ভব নয় বুঝে একবুক বিতৃষ্ণা নিয়ে চন্দ্রগুপ্ত নিজেই সরে গেলেন। আজ দু হাজার বছর পরে বসে আমি ঐ লোকটার সাথে নিজেকে রিলেট করতে পারি। আমিই ক্ষমতা। হৃদয়হীন, অনুভূতিহীন ক্ষমতা। যা শুধু হেজিমনি চেনে। আমার সাথে সম্পর্কযুক্ত প্রত্যেকটা মানুষের নিয়তিই

হচ্ছে আমার কাছে আত্মসমর্পণ করা। যেমন শর্মিষ্ঠা। আমার বিশ্বাসঘাতকতা, পরস্ত্রীর প্রতি অত্যধিক আসক্তি- এগুলো ওকে দিনের পর দিন ক্ষতবিক্ষত করতে পারে, চোখের নীচে গাঢ় অন্ধকার তৈরী করতে পারে। এর জন্য ও ঈর্ষিত হয়, রাগ করে কিন্তু সব একটা সীমার মধ্যে থেকে। আমি ঐ সীমাটা কাউকে ছাড়ানোর অনুমতি দিই না।দিনের শেষে নারীত্বের সম্পূর্ণ অপমানটুকু গিলে ফেলে ওকে অভিমানী মুখে এসে আমার বুকেই আশ্রয় নিতে হয়। একই কথা অপর্ণার ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। আমাদের বিডিএসএম সম্পর্কের কারণে আমি ওকে অনেকটা ছড়ি ঘোরাতে অ্যালাউ করলেও আখেরে ওকে আমার কাছেই আত্মসমর্পণ করতে হয়। শর্মিষ্ঠা তৃষ্ণা নয়, আমার ঐ একচ্ছত্র ক্ষমতার জায়গাটা ধরে ও কোনোদিন টানার চেষ্টা করবে না। বরং অন্য মেয়েদের নিজের প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে আদরে, বিশ্বস্ততায় আমাকে বাঁধবার চেষ্টা করবে। আমি বাঁধা পড়বার লোক নই জেনেও নিজেকে স্তোক দেবে। প্রতিদিন আশায় বুক বাঁধবে। অপর্ণার ক্ষেত্রে রাগের বহিঃপ্রকাশটা অনেকটা উগ্র, বন্য। কিন্তু আখেরে ওরও নিয়তি তাই। আমাকে নিজের সবটুকু দিয়ে বেঁধে রাখবার চেষ্টা করা। যদিও ও জনসমক্ষে এটা কোনদিন স্বীকার করবে না। আমি ওর দাসানুদাস – এই পরিচয়টাই ও পছন্দ করে। উলটোটা নয়। যদিও সম্পর্কে আমি সাবমিসিভ, তাও আখেরে সম্পর্কের ছড়িটা কিন্তু আমার হাতেই। অপর্ণাও তৃষ্ণা নয়। সায়ন্তনীকে আমি চেখে দেখার ততটা সুযোগ পাইনি। চেষ্টা করেছিলাম, অপর্ণার কারণে বেশীদূর এগোনো সম্ভব হয়নি। কিন্তু ওরও ওটাই নিয়তি হত, সায়ন্তনীও তৃষ্ণা নয়। এই কারণেই অপর্ণা বা শর্মিষ্ঠা এখনও আমার সঙ্গে আছে। তৃষ্ণা নেই। ওর কোনো চিহ্নও আমি থাকতে দিইনি। সায়ন্তনীকে অবশ্য দুর্নাম এবং অপর্ণার ভয়ে অনিচ্ছাসত্ত্বেও ছেঁটে ফেলতে হয়েছে। ক্ষমতার এটাই বৈশিষ্ট্য। যখন যাকে প্রয়োজন ছেঁটে ফেল। এই কারণেই শ্রীরামচন্দ্র আমার প্রিয়তম পৌরাণিক চরিত্র। রাম আসলে ক্ষমতার প্রতীক। যে রাম অনুগতা শবরীর এঁটো ফল গ্রহণ করেন, সেই রামই মোক্ষপিপাসী শুদ্রকে হত্যা করেন। সীতাকে উদ্ধারের পরপরই জানিয়ে দেন হৃদয়বৃত্তি নয়, ক্ষমতায় লাগা দাগটা তুলতেই তাকে রাবণের থেকে ছিনিয়ে এনেছেন। এত মৃতদেহের উপর দাঁড়িয়ে স্ত্রীকে উদ্ধার করেও তাকে ত্যাগ করতে একমুহূর্ত দ্বিধা করেন না রাম। এর নামই ক্ষমতা। যার কাছে নারী, যৌবন সবকিছু সমর্পিত। এখানে মানবিকতা, ভালবাসা এমনকি ব্যক্তিগত রাগ, বিদ্বেষ শব্দগুলো মিথ। এই ক্ষমতাকেই তৃষ্ণা অস্বীকার করার সাহস দেখিয়েছিল। আমার সামনে দ্য নেকেড কিং এর ঐ শিশু হয়ে দাঁড়িয়ে।

আমি থার্ড সেমিস্টারে যা করার করেছি, সেটা ওর প্রাপ্যও ছিল। কিন্তু এরপর ওকে অজস্র সুযোগ দিয়েছি আমার সামনে মাথা নোয়াবার। ও সেগুলো বারবার প্রত্যাখ্যান করেছে। ওর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এক এক সময় এমন কিছু পাগলামি করেছি যা ভাবলে নিজেরই এখন অস্বস্তি হয়। তাই ওকে সবদিক দিয়ে আটকেছি। ওর অ্যাকাডেমিয়ায় আসার পথটাও। কাউন্টার হেজিমনি আর হেজিমনি পাশাপাশি থাকতে পারে না। সিদ্ধার্থ রায় আর চারু মজুমদার এক জায়গায় থাকতে পারে না। এটাই প্রকৃতির নিয়ম। তৃষ্ণা নারী হয়ে কোনোদিন আমার জীবনে আসেনি, এসেছিল বিপ্লবের মূর্ত প্রতীক হয়ে। যে কোনো একজনকে সরে যেতেই হত। ওকেও হয়েছে। তৃষ্ণা কোথাও নেই। তৃষ্ণা কোথাও নেই? ওহ ভগবান! আমার শিরায়, ধমনীতে, অবচেতনে এভাবে কে সর্বগ্রাসী হয়ে ছেয়ে আছে! থিসিস অ্যান্টিথিসিসের সংঘাতে আমার অবস্থান কি সিনেহসিসের? হৃদয় বা মস্তিষ্ক নিয়ে কিছু বলতে চাই না। আমার শরীরে ঐ দুটো জিনিসের ভূমিকা আমার শিশ্নই পালন করে।

আজ যদি ও বেরিয়ে নিজের অভিজ্ঞতার কথা বলতে যায় ওকে আইনি এবং বেআইনি পথে আমি বিপর্যস্ত করতে পারি। আমার হাতে এরকম অজস্র ছেলেমেয়ে আছে যারা আমার একটা অঙ্গুলীহেলনে ওকে সোশাল মিডিয়ায় ডিজিটাল ধর্ষণ করে চুপ করিয়ে দেবে। এমন ছেলেও আছে যে আমার একটা কথায় ওর মুখে অ্যাসিড ঢেলে আসবে। (পৃথিবীর সেরা মুহূর্ত হবে সেটা, ঐ রূপ নিয়েই তো এত গর্ব!) যদিও তারপর আমি ছেলেটির সাথে সম্পর্ক অস্বীকার করব। কাজের পরিণতির দায় তাকেই ভুগতে হবে। তাই তৃষ্ণাকে শরীরে লাগা বিষ্ঠার মত এই অভিজ্ঞতাটা বয়ে নিয়ে বেড়াতে হবে। ওর এত চেষ্টা সত্ত্বেও আমি ওকে হায়েস্ট তো দুরস্ত, চল্লিশের ওপরও পেতে দিইনি। অপর্ণার সামনে ও কিচ্ছু না, অন্তত যতক্ষণ জাজমেন্টের পাল্লাটা আমার হাতে। যেভাবে আমি অশ্বত্থামা হয়ে ঘুরছি ঠিক সেই ভাবে ওকেও ঘুরতে হবে। অতৃপ্তি নিয়ে।

একজন পুরুষের জীবনে সফল এবং সুখী হতে গেলে যা যা প্রয়োজন তার সবটুকুই আমার কাছে আছে। সামাজিক প্রতিপত্তি, অর্থ, সম্মান, অঢেল যৌনতা। সতীসাধ্বী স্ত্রী। তৃষ্ণা পর্বটা আমাকে অসহ্য মানসিক টানাপোড়েন আর যন্ত্রণা ছাড়া কিছুই দেয়নি। ওর মাস্টার্স শেষ করে বেরিয়ে যাওয়া, আমার চোখের সামনে থেকে বিদায় হওয়া একটা মুক্তি আমার কাছে। এম ফিল নিয়ে ও এমনিতেই সিরিয়াস ছিল না। পার্শিয়ালিটির অভিযোগের ভয়েই আমি ইন্টারভিউ বোর্ডে অনুপস্থিত ছিলাম। পরে অপর্ণার কাছে শুনলাম ও ওখানে বিপ্লব নিয়ে প্রচুর ভাঁট বকে এসেছে। বলেছে মেনস্ট্রিম বা বুর্জোয়া ইকোনোমিকসকে ও নাকি আদর্শগত ভাবে ডিসকার্ড করেছে। তাই সেই সংক্রান্ত একটা প্রশ্নেরও উত্তর দিতে রাজী হয়নি। অতঃপর ওকে এম ফিল থেকে বাদ দেবার জন্য আমাকে বিশেষ পরিশ্রমও করতে হয়নি। মানে প্রায় নিজের দোষেই বাদ পড়েছে।

এখন সব ঠিক হয়ে গেছে। আমার পর্নোগ্রাফির প্রতি অত্যধিক আসক্তি এখন অনেকটাই নিয়ন্ত্রণে। শর্মিষ্ঠাও আমাকে আর সন্দেহ করছে না। আমার পড়াশোনা, গবেষণা, অপর্ণা এবং আমার অন্যান্য আহার্যদের নিয়ে বেশ আছি। আমি তৃষ্ণাকে ভালবাসিনি। কিন্তু ওর নিয়ন্ত্রণ নিজের হাতে চেয়েছিলাম। চেয়েছিলাম ও আমার প্রেমে পড়ুক। সেটা ঐ অনুভূতিটা রেসিপ্রোকেট করার জন্য নয়। আস্তাবলের একমাত্র তেজী ঘোড়াকে বশে আনার পৌরুষগর্বে। কিন্তু আখেরে বিষয়টা ঘেঁটে একটা অত্যন্ত বিশ্রী পরিস্থিতি তৈরী হয়েছে। তৃষ্ণাও সম্ভবত আমাকে একটা দুর্নীতিপরায়ণ সেক্সুয়াল প্রিডেটর ছাড়া কিছুই মনে করে না। ফেসবুকে অ্যাকাউন্ট খোলার সময় আমার আশা ছিল ওর সাথে কোনো ভাবে যোগাযোগ হবে। ও আমি অ্যাকাউন্ট খোলার কিছুদিনের মধ্যে, সম্ভবত আমার অ্যাকাউন্টটা দেখতে পেয়ে আমাকে ব্লক করে দেয়। একদিকে ভালোই। একরকম মুক্তি। আমি চাই না কোনোদিন ও আমার সামনে আয়না হয়ে এসে দাঁড়াক। যে কারণে জোসেফ মেঙ্গেলে তার ঔশউইতজের পূর্বতন স্পেসিমেনদের মুখোমুখি হতে চাইত না সেই কারণেই। আমার কোনো কলঙ্ক আমার দেবতুল্য ভাবমূর্তির উপর কয়েক সেকেণ্ডের জন্যও ছায়া ফেলুক আমি চাই না। ও যে নিজেই ঘেন্নায় আমার থেকে দূরে সরে গেছে এটা একটা রিলিফ।

তাও মাঝে মাঝে হঠাৎ একটা পিঙ্ক ফ্লয়েডের গান, রাতের বৃষ্টি বা কলকাতার রৌদ্রদগ্ধ রাস্তায় কোনো কোমর অব্দি লম্বা খোলা চুলের মেয়ের হেঁটে যাওয়া দেখলে এই মুক্তিটা আমাকে কাঁটা ফোঁটায়। আর অন্তত পরবর্তী বাহাত্তর ঘন্টার জন্য একটা বিষণ্ণতা আমাকে গ্রাস করে। পৃথিবীর কোনো প্রান্তে গিয়েই এই মুক্তির শূন্যতা থেকে আমার মুক্তি নেই।

পর্ব ১৭

তৃষ্ণার কথা

এই ধরনের সম্পর্ক,যা পরকীয়ার দিকে ঘুরতে পারে, তার মূল প্রথমেই উপড়ে ফেলা উচিত। আমি ভবিষ্যৎ না ভেবে একটা পা'ও ফেলতে পারি না। যদি পারতাম তাহলে এতদিনে কোনো বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনে যোগ দিয়ে সরকারী সম্পত্তি জ্বালিয়ে বেড়াতাম। একটা লোক, যাকে আমার সাথে কথা বলতে গেলেও অপর্ণার আড়াল খুঁজতে হয় তার থেকে একটা আচরণই প্রত্যাশিত। লোকটা শরীর খুঁজতে বেরিয়েছে, এবং সহধর্মীনি দড়ি ধরে টানলেই বাধ্য বৃষের মত আবার গোয়ালে গিয়ে ঢুকবে। অপর্ণাকে, এমনকি আমাকে পর্যন্ত লোকটা ভয় পেত, সেখানে নিজের স্ত্রীকে রুদ্রমূর্তিতে দেখলে নির্ঘাত পাবলিক প্লেসে মলমূত্র ত্যাগ করে বসবে।

ভদ্রলোক সম্ভবত প্রত্যেক ব্যাচেই বেছে কিছু ছাত্রী ও রিসার্চ স্কলারকে উত্যক্ত করেন। ওঁর দেবতুল্য ইমেজের কারণে তারা নিঃশব্দে চলে যেতে বাধ্য হয়। এই জায়গায় স্বর চড়িয়েও কোনো লাভ হয় না। আমি জানি যদি সেটা করতে যেতাম, ওঁর ঘোষিত বামপন্থি ও নারীবাদী মহিলা কোলিগরাই হয়ত ওঁর সমর্থনে দাঁড়িয়ে পড়ে আমার দিকে কাদা ছুঁড়তেন। ম্যানিপুলেশনে ভদ্রলোক অত্যন্ত দক্ষ এবং সম্মোহনের কাজে প্রায় স্বর্গীয় উৎকর্ষ অর্জন করেছেন। আমাদের ডিপার্টমেন্টে এরকম একজন অধ্যাপক ছিলেন (কাজলবাবু নন), যিনি নিয়ম করে ছাত্রীদের উদ্দেশ্য অশালীন মন্তব্য করতেন। এমনকি গার্লস টয়লেটে জল না দেওয়া নিয়েও কুরুচিপূর্ণ কথা বলেছিলেন। তাঁর ডিবচারিগুলো বেশ চলত। যদিও তাঁকে কেউ পছন্দ করত না। এখান থেকেই একটা ধারণা পাওয়া যায় কাজলবাবুর মত জনপ্রিয় অধ্যাপকের বিরুদ্ধে মুখ খোলার কি পরিণতি হতে পারে। তাই আমি সেরকম কিছু করিনি। শুধু ওঁর হাঁটার সময় পা বাড়িয়ে দিয়েছিলাম। ক্লাস চলাকালীন। উনি আরেকটু হলে মুখ থুবড়ে পড়তেন। কোনোমতে সামলে নেন। তারপর খুবই দুঃখিত মুখে প্রণামের চুক্কি, উনিই হাত দেখিয়ে আমাকে প্রণাম করতে বারণ করেন। আমার পক্ষে নিঃশব্দে যতটুকু প্রতিবাদ সম্ভব করতে ছাড়িনি। যেমন, ওর সাথে সব ছাত্রছাত্রীদের ছবি তোলার দিন ক্লাস করে ঠিক ছবি তোলার সময়ের আগে কেটে পড়া। যেমন উনি বার বার ডাকা সত্ত্বেও ওঁর কেবিনটাকে বয়কট করা, যেমন শেষবারের মত যেদিন আমাদের ক্লাসমেটেরা ওঁর সাথে দেখা করতে যায় সেদিন অনুপস্থিত থাকা। ওঁর জন্য কেনা গিফটের চাঁদায় কন্ট্রিবিউট না করা। পলিটিকাল ইকোনমি ক্লাসের তরফ থেকে শুধু শম্পা ম্যাডামকে আলাদা করে উপহার দেওয়া। অবশ্য আমার আগে অপর্ণাই কাজলবাবুকে গিফট দেওয়ার ব্যাপারে আপত্তি তোলায় আমার পক্ষে কাজটা সহজ হয়ে যায়। তবে একটা বার্তা দেওয়ার ইচ্ছা ছিল। ক্লাসরুমে, করিডরে এমনকি খাতা দেখার সময় পর্যন্ত

কাজলবাবু যদি ছাত্রদের মধ্যে বিভেদ করেন আমি আমার সীমিত ক্ষমতা দিয়ে শিক্ষকদের মধ্যে সাধ্যমত সেটা করব না কেন!

কাজলবাবু চেয়েছিলেন আমার নিস্পৃহতাকে ভাঙতে, কাজলবাবু চেয়েছিলেন কোথাও একটা অন্তত আমার প্রথম হতে। একদিক দিয়ে দেখতে গেলে কিন্তু ভদ্রলোক সফল হয়েছেন। আমি ওঁর প্রতি এখন নিস্পৃহ নই। ওঁকে ঘৃণা করি, এবং সেই দিক দিয়ে দেখলে আপাতত আমার অপছন্দের তালিকায় প্রথম নামটাই ওঁর। ইন প্রেইজ অফ লাভ, পরপর দুদিন বাংলা ও সংস্কৃতে ওঁর আমাকে দিয়ে উচ্চারণ করানো বিয়ের শপথ, গৃহস্থালীর ফিউডাল গঠন বোঝাতে গিয়ে আমাকে নিজের স্ত্রী ধরে নিয়ে উদাহরণ দেওয়া-এত কিছুর পরেও প্রেমটা আমার কাছে অবাস্তব একটা বিবর্ণ শব্দ ছিল। আমাকে হাউজহোল্ড নিয়ে কাজলবাবু যে টার্ম পেপারটা করতে দিয়েছিলেন, তাতে প্রেমের ব্যাখ্যা লেখার সময় আমি পরোক্ষভাবে আমার প্রত্যাখ্যান জানিয়ে দিই। ফোর্থ সেমিস্টারের ঐ দিনগুলো থেকে শুরু করে আজকের কলম ধরার দিন-ডঃ ভট্টাচার্যের ছবিটা আমার কাছে একরকম থেকে গেছে। ঔশউইতজের বাচ্চাদের ব্যারাক, তাদের 'মেইনে কিন্ডে' সম্বোধন করা নম্রভাষী ডাঃ মেঙ্গেলে। বেশীর ভাগ বাচ্চার চোখে তিনি দেবদূত, ফাদার ফিগার। কিন্তু ইভা নামের দশ বছরের বাচ্চা মেয়েটা ঐ দিনেও দেবদূতের ছদ্মবেশে লুকোনো বিকৃতমস্তিষ্ক দানবটাকে চিনতে পেরেছিল। ঐটুকু বয়সেও সে বুঝতে পারছিল লোকটা খারাপ লোক। এবং ক্ষতিকারক। হাত পা বাঁধা অসহায় অবস্থাতেও সে ঘেন্না করত জোসেফ মেঙ্গেলেকে। ঠিক যেভাবে আমি ডঃ ভট্টাচার্যকে।

কিন্তু মেঙ্গেলে তার বেছে নেওয়া আদর্শের পথে চলছিল। সেটা ন্যায়সঙ্গত হোক বা না হোক। ডঃ ভট্টাচার্যের ক্ষেত্রটা তো ঠিক সেরকম নয়। যে লোকটা আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর থিওরি পড়াচ্ছে-স্কুল, কলেজ, আদালত, ক্লাসরুম সবজায়গায় ডেমোক্রেসির অভাবকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে; পিতৃতন্ত্র, সামন্ততন্ত্র, ধনতন্ত্র-যে সমস্ত সিস্টেম কোনো এক অপরকে শোষণ করে বেঁচে রয়েছে সেই সিস্টেমের সেন্ট্রিস্ট কাঠামোটা ভাঙতে শেখাচ্ছে সে কি করে.....আমি অবাক হয়ে ভাবতাম একটা মানুষের পক্ষে কিভাবে এতটা দ্বিচারিতা সম্ভব! যে আমাদের বারবার বলত আর্মচেয়ার বিপ্লবী বলে কিছু হয় না, যাপনেই মতাদর্শ – সে কিভাবে নিজে এইভাবে তত্ত্বের নব্বই ডিগ্রী বিপরীতে আচরণ করতে পারে!

আমি কাজল ভট্টাচার্যকে ঘৃণা করি। ওকে মানে প্রাণে পথে বসাতে চাই। আমার হৃদপিণ্ডের অন্তঃস্হল থেকে চাই ওর সর্বনাশ হোক। চাই আমি একদিন টেবিলের এপারে থাকি ক্ষমতার কুর্সিতে, আর ও সম্ভ্রমভরে নতমুখে আমার সামনে টেবিলের উলটো দিকে দাঁড়াতে বাধ্য হোক।হয়ত সবই জলের আলপনা, তাও কাজলবাবুর বয়স্ক মানুষ, অস্তাচলের সূর্য-আর আমার সারাটা জীবন পড়ে। পৃথিবীর কোনো অংশে একজন তোমার জন্য পূর্ণ বিষের থলি গচ্ছিত রেখে বসে রয়েছে। খেলার ও ক্ষমতার নেশায় আকছার মানুষ সেটা ভুলে যায়। সাংস্কৃতিক বিপ্লবের কাণ্ডারী এস ডি বলেছিলেন। বিষয়টা আমার কাছে শুধু ব্যক্তিগত প্রতিশোধের নয়, বিষয়টা আদর্শেরও। কাজলবাবুই তো আমাদের অ্যান্টোনিও গ্রামশির পথে চলতে শিখিয়েছেন।

যদি সব কিছু অপরিবর্তিত থাকত, তারপরেও কাজলবাবু এরকম নিকৃষ্ট চরিত্রের মানুষ না হতেন, এমনকি যদি সত্যিই আমার প্রেমেও পড়তেন তাহলে আমি তাঁকে ঘেন্না করতাম না। রেসিপ্রোকেট করার প্রশ্নই ওঠে না, কিন্তু তাঁকে বা তাঁর প্রেমকে শ্রদ্ধা করতাম। দূর থেকেই। কিন্তু নার্সিসিস্টরা প্রেমে পড়ে না। তিনি আমাকে মাংসপিণ্ড ছাড়া কিছুই ভাবেননি। তাই তাঁকে তাঁর জায়গাটা দেখিয়ে দেওয়া খুব প্রয়োজন ছিল। সব মেয়ে অপর্ণা হয় না। একজন নার্সিসিস্ট আপনাকে কখনও হারাতে চাইবে না। কাজলবাবু আমাকে বিভিন্ন উৎপাত করলেও আমার প্রতি তাঁর বিদ্বেষটা সাধারণভাবে আমরা বিদ্বেষ বলতে যা বুঝি তার থেকে আলাদা ছিল। বিদ্বেষ সাধারণ ভাবে বিকর্ষণ তৈরী করে, ওঁর বিদ্বেষটা আকর্ষণমূলক ছিল। উনি চাননি আমি ওঁর থেকে দূরে সরে যাই। কিন্তু চিরাচরিত একজন নার্সিসিস্টের মতই উনি আমার সাথে কোনোরকম বন্ডিং তৈরী হওয়ার ব্যাপারে ভীত ছিলেন। আমি লিখে দিতে পারি এত দিন বাদেও উনি মাঝে মাঝে আমাকে মিস করেন। কিন্তু সেটা ব্যক্তি আমাকে নয়। আমার উপর তাঁর নিয়ন্ত্রণকে, তাঁর কারণে তৈরী হওয়া আমার মানসিক অস্থিরতাকে-যেটা তাঁকে সেডিস্ট আনন্দ দিত। যে কোনো নার্সিসিস্টের মতই উনি চেয়েছিলেন আমার সাথে ওঁর যোগাযোগ থাকুক। ওঁর শেষ ইমেলেও সেই ইঙ্গিত ছিল, যাতে আমি পরে একবার মেল করি। এই যোগাযোগটা ধরে রাখার জন্য একজন নার্সিসিস্ট প্রচুর ধৈর্যের পরিচয় দিতে পারে। আপনি তাকে যেভাবে দেখতে চান সে সেভাবেই আপনার সামনে নিজেকে প্রেজেন্ট করবে। দরকার মত পিতৃসুলভ স্নেহের প্রতিমূর্তি বা নিবেদিতপ্রাণ প্রেমিক। তারপর কোনোভাবে একবার আপনাকে হাতের মধ্যে নেওয়ার অপেক্ষা। ওরা চায় যখন ওরা আপনাকে ছেড়ে যাবে তখন আপনি মানসিক ভাবে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হয়ে পড়ুন। ওরা চায় সারাজীবন ওদের দেওয়া আঘাতের মাধ্যমে আপনি ওদের মনে রাখুন। ওরা বিস্মৃত হতে চায় না।

প্রেমের বিপরীত অনুভূতি আর যাই হোক ঘৃণা নয়। নিস্পৃহতা। আমার এখানেই নিজের অক্ষমতার উপর রাগ হয়। কাজলবাবুকে ঘৃণা করার জন্য। আমার প্রতি তাঁর অকারণ ঘৃণায় বিনিময়ে আমিও তাঁকে ঘৃণা ফিরিয়ে দিয়েছি। এখনও ঘৃণা করে যাচ্ছি। এই জাতীয় অনুভূতি নিজের পক্ষেই ক্ষতিকারক। বিদ্বেষ নিজের চেয়ে বেশী আর কাকে দগ্ধ করে! তাছাড়া ঘৃণা মানেও তো একরকম সম্পর্ক স্থাপন, একরকম সাড়া দেওয়া। সেটুকুও কি কাজলবাবুর বরাদ্দ হয়?

কাজলবাবু একসময় আমার প্রতি অকারণ বিদ্বেষে নিজের মানসিক স্বাস্থ্যের ক্ষতি করেছেন, হাতে ক্ষমতা ছিল বলে আমারও ক্ষতি করতে পেরেছেন। কিন্তু এখন বেশ আছেন। এখন হয়ত নতুন কোনো শিকারকে অনুসরণ করছেন, নেকড়ের মত, নিস্তব্ধ পায়ে। যা মস্তিষ্ক ক্ষয় হবার আমার হচ্ছে। ইভা মোজেস কর যদি ক্ষমা করতে পেরে থাকেন আমি কেন পারব না? তাঁর ক্ষমা করা বা না করায় মেঙ্গেলের কিছু আসে যায় নি, আমার ক্ষেত্রেও কাজলবাবুর কিছু যায় আসবে না। কিন্তু ক্ষমাটা করা দরকার নিজের মানসিক শান্তির জন্য। কিন্তু রামকৃষ্ণ বটগাছ হতে বলেছিলেন। নিজের শান্তির জন্য মোক্ষলাভের চেষ্টাকে স্বার্থপরতা বলেছিলেন। নিজের মানসিক শান্তির জন্য যদি আমি ঐ দুর্নীতিগ্রস্ত সেক্সুয়াল প্রিডেটরটাকে ক্ষমা করি, মানবিকতা আমাকে ক্ষমা করবে না। নারীবাদ এবং চারু মজুমদারের কাছে থাকা আমার দায়বদ্ধতার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা হবে আমার ক্ষমাশীলতা। কাজলবাবু তো আর নিজের নখ দাঁত ভেঙে ফেলবেন না। পরবর্তী প্রজন্মের নিগৃহীতা মেয়েদের কাছে পূর্বসূরি হিসাবে আমি কি কৈফিয়ত দেব!

আমি একা থাকতে চাই।আমি নিজেকে সেই পুরুষে পরিণত করেছি যাকে কৈশোরে আমি কামনা করতাম। তাও যদি কোনোদিন কারো সাথে সম্পর্কে জড়াই, আমার পুরুষসঙ্গীর কাছে আমার অর্থনৈতিক নির্ভরতার চাহিদা থাকবে না। আমি চাইব তার পায়ের নখ থেকে মাথার চুল, হৃদয়, মস্তিষ্ক থেকে যৌনানুভূতি-সবটুকুর মালিকানা একা আমার হোক। আমি চাইব আমাদের দাম্পত্যে সে আমার সবচেয়ে কাছের কমরেড হোক। অসমতা, ঝড়, ধূমকেতু বর্জিত সম্পর্ক। একনিষ্ঠতার সম্পর্ক। আত্মরতি নয় আত্মত্যাগের প্রতিশব্দ হোক তার প্রেম। কোনো অসতর্ক ছত্রেও তার কবিতায় যেন আমি ছাড়া অন্য কোনো মেয়ে স্থান না পায়। আমি আইনস্টাইন বা বোধিসত্ত্বকে চাইনা। আমি মিলস অ্যান্ড বুনস রোমান্সে বিশ্বাসী নই। আমি দানব বা দেবতার বক্ষলগ্না হবার স্বপ্ন দেখি না। আমি একজন মানুষকে চাই। নারীবাদী, সাম্যবাদী হৃদয়বান একজন মানুষ। হাওয়ার্ড ফাস্টের স্পার্টাকাসের মত। অথবা অনুরাধার কোবাড ঘান্ডী। কিংবা বেলা দত্তের সরোজ। আমি সেই পুরুষকে চাই না যে আমার বিনিদ্র রাত্রির কারণ হোক, আমি তাকে চাই বিছানায় মায়ের মত আমাকে ঘুম পাড়াবে। আমি যা যা চাই, কাজলবাবু তার বিপরীত ছিলেন। কারো চোখে দেবতা, আমার চোখে দানব। আর অতিমানব বা মহাপুরুষদের প্রতি আমার অ্যালার্জি আছে।

উপসংহার

"আমি বিদ্রোহী ভৃগু, ভগবান বুকে এঁকে দিই পদ-চিহ্ন,
আমি স্রষ্টা-সূদন, শোক-তাপ-হানা খেয়ালী বিধির বক্ষ করিব-ভিন্ন!
আমি চির-বিদ্রোহী বীর -
আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির-উন্নত শির!"

শ্রীরামচন্দ্র হাতে শুদ্রের রক্ত মাখার পরও তাঁর দেবত্বের ভাবমূর্তিতে একফোঁটা চিড় ধরে না। বরং শুদ্রের বিধবার উপর এক শ্রেণীর লোক থুতু ফেলে যায়, কারণ হাহাকারের শব্দে সে তাদের বিব্রত করার স্পর্ধা দেখিয়েছে। অযোধ্যাবাসীরা রাজতন্ত্রের ভয়ে, ভক্তিতে অথবা স্রেফ শুদ্রবিদ্বেষের কারণে শুদ্রসাধকের চিতার ধারেকাছেও ঘেঁষে না। রামচন্দ্র যুগ যুগ ধরে বিনাপ্রশ্নে পূজিত হয়ে আসেন।

অর্জুনের মান রাখতে একলব্যের বুড়ো আঙুল ছিনিয়ে নিয়েও দ্রোণকে একলব্যের প্রেতাত্মা হন্ট করে না। কারণ দ্রোণরা মানুষ নন, এবং আখেরে কৌরবের পাশেই গিয়ে দাঁড়াবেন।

তাই দ্রোণর মুখোমুখি হতে একলব্য নয়, আম্বেদকরও নন বরং প্রস্তুত হোক একটা 'হুল'। তাতে অর্জুন, দুর্যোধন সহ পান্ডব, কৌরব সব পক্ষ নিশ্চিহ্ন হয়ে যাক(ভীম ছাড়া)। দ্রোণের মাংসের কোর্মা রান্না করে দ্রোণাশ্রু মেশানো সুরার সাথে তা একলব্যের কমরেডদের মধ্যে পরিবেশিত হোক। তখনই একলব্যের আত্মা শান্তি পাবে। প্রত্যেকটা অফিসে, স্টুডিওয়, কারখানায়, চাষের জমিতে, ঠিকাদারের চুক্তির কর্মক্ষেত্রে, জেলখানায়, ব্রথেলে এবং শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে তৃষ্ণারা একলব্যের শাহাদাতের নামে হুলের সূচনা করুক। অপর্ণার মত রেনিগেডদের জন্যও দরজা

খোলা রইল। কারণ তৃষ্ণারা কমরেডশিপে বিশ্বাস রাখে। তৃষ্ণারা বিশ্বাস করে যে মার্শাল চুতে একদিন প্রতিক্রিয়াশীলদের দালাল থেকে বিপ্লবীতে পরিণত হবেন।

*পুনশ্চ:এটা একটা কাল্পনিক ঘটনা। মার্ক্সবাদ, আলথুজার, হলোকাস্ট আর চারু মজুমদার বাদে আর সব কিছু কাল্পনিক। তৃষ্ণা কাল্পনিক, কাজলবাবুর চরিত্র এতটাই দেবত্বপ্রাপ্ত যে তাঁকে দেখলেও কাল্পনিক বলেই ভ্রম হয়। তৃষ্ণার অভিযোগগুলোও কাল্পনিক। শুধু একটাই কথা, কাজলবাবুর মেয়ের সাথেও এই কাল্পনিক ঘটনাগুলোর পুনরাবৃত্তি হোক। কাজলবাবু তৃষ্ণার সাথে যা করেছেন সেটা অন্য কোন ক্ষমতাশালী বৃদ্ধের কাছ থেকে তাঁর মেয়েরও পাওনা হোক। যদি তৃষ্ণার অভিযোগগুলো মিথ্যে হয়, তাহলে তো মিটেই গেল। যদি মিথ্যে না হয় তাহলে কাজলবাবু বুঝুন নারীমাংস খাদ্য নয়। এক্স এক্স ক্রোমোজোমের মানুষের চোখের জল মানেই পানীয় নয়।

* সব চরিত্র ও ঘটনা কাল্পনিক। কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানকে হেয় করার উদ্দেশ্যে গল্পটি লেখা হয়নি। যদি কোনো জীবিত বা মৃত ব্যাক্তির সাথে মিল পাওয়া যায় তা নেহাতই কাকতালীয়।

বেঁচে থেকে

দেবীস্মিতা দেব

অক্টোবর ১৫, ২০১৭

বেঁচে থেকে কী আর লাভ বলো?
সেই তো রোজ
বুড়ো শালিকের রোজনামচা।
শীতকালের সেই পাতা ঝরে পড়া।
মঞ্জরী, বিতান কিংবা তিতাসদের
সেই পাশ বা ফেলের খবর।
চটজলদি তৈরি করে নেওয়া
রোজকার বাজারফর্দ।

ঐ একই কাসুন্দি ঘাটতে ঘাটতে
জন্ম মৃত্যু বিবাহ কি অন্নপ্রাশনের
খবর শুনে, হেসে কিংবা কেঁদে
আবার নতুন করে টাল সামলে নেওয়া।

বসন্তে আবার জানি কোকিল গাইবে গান।
উঠবে কালবৈশাখীর ঝড়।
আমার সর্বাঙ্গ হয়তো আবার
ভরে উঠবে জ্বালা যন্ত্রণায় –
মুখে কুলুপ এঁটে সইতে হবে সব।
তারপর জানি বৃষ্টি নামবে।
একটা বছরের আবারও হবে অবসান।

অনভিজ্ঞতাগুলো কুড়োতে কুড়োতে
আর কত মাইল হাঁটতে হবে!
আমার থেকে পৃথিবীর যেটুকু পাবার

তার সবটুকু তো নিঙড়ে নিয়ে নিয়েছে সে।
কোনও কৃপণতা তো করিনি কখনও।

তবু কেন এখনও বাঁচিয়ে রাখল আমায়?
বেঁচে থেকে কী বা লাভ বলো?
তবে কি এখনও আমার কাছ থেকে
আরো, আরও অনেক কিছু
পেতে চায় সে?

উপস্থিতি

তৃতীয় পাণ্ডব

ডিসেম্বর ২৮, ২০১৬

দেওয়াল ঘড়িতে নটা বাজল ঢং ঢং করে।

চমকে ঝিমুনিটা কেটে গেল স্বাতীর। দেখেছ, এখনো বাড়ি ফেরেনি মেয়েটা! কতবার বলেছে, বাপী বাড়ি ঢোকার আগে ফিরে এসো, যেখানেই যাও। অথচ আর কিছুক্ষনের মধ্যেই বাড়ি ফিরবে অংশুমান। মেয়েকে না দেখতে পেলে কুরুক্ষেত্র বাঁধাবে আজ।

গায়ে চাদরটা ভালো করে জড়িয়ে ব্যালকনিতে আসে স্বাতী। শীতটা এবার বেশ জাঁকিয়ে পড়েছে কিন্তু। রেলিঙ ছুঁয়ে থাকা রাধাচূড়া গাছটার মাথায় এখন কুয়াশার ঘরবাড়ি। রাস্তার রাতআলো গুলোও কেমন ঢুলছে একপায়ে দাঁড়িয়ে। সবে রাত নটাতেই তাদের এই অশোক কলোনীতে মধ্যরাতের নিস্তব্ধতা। একটা লোক নেই গলিতে। মাঝে মাঝে শুধু এক দুটো রিক্সা ঢিমেতালে যেতে যেতে জমাট কুয়াশাতে মিশে যাচ্ছে বিদেশী ভূতের সিনেমার মত। শীতে জবুথবু রাস্তার কুকুর গুলো পর্যন্ত চেঁচাতে ভুলে গেছে। আজকাল বাড়ি লাগোয়া খেলার মাঠটাও বড্ড তাড়াতাড়ি চুপচাপ হয়ে যায়।

ঠিক তখনই ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা নিঃশ্বাসটা টের পেল স্বাতী। শিরদাঁড়া বেয়ে একটি বরফের কিউব নেমে গেল না চাইতেই। খুব ভাল করে জানে, ঘাড় ঘোরালে কাউকেই দেখতে পাবে না। গত কদিন ধরেই হচ্ছে এটা। বাড়ি ফাঁকা হলেই কাউকে স্পষ্ট অনুভব করে সে। কে জানে মনের ভুল কিনা। কেউ যেন সবসময় তাকে দেখতে থাকে, দেখা না দিয়ে । গভীর রাতে হঠাৎ ঘুম ভেঙে মনে হয়েছে, পাশের চেয়ারটাতে বসেছিল কেউ একটু আগেও, তাকিয়েছিল তার ঘুমন্ত মুখটার দিকে, অপলক। অদ্ভুত একটা অনুভূতি। অংশুমান বা মিতিনকে বললে হয়ত কালই সাইকিয়াট্রিস্টের কাছে নিয়ে যাবে।

সত্যি বলতে, ব্যাপারটা খুব খারাপ লাগে না স্বাতীর। সকাল নটার পর এত বড় বাড়িটাতে যখন হঠাৎ করে একা হয়ে যায়, তখন এই অশরীরী উপস্থিতিটা একরকম স্বস্তিই দেয় তাকে। ভয় পাওয়ার বদলে, একটা গা ছমছমে ভালোলাগা জড়িয়ে ধরে চারপাশ থেকে। বাবা, মেয়ের এই ব্যস্ত রুটিনে মানিয়ে নিতে নিতে, নিজের কোনও আলাদা জগত গড়ে তোলার ফুরসত পায়নি আর। তাই, তার মধ্যেই যখন পাশের বাড়ির অনিকেতের বছর পঁচিশের আঙুলগুলো, খবরের কাগজ চাইতে আসার অজুহাতে অল্প ছুঁয়ে যায় তার দশ বছর বেশি পুরোনো হাত... বা, রাস্তা চলা কোনও অপরিচিত চোখ দুপুরের ফাঁকা ব্যালকনিতে তাকে খোঁজে, ভালোই লাগে তার। টুকরো টুকরো খুশীর মেঘ জমে মনের কোণে... চারদিক ভাসানো বর্ষার মেঘ হয়ত নয়, কিন্তু শান্ত শীতল গোধূলি-ছায়া ফেলে অল্প, সেটা সত্যি।

ডাইনিংএর ঘড়িটার দিকে চোখ যায়। যাচ্চলে সাড়ে নটা পেরিয়ে গেল। এখনও অংশুমান বা মিতিনের টিকির দেখা নেই। বরের ফোনে ট্রাই করে সুইচড্ অফ পেল, মেয়ের ফোনে রিঙ হয়ে যাচ্ছে। আচ্ছা আক্কেল এদের যাইহোক! সত্যি, তার কথা ভাবার কেউ বোধহয় নেই। আগের শীতে বাবা চলে গেল, একরকম হঠাৎ করেই। মায়ের মুখটা মনে পড়েনা আর। তার যখন বছর পাঁচেক বয়স, বাবার বেস্ট ফ্রেন্ড হিতেনকাকুর সাথে চলে যায় মা। তারপর থেকেই বাবা কেমন চুপচাপ, নিজের মধ্যে গুটিয়ে গিয়েছিল। সংসারে থেকেও যেন বহুদূরের একটা মানুষ। মাঝে মাঝে খুব খারাপ লাগত স্বাতীর। চেষ্টাও কম করেনি বাবাকে মূলস্রোতে ফেরানোর। না পেরে, অভিমানে একসময় নিজেই দূরে সরে এসেছে। কিন্তু বাবা একেবারে চলে যাওয়ার পর, আরো একা হয়ে গেছে সে। লোকটা বেশী কিছু না বলুক, শুনত তো সব, তার যত রাগ, দুঃখ, অভিমান সব চিৎকার করে বের করে দিত। আর তার দীঘির জলের মত শান্ত বাবা শুধু চুপ করে দেখত তাকে। এখন মনে হয়, সেটাই অনেক ছিল। হঠাৎ করে শীত করতে থাকে তার।

এমন সময়, গেটের সামনে একটা গাড়ির হেডলাইটের আলো। মিতিন, না? দেবরূপ, ওর ক্লাসমেটটা ড্রাইভিং সীটে। একনম্বরের বখাটে ছেলে একটা। হঠাৎ বড়লোক বাপের ছেলে হলে যা হয়। নিচে গিয়ে সদর দরজা খুলে দাঁড়াল স্বাতী। মেয়ে গাড়ির জানালায় মুখ নামিয়ে হেসে হেসে কিছু বলছে। তার আওয়াজ পেয়ে চুপ করে গেল। এগিয়ে এল বাড়ির দিকে।

- কিরে! এতক্ষন কোথায় ছিলি? ফোন ধরছিলি না কেন?

- রূপের বাড়িতে। উফ্ফ মা, দরজা থেকে সরো তো! ভীষন টায়ার্ড লাগছে, শুতে গেলাম।

- ডিনার করবি না?!

- খেয়ে এসেছি...

- আর এতগুলো রান্না? বলতে পারলি না খেয়ে আসছিস?

- ফ্রীজে তুলে রাখো

- তোর বাবার ফোনটাও এদিকে সুইচড্ অফ...

- ও, বাপী তোমায় বলেনি? ভুলে গেছে দেন। বাপীর আজ ফিরতে রাত হবে। অফিস পার্টি! বলতে বলতে স্বাতীকে পেছনে ফেলে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে লাগল মিতিন। সেই ছোট্ট মিতিন, আজ কত বড় হয়ে গেছে! স্বাতী তাকিয়ে দেখতে থাকল, মেয়ের উঠে যাওয়া... আরো শীত করছে তার, খুব শীত...

আবার সেই পুরোনো ব্যালকনি। মেয়ের ঘরের দরজা বন্ধ। ভেতর থেকে হাসির আওয়াজ আসছে। কথা বলছে ফোনে। খাবারগুলো ডাইনিং টেবিল থেকে উঠিয়ে রাখতেও ইচ্ছে করছে না। শরীর জুড়ে অদ্ভুত এক ক্লান্তি! বাবার কথা খুব মনে পড়ছে, সমুর কথাও... যেদিন প্রথম অংশুমানের পরকীয়ার হাতেনাতে প্রমাণ পেয়ে কেঁদে কেটে ঝগড়া

করে, বছর দুয়েকের মিতিনকে সাথে নিয়ে শিমূলতলায় বাবার কাছে এসে উঠেছিল... অথবা, কলেজে পড়ার সময় এক মেঘলা বিকেলে হঠাৎ যখন খবর পেল, সমুর বাইক অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে.. যার সাথে ঘর বাঁধার স্বপ্ন দেখত শিমূলতলার পুরোনো মসজিদ লাগোয়া পোড়োবাড়িটার ছাদে শুয়ে, দুজনে মিলে হেমন্তের শিশিরে ভিজতে ভিজতে... সমু চলে যাওয়ার পরে তো নিজের ভাঙা টুকরো গুলো জোড়াতালি দিয়ে আবার কোনওভাবে ঘুরে দাঁড়ানো। বাবা কিন্তু সব বুঝত, বেশি কিছু না বললেও। কারো সাতে পাঁচে না থাকা চুপচাপ একটা লোক... শীতের নির্মল, আদিগন্ত, ঠান্ডা আকাশের মত চুপচাপ লোকটা।

বেশ হাওয়া দিচ্ছে... সামনের রাধাচূড়া গাছ থেকে শুকনো পাতাগুলো উড়ে পড়ছে রাস্তায়, স্ট্রীটলাইটের আলোর বৃত্তে.. একটা মায়াবী মূহুর্ত, খুবই অল্প সময়ের জন্য হয়ত... স্বাতীর চোখের কোণে কয়েক টুকরো মনখারাপ চিকচিক করে ওঠে।

আর ঠিক তখনই, ঘাড়ের কাছে ঠান্ডা নিঃশ্বাসটা ফের টের পেল সে। ঘাড় না ঘুরিয়েও বলে দিতে পারে, কেউ একজন তাকে দেখছে, একদৃষ্টিতে।

পাহাড়ের ডায়েরি

অতনু, শ্রীরূপা ও অতিথি লেখক

এপ্রিল ১৮, ২০১৭

এবারের অতিথি তিনজন। অনির্বান সেনগুপ্ত পেশায় একটি নামী ফুড প্রসেসিং কোম্পানির মার্কেটিং ম্যানেজার। নেশা ছবি আঁকা, এসরাজ বাজানো আর সুযোগ পেলেই পাহাড়ে ট্রেকিং এ বেরিয়ে পড়া। একাধিক পত্রিকায় ছবি আঁকা ছাড়াও ২০১৭ বইমেলায় প্রকাশিত শঙ্কুমামার " বইটির প্রচ্ছদ ও অলঙ্করণ করেছেন। সোহম "কাগুকারখানা ব্যানার্জি পেশায় সফটওয়ার ডেভেলপার ও বিজনেস অ্যানালিস্ট। নেশা (বব) সিনেমা দেখা, বই পড়া, টুকটাক লেখা ও বেড়ানো। পল্লব দত্ত পেশায় ফিজিক্সের শিক্ষক। নেশা কবিতা লেখা, সঙ্গীতচর্চা ও আরো অনেক কিছু। পশ্চিম সিকিমের একটি ট্রেকিং এর অভিজ্ঞতা তাঁরা চর্যাপদের পাঠকদের সঙ্গে শেয়ার করছেন।

১

কুমারের কপচানি

শিলিগুড়ি থেকে প্রায় ৭০-৮০ কিলোমিটার যাওয়ার পরেও যখন একটা হালকা ঠাণ্ডা হাওয়ার বেশী কিছু পাচ্ছিলাম না তখন তেড়ে গাল দিচ্ছিলাম অনির্বাণ কে। আমাদের টিম লিডার তো সেইই। ধুয়োটা অবশ্য তুলেছিল পল্লব। "সিকিমে হিলে-ভার্সে বলে একটা জায়গা আছে; যাবি নাকি?" ৬ জন হাত তুললাম। পরে অবশ্য ২ জন ছেঁটে গেল। রইলাম বাকি ৫। আমি (অতনু), পল্লব, অনির্বাণ, বব আর আমার সহধর্ম্মিণী শ্রীরূপা। আমাদের মধ্যে অনির্বাণ ছাড়া ট্রেকিং এ সবাই নবিশ। তো অনির্বাণ আগে থেকেই বলে রেখেছিল, "ওখানে কিন্তু হেব্বি ঠাণ্ডা, ভালো করে গরম জামাকাপড় নিয়ে নিবি।" সেইমত এপ্রিলের গরমে বাক্সয় ঢুকে যাওয়া শীতের জামাকাপড় বের করে ব্যাগ ভর্তি করেছি। এখন শীতের এই চেহারা দেখে কার না মাথা গরম হয়? অনির্বাণের উপদেশের মাহাত্ম অবশ্য পরে টের পেয়েছিলাম হাড়ে হাড়ে। আক্ষরিক অর্থেই!

এনজেপি স্টেশনে আমাদের ট্রেন ঠিক সময়েই পৌঁছেছিল। তারপর রিটায়ারিং রুমে একটু হালকা হয়ে যখন সাগরভাইয়ের গাড়িতে উঠলাম তখন সকাল সাড়ে নটা। শিলিগুড়ি শহর পেরিয়ে তিস্তার পাশ দিয়ে পাক খেয়ে খেয়ে পাহাড়ে উঠলাম। ধাপে ধাপে বাড়িঘরগুলো ছোট হয়ে এলো। পুলিস চেকপোস্ট পেরিয়ে পশ্চিমবঙ্গ থেকে সিকিমে ঢুকলাম। তিস্তা ও রঙ্গিতের সঙ্গমস্থলে দাঁড়িয়ে কিছু ছবিটবি তুললাম। সাগরভাই মাঝেমধ্যেই গাড়ি দাঁড় করিয়ে কিছু জিনিসপত্র তুলছিলেন, আবার সেগুলোকে তাদের গন্তব্যস্থলে নামিয়ে দিচ্ছিলেন। রাস্তার ধারে সুন্দরী নেপালি মহিলাদের হাত নাড়া দেখে বোঝা গেল সাগরভাই এখানে বেশ পপুলার। অনেকটা রাস্তা, সবারই ছোটবাইরে যাওয়ার প্রয়োজন। আমরা ছেলেরা যেকোন জায়গায় কাজ সারতে পারি, কিন্তু সঙ্গে একটা মেয়ে আছে। সাগরভাইকে বলতে তিনি আশ্বস্ত করলেন। খানিকবাদে গাড়ি দাঁড়ালো ঝাঁ চকচকে একটা বিশাল মন্দিরের সামনে। কিন্তু আমাদের তো মন্দির দর্শনের কোন বাসনা ছিল না। সাগরভাই বললেন "অন্দরমে টয়লেট ভি হ্যায়!" আহ! নাস্তিক হিসেবে মন্দিরের উপযোগিতা এই প্রথম উপলব্ধি করলাম। জায়গাটার নাম দরমদিন। ফেরার দিন এই সাগরভাই-ই আমাদের এনজেপি নিয়ে যাবেন। আর আমরা নিজে থেকেই তাঁকে বলব, "উও মন্দিরমে থোরা রোক দিজিয়ে না, টয়লেট যানা হ্যায়!"

হিলে তে যখন পৌঁছলাম তখন ৬টা বাজে। সূর্য ডুবে গেছে, তবু কিছু আলোর আভা রয়েছে। যেখানে গাড়ি থামল তার সামনে জঙ্গল, পরে জেনেছি ওটাই ভার্সে যাওয়ার পথ। বাঁদিকে একটু উঁচুতে সার দিয়ে চারটে কুঁড়েঘর। এগুলোই আপাততঃ আমাদের মাথা গোঁজার ঠাঁই। আর ডানদিকে নিচে একটা ফাঁকা জায়গা। সেখানে আর্মির ক্যাম্প বসেছে। আমাদের মধ্যে বব ঘোর দেশপ্রেমিক। ইন্ডিয়ান আর্মি দেখেই ভীষণ উত্তেজিত হয়ে সে ক্যাম্পে দর্শন দিতে যাচ্ছিল। কিন্তু এক কর্তব্যরত জওয়ান নিষেধ করলেন। আর্মি ক্যাম্পে যাওয়া আর ছবি তোলা দুটোই বারণ। পাঁচটা কুঁড়েঘরের মধ্যে দুটো থাকার জায়গা, দুটো রান্নাঘর। শেষে একটা টয়লেট। ঘরে ১৫-২০ জন লোক স্বচ্ছন্দে থাকতে পারে। আপাততঃ একটা ঘর আমাদের পাঁচজনের দখলে। ঘরে বসতে না বসতেই ড্রাগন আঁকা সুদৃশ্য চিনামাটির কাপে ধোঁয়া ওঠা অদ্ভুত স্বাদের লিকার চা আর প্লাস্টিকের বাটিতে ম্যাগি চলে এলো। এখানে জলখাবার হিসেবে ম্যাগি বেশ চলে। আসলে যদিও ম্যাগি নয়, ওয়াই ওয়াই।

এই প্রথম ট্রেকিং এ যাচ্ছি, সবার বাড়িতেই চিন্তা আছে। কিন্তু পৌঁছানোর খবর দেবো কি করে? নেটওয়ার্ক কখন হাপিস হয়ে গেছে। এই "ট্রেকার্স হাট" আর আর্মি ক্যাম্প ছাড়া এলাকায় জনমানবের চিহ্ন নেই। রাস্তাটা ধরে একটু উঠে এক নেপালি মহিলাকে দেখে হিন্দিতে জিজ্ঞাসা করলাম, এখানে কোন ল্যান্ডলাইন আছে কি না। তিনি কি বুঝলেন কে জানে, বাঁদিকে হাত দেখিয়ে বললেন, "ওই ল্যাম্পপোস্টের কাছে চলে যান।" কিন্তু ল্যাম্পপোস্ট পেরিয়ে কয়েক হাত এগিয়েও কিছু চোখে পড়ল না। একটু ওপরে সামান্য আলো আর একজন মানুষকে দেখে একই প্রশ্ন করতে তিনি পালটা জিজ্ঞাসা করলেন, "ভোডোফোন?" আমরা হ্যাঁবাচক মাথা নাড়তে তিনি আবার ঐ ল্যাম্পপোস্টটাই দেখিয়ে দিলেন। সেই ল্যাম্পপোস্টের তলায় দাঁড়াতেই কি আশ্চর্য! দিব্যি টাওয়ার পাওয়া যাচ্ছে! চটপট যে যার বাড়িতে জানিয়ে দিলাম ঠিকঠাক পৌঁছেছি। আর এ কদিন ফোনে যোগাযোগ করা সম্ভব নাও হতে পারে।

যত রাত বাড়তে লাগল ঠাণ্ডা কাকে বলে বুঝতে পারলাম। পরের দিন ১০০০০ ফুট উঁচ্চতায় ভার্সেতে কি হতে চলেছে তারও একটা আঁচ পেলাম। ফুলশার্টের ওপর ফুল সোয়েটার, জ্যাকেট, মাথায় মাফলার, টুপি পরেও কাঁপুনি থামানো যাচ্ছিল না। তার ওপর টয়লেট যেতে হবে দুটো ঘর পেরিয়ে। ঘরে টিমটিম করে একটা বাল্ব জ্বললেও বাইরে কোন আলো নেই। যে টর্চটা এনেছিলাম সেটা বিগড়ে গেছে। বড়বাইরে পেলে অতএব মোবাইলই ভরসা! হাতে গড়া রুটি, সেদ্ধ না হওয়া ফুলকপি আর ছালশুদ্ধু মুরগির মাংসের ঝোল দিয়ে নৈশাহার সেরে সোয়েটারের ওপর কম্বল চাপা দিয়ে শুয়ে পড়লাম। পরদিন সকালেই ট্রেকিং শুরু হবে। পল্লব ভূতের গল্প শুরু করল। শুনতে শুনতে ঘুমে তলিয়ে গেলাম।

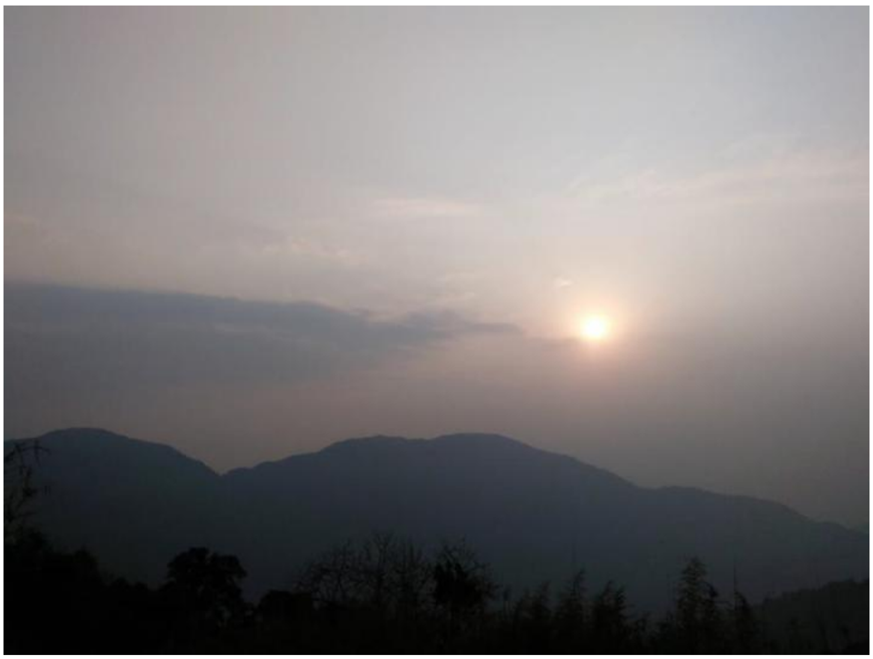

২

কুমারের কপচানি

চোখে আলো এসে পড়তেই ঘুম ভেঙে গেল। বাইরে বেরিয়ে এলাম। দূরে পাহাড়ের মাঝ দিয়ে উঠে আসছে সূর্যমামা। আকাশে হালকা মেঘ রয়েছে। ঠাণ্ডা ভালোই, কিন্তু পাতলা রোদ আবহাওয়াটাকে আরামদায়ক করে দিয়েছে। আর্মি ক্যাম্পের জওয়ানরা প্রাতঃকালীন শরীরচর্চায় ব্যস্ত। দুজন দেখলাম জঙ্গল থেকে বেরিয়ে এলেন কাঁধে কাঠকুটো নিয়ে। এখানে রান্নাবান্না চলে কাঠের উনুনেই। পাশেই একটা একটু বড় তাঁবু থেকে মাঝে মাঝেই মেয়েলি গলায় হিন্দি গানের কলি ভেসে আসছিল। ওখানেই বোধহয় রান্নার কাজ চলছে। ট্রেকার্স হাটের হোস্টরা তাঁদের কাজকর্ম শুরু করে দিয়েছেন। একে একে দলের অন্যরাও উঠে পড়েছে। ম্যাগি আর চা দিয়ে ব্রেকফাস্ট সেরে রেডি

হয়ে নিলাম। আমাদের গাইড নিম দরজিও এসে গেছেন। সবার জন্য বাঁশের লাঠিও তৈরী হয়ে গেল। এবার শুরু হবে ট্রেকিং।

সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে হিলের উচ্চতা ৯০০০ ফুট আর ভার্সের ১০০০০ ফুট। অর্থাৎ হিলে থেকে ভার্সে এক হাজার ফুট উঁচুতে। আর জঙ্গলের মধ্য দিয়ে পায়ে চলা পথে দুরত্ব সাড়ে চার কিলোমিটার। ক্যালকুলেটার খুলে বসলে সহজেই বের করে ফেলতে পারবেন এই পথের গড় নতি কত। তবে করে লাভ নেই। কারণ Welcome to Barsey Rhododendron Sanctuary লেখা গেট দিয়ে ঢুকলে ঐসব অঙ্ক মাথা থেকে বেরিয়ে যাবে। একদিকে উঠে গেছে পাহাড়, অন্যদিকে নেমে গেছে খাদ। দুধারে পাইন, বাঁশের আর কত নাম না জানা গাছের বন। পাহাড়ের গা বেয়ে ছোটো ছোট ঝোরা নেমে এসেছে। পাতা খসে যাওয়া বাদামি পাইন গাছ, হলদে সবুজে মেশানো বাঁশঝাড়, পাথরের গায়ে গজিয়ে ওঠা ফার্ণ জাতীয় উদ্ভিদের সবুজ পাতা, নানা রঙের বুনো ফুল আর পাতার ফাঁক দিয়ে গলে আসা সূর্যের রশ্মি – সব মিলিয়ে একটা অপরূপ ক্যানভাস প্রকৃতি সাজিয়ে রেখেছে পদযাত্রীদের জন্য। যত ওপরে ওঠা যাচ্ছে ততই সেই ক্যানভাসে ফুটে উঠছে থরে থরে সাজানো রডোডেনড্রন। তাদের রঙ কখনো টকটকে লাল, কখনো গোলাপি, কখনো ফ্যাকাশে লাল আবার কখনো বা ধপধপে সাদা। কোথাও কোথাও জঙ্গল একটু পাতলা, একধারে খাদের বদলে বিস্তীর্ণ ঘাসের উপত্যকা। তার মধ্যে রডোডেনড্রনের গুচ্ছ, পেছনে পাহড়ের সারি। পথের ধারে ধারে বন দফতরের সাইনবোর্ড জানাচ্ছে এই অরণ্য হিমালয়ান রেড পাণ্ডাদের আবাসস্থল। বাঁশপাতা ভোজী এই লাজুক বেড়ালটা পৃথিবীর বিপন্ন প্রাণীদের তালিকায় অন্যতম। এছাড়া আছে জায়েন্ট স্কুইরেল বা উড়ুক্কু কাঠবেড়ালি।

আমাদের মধ্যে অনির্বাণ ট্রেকিং এ অভিজ্ঞ, আর ববের ফিটনেস, এনথু দুটোই অপরিসীম। ওরা এগিয়ে যাচ্ছিল লাফিয়ে লাফিয়ে। আমি আর শ্রীরূপা যাচ্ছিলাম থামতে থামতে, ছবি তুলতে তুলতে। পল্লবও আমাদের সঙ্গেই যাচ্ছিল। আর নিম দরজি তো একটা পা গলানো চটি আর হাতকাটা জ্যাকেট পরে, কাঁধে দুটো কম্বল নিয়ে হাঁটছিলেন। রাস্তার বাঁকে বাঁকে আমাদের জন্য অপেক্ষা করছিলেন। রাস্তায় প্রচুর লোক ট্রেক করছিল আমাদের আগে-পরে, বুঝলাম ভার্সে হিলের মত জনমানবশূণ্য হবে না। দমদম থেকে এক বাঙালী ভদ্রলোক স্ত্রী ও শ্যালক কে নিয়ে যাচ্ছিলেন। তিনি আগে অনেক ট্রেক করেছেন। আমাদের বললেন, ''আপনাদের তো পাক্কা ট্রেকার মনে হচ্ছে!" আমরা তো শুনে হাঁ! এটা আমাদের প্রথম ট্রেক শুনে অবাক হলেন। "আসলে যারা নতুন ট্রেক করে তারা তড়বড় করে এগিয়ে যায়। আর পাকা ট্রেকাররা সময় নিয়ে চারপাশ টা দেখতে দেখতে যায়!" চড়াই উৎরাই থাকলেও এমনিতে রাস্তাটা কঠিন কিছু নয়। দশ বছরের বাচ্ছা থেকে ষাট বছরের বৃদ্ধ সকলেই যেতে পারবেন – যদি শরীর সুস্থ থাকে, শ্বাসকষ্টর সমস্যা না থাকে। স্থানীয় মানুষের কাছে তো এগুলো কোন ব্যাপারই নয়। নিম দরজি বললেন এই রাস্তাটা হাঁটতে ওনার একঘন্টা লাগবে। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একটা শর্টকাট রুট দেখালেন, যেটা দিয়ে চটপট সোমবেরিয়া যাওয়া যায়। সোমবেরিয়া এ অঞ্চলের নিকটবর্তী গঞ্জ টাইপের জায়গা। আমরা যেতে পারব কি না জিজ্ঞেস করতে হেসে মাথা নাড়লেন। তবে এখানে চিতাবাঘ আছে। তাই রাতের দিকে একা কেউ চলাফেরা করে না।

আমরা যখন পাহাড়ের মাথায় পৌছলাম তখন বারোটা বেজে গেছে। রাতে আমাদের মাথা গোঁজার জায়গা হল "গুরস কুঞ্জ"এ। তবে ঘরে নয় তাঁবুতে থাকার ব্যবস্থা হয়েছে। "গুরস" রডোডেনড্রনের নেপালি প্রতিশব্দ। নেপালি সংস্কৃতিতে রডোডেনড্রনের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা আছে। নেপালের জাতীয় ফুল যেমন রডোডেনড্রন, ভারতের সিকিম রাজ্যের প্রাদেশিক বৃক্ষও তেমনি রডোডেনড্রন। আগেই বলেছি রডোদেনড্রন নানা রঙের হয়। এর হাজারের কাছাকাছি প্রজাতি আছে। এশিয়া, ইউরোপ, উত্তর আমেরিকার নানা জায়গায় পাওয়া গেলেও প্রজাতির বৈচিত্র্য সবচেয়ে বেশী হিমালয় পর্বতমালা অঞ্চলে। বিভিন্ন প্রজাতির আলাদা আলাদা নেপালি নাম আছে কি না জানিনা। তবে সাদা সাদা রডোডেনড্রনের নেপালি নাম শুনলাম "চিমল"। ফুলের শোভা মন ভরে দেখতে গেলে পাহাড়ের ওপর উঠতেই হবে। রডোডেনড্রন ছাড়াও নাম না জানা নানা রঙের ফুলের মাঝে এই লজটির "গুরস কুঞ্জ" নাম তাই এক্কেবারে সার্থক।

সে দিনটা গুডফ্রাইডের ছুটি ছিল। তাছাড়া আকাশ একদম পরিস্কার। প্রচুর লোক ঘুরতে এসেছেন। বাঙালী যেমন আছে তেমনি সিকিমের স্থানীয় মানুষও আছে। এনাদের বেশীরভাগই দিনের বেলাটা কাটিয়ে নেমে যাবেন, বাকিরা এখানেই রাত্রিবাস করবেন। একজন দক্ষিণ ভারতীয় হাতে বিশাল লম্বা একটা ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছিলেন। পল্লব বলল উনি পক্ষীবিদ, এত লোকের কলরবে পাখি পাওয়া যাবে না বুঝে তিনি জঙ্গলের দিকে চলে গেলেন। মোটা চালের ভাত, বরবটির তরকারি আর ডিমের ঝোল দিয়ে লাঞ্চ সেরে সামনের খোলা জায়গায় ঘাসের ওপর এলিয়ে পরলাম। ঠাণ্ডার মধ্যে রোদ পোহানোর মজা আর কিছুতে নেই। একদল স্থানীয় ছেলেমেয়ে নেপালি গান বাজিয়ে নাচছে, এক বৃদ্ধও যোগ দিয়েছেন তাদের সঙ্গে। বাঙালী ট্যুরিস্টরা কেউ ক্যামেরা নিয়ে ঘুরছে, কেউ দল পাকিয়ে গুলতানি মারছে। এক সদ্যবিবাহিত দম্পতি নিজেরাই তাঁবু খাটানো শুরু করে দিয়েছে। অনির্বাণ পড়ে আছে গুরস কুঞ্জের ম্যানেজার পাসাং শেরপার পেছনে। আমাদের তাঁবুগুলোও এইবেলা খাটিয়ে নিতে হবে।

পাসাংএর বাড়ি নেপাল সীমান্তের কাছে বস্তিতে। তিনি কলকাতায় এসে হসপিটালিটি ম্যানেজমেন্টের কোর্স করে গেছেন। বললেন, "হাওড়া স্টেশনে নেমে তো 'যাত্রীগণ কৃপেয়া ধ্যান দে' আর 'for your kind attenstion please' শুনে তো কান ঝালাপালা হওয়ার জোগাড়! আর কত লোক, বাপরে!!" গুরস কুঞ্জে তাঁর অতিথিও অবশ্য কম নয়। তাদের একেক জনের একেক রকম চাহিদা সামলাতে গিয়ে নাজেহাল হচ্ছিলেন। শেষে বলেই বসলেন, "আপনাদের সমতলের লোকেদের সবাইকে তো একই রকম দেখতে, তাই গুলিয়ে ফেলছি!" আমরা যে উত্তরপূর্ব ভারতের মানুষদের চীনেদের মত দেখতে বলি এটা কি তারই পালটা ভাষ্য? জিজ্ঞাসা করা হল না। বিকেলের আগেই তাঁবু রেডি হয়ে গেল। আমদের দুজনের জন্য একটা ছোট্ট তাঁবু খাটানো হল গুরস কুঞ্জের চত্বরে। ওদের তিনজনের তাঁবুটা একটু বড়। পাসাংজি সেটা খাটিয়ে দিয়ে এলেন চত্বরের বাইরে বন দফতরের এলাকায়।

সূর্য ডুবতেই ঠাণ্ডাটা জাঁকিয়ে বসল। সঙ্গে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি। হাতে গ্লাভস, পায়ে মোজা, তবু হাত পা যেন অসাড় হয়ে যাচ্ছে। শ্রীরূপা দুটো সোয়েটারের ওপর অনির্বাণের একটা কম্বল চাপিয়ে বসল। সবচেয়ে ছড়িয়েছে পল্লব। একটা ফিনফিনে পাঞ্জাবী পরে সে পাহাড়ে পয়লা বৈশাখ উদযাপন করতে এসেছে। ব্যাগে নিয়েছে একটা সোয়েটার আর একটা মাফলার। শেষে অনির্বাণের একটা জ্যাকেট আর আমার একটা হনুমান টুপি পড়ে সামাল দিল। যারা ছিলাম সবাই গুরস কুঞ্জের বড় ডাইনিং হলে এসে আশ্রয় নিলাম। এখানে ইলেকট্রিসিটির কোন গল্প নেই। কেবল সূর্যাস্তের পর থেকে রাতের খাওয়াদাওয়া হওয়া পর্যন্ত ঘন্টা তিনেকের জন্য জেনারেটর চালানো হয়। এদিকে মোবাইলের চার্জ শেষ হয়ে এসেছে। টর্চও বিগড়ে গেছে। রাত্রে কি হবে ভেবে হাড় হিম হয়ে যাচ্ছিল। এমন সময় এক বাঙালী ভদ্রমহিলা খবর দিলেন জেনারেটর থেকেই মোবাইল চার্জের ব্যবস্থা হবে। শুনে অনির্বাণ বলল "যাই ব্যাগ থেকে চার্জারগুলো নিয়ে আসি।" গেলো বটে, কিন্তু ফিরে এলো চার্জার ছাড়াই, "বব, টেন্টের মধ্যে তো ব্যাগ ট্যাগ কিচ্ছু নেই!" আসার আগের দিন অনির্বাণকে ছোট্ট করে একটু বোকা বানানো হয়েছিল। প্রথমে ভেবেছিলাম সেটারই শোধ তুলছে হয়ত। তারপর বুঝলাম না, ব্যাপারটা সিরিয়াস। গুরস কুঞ্জে হুলুস্থুল পড়ে গেল। সবাই টর্চফর্চ যা আছে হাতে নিয়ে ছুটল। এরকম ঘটনা নাকি এখানে কোনদিন ঘটেনি! তাঁবুর ভেতর আলো ফেলে দেখা গেল পরিপাটি করে বিছানা পাতা কিন্তু ব্যাগপত্র হাওয়া। হঠাৎ পল্লব বলল, "আচ্ছা আমরা তো বিছানা পেতে যাইনি?" কি কাণ্ড! চোর শুধু ব্যাগ চুরি করে বিছানা পেতে দিয়ে গেছে – এমন ঘটনা ভার্সে কেন, ভূভারতে কোনদিন ঘটেছে বলে মনে হয়না। কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে দাঁড়িয়ে আছি এমন সময় "ইয়ে আপকা সামান হ্যায় না? মিসটেক হো গিয়া" বলে সাদা জ্যাকেট পরা একজন এসে ব্যাগগুলো তাঁবুর মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে বেরিয়ে গেলেন। জানা গেল তিনি পুসাই, কোন ট্যুরিস্ট পার্টি তাদের মালপত্র তাঁবু থেকে নিয়ে আসতে বলেছিল। উনি অন্ধকারে তাঁবু চিনতে না পেরে আমাদের ব্যাগগুলোই উঠিয়ে নিয়েছিলেন! আমাদের সবাইকে নিজের কার্ডও দিয়ে দিলেন তিনি।

এদিকে গুরস কুঞ্জে আরেক ক্যাচাল শুরু হল। সেদিনটায় হঠাৎ করে অনেক লোক চলে আসায় লজের কর্মীরা বিপদে পড়ে গেলেন। অতজনকে খাওয়ানোর রসদ তাঁদের ছিল না। আর এটা কোন শহর নয় যে টাকা ফেললেই দোকান থেকে খাবারদাবার কিনে আনা যাবে! কোনরকমে তিনটে মুরগী জোগাড় করা গেল। ভাত, ডাল আর ছোট ছোট দুটো টুকরো সমেত মাংসের ঝোল দিয়ে ডিনার সারলেন ৬৫ জন ট্যুরিষ্ট। কিন্তু এখানেও শেষ হয়নি। তাঁবুতে ঢুকে পড়ার পর একটা হল্লা শুনলাম। আরো দশ বারো জনের একটা দল ঐ রাত্তিরে এসে হাজির। তাঁদের আগে থেকেই বুকিং ছিল। খাবারের জোগাড় নেই কেন এই নিয়ে প্রবল তর্কাতর্কি। মালদা থেকে একটা বড় গ্রুপের সঙ্গে এসেছিলেন ফাল্গুনিদা। শেষে তিনিই ব্যাপারটা সামলালেন। মাংস না থাকলেও ডিম ছিলো। আবার উনুন জ্বেলে ডিমের ঝোল রান্না হল। তাই দিয়ে ভাত খেলেন নিশিকুটুম্বরা।

আমি ভার্সে বলছি বটে কিন্তু সঠিক উচ্চারণটা হবে বার্সে (Barsey)। বর্ষা থেকেই এই নাম। তাই বার্সেতে এলে বর্ষা না পেলে কিছু একটা বাকি থেকে যেত! রাতে প্রবল ঝড়বৃষ্টি হল, বজ্রবিদ্যুৎ সহ। সকালের আবহাওয়া আগেরদিনের চেয়ে এক্কেবারে আলাদা। ভীষণ কুয়াশা, বারে বারে বৃষ্টি নামছে -এই অবস্থায় নিচে নামা সম্ভব নয়। সবাই রেনকোট, ছাতাটাতা নিয়ে রেডি, কারো মাথায় প্লাস্টিকের প্যাকেট। ওয়েদার একটু ভালো হলেই বেরোতে হবে। এদিকে রাত্রের মত সকালেও ৭০ জনের ব্রেকফাস্ট তৈরী করতে নাজেহাল করছিলেন লজের কর্মীরা। দেখলাম আমাদের নিম দরজিও লুচি বেলতে চলে গেছেন। একপ্লেট জলখাবার রেডি হতেই কাড়াকাড়ি পরে যাচ্ছে। মুশকিল আসান হলেন ফের ফাল্গুনিদা। কিচেনের দরজা বন্ধ করে জানলার একটা কাঁচ ভাঙা ছিল, সেটাকে কাউন্টার বানিয়ে তার বাইরে দাঁড়ালেন এবং নিজের দলের সদস্যদের জলখাবার একে একে পাস করে দিলেন। তারপর সে জায়গাটা ছেড়ে দিলেন আমাদের টিমলিডার অনির্বাণকে।

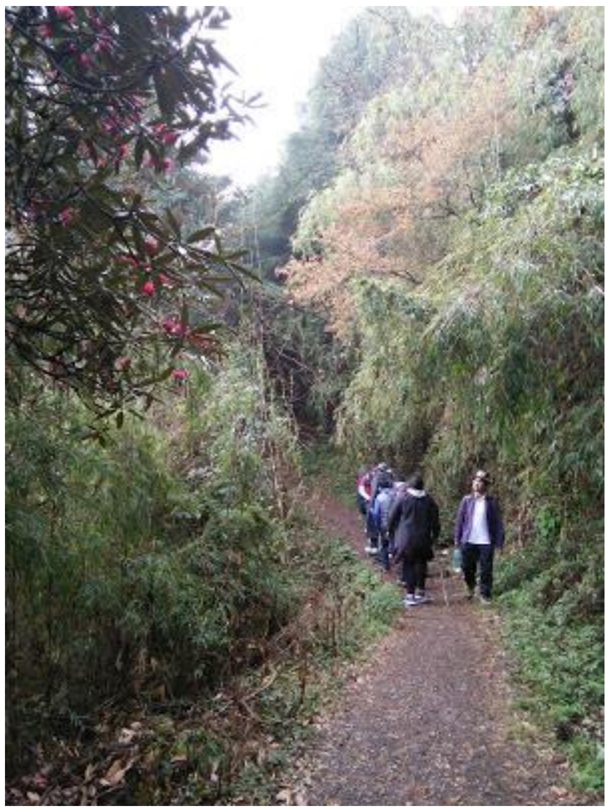

জলখাবার শেষ করে হাত ধুচ্ছি, এমন সময় অনেকগুলো কণ্ঠে উল্লাস শুনে দৌড়ে বাইরে এলাম। কুয়াশা অনেকটা কেটে গেছে, আকাশ থেকে মেঘ সরে সরে যাচ্ছে। আর তার পেছন দিয়ে ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করছে মাউন্ট কাঞ্চনজঙ্ঘা। সে দৃশ্য বর্ণনা করার বৃথা চেষ্টা করছি না। আর তা লেন্সবন্দী করার মত ক্যামেরাও আমাদের কারো কাছে ছিল না। তাই চোখ দিয়ে মনের ক্যামেরাতেই গেঁথে রাখলাম। ভার্সে ট্রেক সার্থক।

এবার ফেরার পালা। ভার্সেকে বিদায় জানিয়ে হাঁটা শুরু করলাম। আবহাওয়া অনেকটা ভালো হয়েছে, কিন্তু মাঝে মাঝে বৃষ্টি আসছে। কিছুটা শিলাবৃষ্টিও পেলাম। ওঠার দিন ছিল ঝকঝকে রোদ্দুর। আজ ভেজা রাস্তা, গাছের পাতা থেকে টুপটাপ জল পড়ছে, ঝোরাগুলোর তেজও বেড়ে গেছে। কখনো কখনো হাঁটতে হচ্ছে কুয়াশার মধ্য দিয়ে। পাঁচ হাত দূরের মানুষকেও দেখা যাচ্ছে না। এর মধ্যে বব আর পল্লব পাকড়াও করেছে একটা পাহাড়ি কুকুরকে। এখানে অনেকরকম লোমশ কুকুর দেখলাম, যাদের কলকাতাতেও দেখতে পাওয়া যায়, বকলস পরা অবস্থায়, বড়লোকদের ড্রয়িংরুমে। এখানে তারা স্বাধীন। অবশ্য পল্লবের কাছে যেভাবে চোখ বুজে আদর খাচ্ছিল তাতে ওকে বাড়ি নিয়ে গেলেও বোধহয় আপত্তি করত না। বব ব্যাগ থেকে একটা ক্রীমরোল বের করে অফার করতেই একটা আশ্চর্য ঘটনা প্রত্যক্ষ করলাম। কুকুরটা রোলটাকে মুখে ধরে উল্টোদিকে মুখ ঘুরিয়ে জঙ্গলের মধ্যে ছুট লাগালো। তারপর একটা জায়গায় থাবা দিয়ে গর্ত খুঁড়ে রোলটাকে রেখে আবার মাটি চাপা দিয়ে দিল। পাহাড়ের মানুষ যেমন কঠিন জীবনসংগ্রামে অভ্যস্ত তেমনি কুকুররাও জানে দুবেলা খাওয়ানোর মত পশুপ্রেমিক এখানে নেই। নিজের রসদ নিজেকেই সঞ্চয় করে রাখতে হয়।

নামার সময় হিলে পৌঁছতে সময় লাগল অনেকটা কম, প্রায় দুঘন্টা। এইবার দলটা দুভাগে ভাগ হয়ে গেল। আমি আর শ্রীরূপা যাব ওখরে তে। অনির্বাণ, বব আর পল্লব যাবে ভোরেং এ। সেখান থেকে আরেকটা ট্রেক করে যাবে গোর্খে। পরের দিন ওখরে তে এসে আমাদের সঙ্গে মিট করবে।

৩

বব বকানি

ভার্সে থেকে হিলেতে নামাটা ছিল অনেকটা 'রেস এগেইনস্ট বৃষ্টি'।

আগেই থেকেই ঠিক ছিল যে সকাল সকাল উঠে আমরা ভার্সে থেকে হিলে নেমে দুই ভাগে ভাগ হয়ে যাবো। আমি, পল্লবদা আর অনির্বাণদা বেরিয়ে পড়বো ভোরেঙ এর রাস্তায়; আর অতনুদা আর শ্রীরূপা বৌদি যাবে ওখরেতে। সেই মতো সকালে উঠে পড়লাম, কিন্তু মেঘবৃষ্টির ভিতর দিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘা কে দেখে সময় যে কোথা দিয়ে কেটে গেলো সে বোঝাই গেলো না। একটু একটু করে রাতের জমা মেঘ যেই না কেটে যেতে লাগলো, আমাদের চোখের সামনে ফুটে উঠতে লাগলো কাঞ্চনজঙ্ঘার অপরূপ সৌন্দর্য! সে দৃশ্য বর্ণনা করার মতো ভাষার দখল বা সাহস কোনোটাই আমার নেই। সূর্যের আলো পড়ার সাথে সাথে, রাতে হওয়া বৃষ্টিতে স্নান করা রডোডেনড্রন গাছগুলো তাদের লাল, গোলাপি, সাদা ও হরেক রকম রংবেরঙের ফুলের ডালি নিয়ে সেজে উঠলো |

কিন্তু কপাল মন্দ, যেই না সবে আমরা সেই অপরূপ দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে শুরু করেছি, অমনি নামলো বৃষ্টি। পাহাড়ে কখন যে ঝলমলে নীল আকাশ থাকবে আর কখন যে আকাশ কালো করে বৃষ্টি নামবে, সে খবর ভগবান ও রাখেন না। দূরের পাহাড়ে অল্প অল্প মেঘ আগেই জমতে দেখেছিলাম। হঠাৎ সেই মেঘ আমাদের কাছে এসে পৌঁছলো আর শুরু হলো বৃষ্টি!! আর সে কোনো হেলেফেলা করার মতো বৃষ্টি না, ছোট ছোট আকার এর শিল পড়তে শুরু করলো ! পড়িমরি করে আমরা সবাই ভার্সের কটেজের ভিতর ঢুকে এলাম। প্রবল হাওয়ার সাথে শিলাবৃষ্টি হওয়ার ফলে তাপমাত্রা আরো নিচে নামলো। বাকি সকলের মতো আমিও এই পরিবেশ উপভোগ করলেও ভিতরে ভিতরে আমি একটু অধৈর্য হয়ে পড়ছিলাম বৃষ্টি থামার প্রতীক্ষায়।

যাহোক, সেই বৃষ্টির ভিতরেও লুচি ও আলুরদম সহযোগে পেটভরে জলখাবার খেয়ে নিলাম! ততক্ষনে বৃষ্টি অনেকটাই ধরে এসেছিলো তাই আর দেরি না করে নিজের নিজের ব্যাগ পিঠে নিয়ে এবারের মতো সুন্দরী ভার্সেকে বিদায় জানিয়ে বেরিয়ে পড়লাম হিলের উদ্দেশ্যে। আগেই বলেছি, ভার্সে থেকে হিলেতে নামাটা ছিল অনেকটা 'রেস এগেইনস্ট বৃষ্টি', তাই ফের বৃষ্টি শুরু হবার আগেই পা চালিয়ে নামতে লাগলাম। পাহাড়ে চড়াই ওঠার থেকে নিচে নামাটা বরাবরই সোজা, শুধু রাস্তা বৃষ্টিতে ভিজে ছিল বলে সাবধানতা অবলম্বন করে যতটা সম্ভব তাড়াতাড়ি নামতে লাগলাম। এরই মাঝে হঠাৎ করে পথের মধ্যে মেঘ এসে এক আশ্চর্য মায়াবী পরিবেশের সৃষ্টি করলো। কিছু সামনে

(খুউব বেশি হলে ১৫/২০ ফুট দূর) অতনুদা, শ্রীরূপা বৌদি এবং পল্লবদা কে আবছা আবছা দেখতে পাচ্ছিলাম। সে এক অসাধারণ পরিবেশের সৃষ্টি হলো। সামনে, পিছনে, ডান-বাঁ সব দিকেই উঁচু উঁচু পাইন, ওক গাছে ঘেরা জঙ্গল। তার ভিতর দিয়ে হেটে চলেছি আমরা কয়েকজন, মাঝে মাঝে গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে সূর্যের আলো এসে রাস্তার ওপর পরে এক মায়াবী আলোআঁধারী পরিবেশ তৈরী করেছিল। হঠাৎ করে যেন কোনো জাদুবলে সময় চার পাঁচশো বছর পিছিয়ে গিয়েছিলো। মন্ত্রমুগ্ধের মতো সেই রাস্তা দিয়ে হেঁটে কখন যে আবার হিলে পৌঁছে গেলাম সে খেয়াল ছিল না। একটানা প্রায় চার পাঁচ কিলোমিটার হাঁটার কোনো কষ্ট বোধ করিনি।

সবথেকে আগে আমি এসে ভার্সের রডোডেনড্রন স্যাংচুয়ারির গেটের বাইরের বেঞ্চে বসলাম। মিনিট পাঁচেকের মধ্যেই অনির্বাণদা, পল্লবদা আর শ্রীরূপা বৌদিকে নিয়ে অতনুদা এসে পড়লো। একটানা হাটাহাটি করে সকালের জলখাবারের লুচি আলুরদম কখন হজম হয়ে গেছে। বেশ খিদে খিদে লাগছিলো। আমাদের দলনেতা অনির্বাণদা ম্যাগির অর্ডার দিলো। এমন সময় হালকা বৃষ্টি শুরু হলো। ঠান্ডায় গরম গরম ম্যাগি খেতে লাগছিলো বেশ উপাদেয়, কিন্তু মোটে একবাটি ম্যাগিতে আমার সদা জাগ্রত খিদের বিশেষ কোনো উপশম হলো না। যাহোক কিছু একটা পেটে গেছে , তাই এবার ভোরেঙ যাবার তোড়জোড় শুরু করতে লাগলাম।

অনির বচন

ভালো জিনিস, ভালো দিন, ভালো সময়গুলো যেন বড্ড তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে আসে। বিগত দু মাস ধরে যে দিনগুলোর জন্যে আমরা অপেক্ষায় ছিলাম তা প্রায় শেষের মুখে। দু 'দুটো দিন কাটিয়ে দিলাম একসাথে। আজ তৃতীয় দিন। পাঁচজনের বার্সে ঘোরা শেষ, গুরাস কুঞ্জের রডোডেনড্রন দেখা হয়ে গেছে, পাহাড়ের বৃষ্টি আর কনকনে ঠান্ডার সাথে পরিচয়টাও হয়ে গেছে।

এখন ফেরার পালা ।

বার্সে থেকে হিলেতে ফিরে আমরা রিল্যাক্সড্ যে প্রথম ট্রেকিংরুট সবাই অ্যাকম্প্লিসড্ করেছি। আমি বাদে বাকিদের প্রথম ট্রেকিং তাই পূর্বঅভিজ্ঞতা থাকলেও আমিও টেনশনে ছিলাম। আপাতত আর কোনো চিন্তা নেই। সকালে কাঞ্চনজঙ্ঘা দেখে যখন বার্সে থেকে বেড়োলাম বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। গতরাত্রে যখন আমরা টেন্টে ছিলাম তখনও খুব বৃষ্টি হয়েছিল সঙ্গে তুমুল বজ্রপাত । বব তো রীতিমত এক্সাইটেড ছিল আর পলু তাঁর সেন্স অব হিউমর নিয়েই রাত কাটিয়ে দিল। যদিও পাহাড়ের উপর টেন্টে শুয়ে দূর্যোগপূর্ণ রাত কাটানো যে কি যারা কাটিয়েছেন তাঁরাই জানেন। প্রেমিকার মতন পাহাড়েরও মন বোঝা দায়, খামখেয়ালি কিন্তু বড়ই প্রিয়।

হিলেতে পৌঁছলাম এগারোটা নাগাদ । দিনটা পয়লা বৈশাখ । প্রচুর ট্যুরিস্ট, সবাই বার্সে যাবেন। ইতিমধ্যে দেখলাম বব কয়েকজন ভদ্রমহিলাকে বার্সে যাওয়ার জন্য খুব এনকারেজ্ করছে । শেষে ববের কথায় তাঁরা স্যাংচুয়ারীতে গেলেন যদিও ফিরে তারা ববকে আর খুঁজেছিল কিনা জানিনা।

হিলে তেও ওয়েদার ক্লাউডি, চারদিক মেঘে ঢাকা। এবার আমরা দু'দলে ভাগ হয়ে গেলাম।দু 'দলের গন্তব্য আলাদা। অতনু শ্রীরূপা যাবে ওখরে, "সানবার্ড হোমস্টেতে" ওঁদের বুকিং আর আমরা মানে আমি, পল্লব আর বব যাব "ইডেন হোমস্টে", গোরখে ; আমাদের আরো একটু অ্যাডভেঞ্চার চাই ।সিকিমের একটা পাইনবনে ঘেরা গ্রাম "গোরখে" প্রথমে আমদের ট্যুর প্ল্যানে ছিলনা, Dipankar Majestic-এর দীপঙ্করদাই বলল যেতে, এখন ভাবি না গেলে খুব মিস্ হত, থ্যাঙ্কস টু দীপঙ্করদা । সান্দাকফু ফালুট হয়ে শ্রীখোলা দিয়ে ফেরবার পথেই এই গোরখে। ট্রেকার্সরা এখান দিয়েই চলে যায় রিম্বিক অথবা রিব্দি।

শ্রীরূপা আবার বায়না ধরল সেও গোরখে যাবে তারপর অনেক বুঝিয়ে আমাদের পেয়ারের কাপল্ কে ওখরে পাঠিয়ে আমরা তিনজন চললাম ভরেঙ এর পথে। সঙ্গে রইল গাইড নিম দোরজি যার কিনা "দো সাদী"। এইরকম ওয়েদারে

বব একটা হেইল্ স্টর্ম আশা করছিল আর পল্লব পড়েছিল গাইড নিম দোরজি আর রাজের পিছনে। পল্লব বরাবর একই রকম, সঙ্গে থাকলে দিব্যি সময় কেটে যায় হাসতে হাসতে।

গাড়িতে হিলে থেকে ভরেঙ যেতে লাগল চল্লিশ মিনিট মতন ,প্রায় ষোলো কিলোমিটার ডাউনহিল। গাড়ি থামলো ভরেঙএ যেখানে পাকা রাস্তা একদম শেষ আর পাহাড়ঘেরা বনের পথ শুরু। যাওয়ার রাস্তা প্রায় নেই বললেই চলে পুরোটাই ভাঙা মাটির আর পাথরের পথ । বব দারুণ খুশি, বলে উঠল, "গড্ লী প্লেস্!" সেই সঙ্গে পলু গান ধরল, "আমার এই ভাঙা পথের রাঙা ধূলায়" । শুরু হল আমাদের ট্রেক টু গোরখে । ।

পলুর পাঁচালি

অনির্বান কুইজ মাস্টার হতে পারতো, কোনো রিয়ালিটি শো এর সঞ্চালক, কৌন বনেগা করোড়পতি টাইপ! আপনি যখন যাবেন কিনা নিশ্চিত নন, ও বলবে, খুব সহজ ব্যাপার, কোনো চাপ নেই, আরাম সে হয়ে যাবে। আপনি সেটা শুনে যেই একটা হ্যাঁ বাচক সিদ্ধান্ত নেবেন, ও শুরু করবে, "পথটা কিন্তু অন্য পথের থেকে আলাদা, ইনফ্যাক্ট সব জায়গায় পথ বলে কিছু নেই, যথেষ্ট বিপজ্জনক, আর দম ও লাগবে খুব, অনেকটা চড়া খাড়াই! আর নামার সময় তো আরো মুশকিল!" ঠিক এই খেলাটাই ও শুরু করে দিলো, গাড়িতে বসে। অতনু আর শ্রীরূপাকে সদ্য ছেড়ে এসেছি হিলে তে, ওরা ওখান থেকে যাবে ওখরে। আমরা আপাতত ভরেঙ, সেখান থেকে গোরখে ট্রেক শুরু হবে। বৃষ্টি পড়ছে এখনো, সাথে বরফকুচি। আমার পাশে বসে রাজ তামাং দিব্যি গাড়ি চালাচ্ছে এর মধ্যেই, মাঝেমধ্যে কাঁচটা মুছে নিচ্ছে আর টুকটাক ঠাট্টা করছে। বব নিবিষ্ট মনে বাইরের জগৎ দেখছে, আমিও দেখছি আর অনির কথা শুনে বাঁ হাঁটুতে হাত বোলাচ্ছি, জখমী কোমর আর বাঁ পা নিয়ে এসেছি, তার ওপর অনির রিভার্স ভোকাল টনিক!

দিব্যি গাড়ি চলছিল, হঠাৎ দাঁড়িয়ে পড়ল। বুঝলুম সময় আগত! সুবোধ বালকের মত নেমে পড়লুম তিন ভাই। কিছু বোঝার আগেই আমাদের গাইড নিম দরজি রাস্তার বাঁ পাশ দিয়ে নেমে গেল, আর যেখানে গেল, সেটাকে রাস্তা বলে আপনাদের বিভ্রান্ত করতে চাইনে। ক্ষেতের আলের চেয়ে আরেকটু সরু, অনেকটা উঁচুনিচু, কোথাও পাথুরে, কোথাও

সেটুকুরও অস্তিত্ব নেই, এবং বৃষ্টির দরুণ পিছল! ডানপাশে পাহাড় উঠেছে খাঁড়া, বাঁ পাশে খাদ নেমে গেছে, মাঝখানে সামান্য পথের আভা ফুটে উঠেছে, আর তাতে তিন মূর্তি টলমল করে এগিয়ে চলেছি। আমাদের গাইডের গতি এই বৃষ্টিতেও লিওনেল মেসির মত স্বচ্ছন্দ, আর পেছনে আমরা তিনজন মোহনবাগানের রিজার্ভ বেঞ্চের প্লেয়ার! কিন্তু এর মধ্যেই কখন আপনার ভালো লাগতে শুরু করবে, নাম না জানা ফুল, কখনো দেখা দেওয়া, কখনো আড়াল থেকে ডাকা পাখি, মাঝেমধ্যে পা ভেজানো পাহাড়ি ঝোড়া আর গাছের ফাঁকে ফাঁকে দূরে উঁকি দেওয়া পাহাড়ের সারি। এসব দুচোখ দিয়ে গিলতে গিলতে ঢিমেতালে চলতে থাকলাম তিনজন। ঘন্টা দুয়েক চলার পর জলের শব্দ পাওয়া শুরু হল। জানা গেল ওটা রামাং নদী, এ নদী গোরখের মাঝ দিয়ে বয়ে গেছে। যতই এগোই, জলের শব্দ বাড়ে, আর আমাদের বুকের ভেতরটাও ছলাৎ ছলাৎ করতে থাকে। এ কোন আবিষ্কার নয়, নেহাৎই পথপ্রদর্শকের সাহায্যে কয়েক ঘন্টা হেঁটে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় পৌঁছনো। তবু এই জলের আওয়াজ অনুসরণ করে যাওয়ার মধ্যে একটা থ্রিল আছে, যারা গেছেন, তারা জানেন। কিংবা হয়তো প্রথমবার বলে আমাদের মধ্যে উত্তেজনা বেশি, তবু বেশ লাগছিলো, কতকাল আগে আমাদের পূর্বসূরিরা তো এমন করেই কত নতুন জনপদ খুঁজে বের করেছেন, আরো কত কষ্ট, কত সহিষ্ণুতা, কত সাহসিকতার মধ্য দিয়ে। তখন পথ অজানা ছিল, হিংস্র জন্তুর ভয় ছিল অনেক বেশী, পথ আরো দূর্গম ছিলো, তবু তারা থামেননি। ভাবলে শ্রদ্ধায় মাথা আপনা থেকেই নুয়ে আসে।

আরো কিছুটা যাওয়ার পর, একটা বাঁক ঘুরে খানিকটা চড়াই, আর সেই চড়াই বেয়ে উঠে আমাদের তিনজনেরই কথা বন্ধ হয়ে গেল। সামনে গোরখে! তখনো কিছু দূর, এক কিলোমিটার হবে, বা একটু বেশি। পেছনে নীল আকাশের চাঁদোয়া, পাইনের সারি, সামনে রামাং নদী, পাহাড়ের কোলে অপরূপ গোরখে। ববের ভাষায় এইচ ডি ওয়ালপেপার! আমার ভাষা নেই সে ছবি বর্ণনা করার, তবে রবি ঠাকুরের একটা গান মনে এসেছিলো, " এ দিন আজি কোন ঘরে গো খুলে দিল দ্বার, আজি প্রাতে সূর্য ওঠা সফল হল কার।" আমরা তিনজনেই জানি, সফল হয়েছিলো!

কাঠের ব্রিজ পেরিয়ে আমরা তিনজন সিঙ্গালিলা ন্যাশনাল পার্কে ঢুকে পড়লুম। আমাদের গন্তব্য ইডেন লজ, একটা হোমস্টে। মালিক এক হাসিখুশি গোলগাল নেপালি দিদি, নাম, পেম ডিকি। ছোট্ট কাঠের কটেজ, ঠিক যেমনটি এই পাইন পাড়ায় মানায়! জানলার ওপারে পাহাড় আর নিচে তাকালে নদী, চমৎকার আশ্রয়। অত পরিশ্রমের পর খিদেটা নেহাত মন্দ পায়নি, একটু ফ্রেশ হয়ে নিয়ে খেতে গেলুম। ফাইন চালের ভাত, শাকভাজা, ডাল আর ডিমের ঝোল, এমন সুন্দর রান্না খুব কম জায়গাতেই খেয়েছি। আমি আর অনি চুনোপুঁটি হলেও বব খাবার টেবিলে বাংলাদেশের মান রাখলো, যে ছেলেটি খাবার সার্ভ করছিলো তার চোখে স্পষ্ট দেখলুম ভয় মেশানো সম্ভ্রম! একটু পরেই পাহাড়ি সন্ধ্যে নেমে এল। পাহাড়ের অন্ধকার জ্যালজ্যালে মশারির মত নয়, আঁধারের ঠাস বুনোট। পাহাড় আর জঙ্গলে না গেলে আকাশে যে এত তারা আছে বোঝাই যায় না! একটা বড় দল এসেছিলো, তারা ক্যাম্প ফায়ার করছিলো। একজনের হাতে গিটার, বেহিসাবী সুর পাক দিচ্ছিলো হিমেল হাওয়ায়। আমরা একটা চাতালে বসে ছিলাম। নিচে জলের শব্দ, সামনে প্রাচীন অন্ধকার। যে শহুরে শব্দমালায় আমরা অভ্যস্ত, এখানে তা মিশ খায়না। আমরা তিনজনই চুপ করে ছিলাম, বোধহয় সময়ও। কিন্তু সুরের একটা ধাক্কা আছে যেটা সহজে হৃদয়ে পৌঁছে যায়, অর্থমান শব্দের মত তাকে ভায়া মস্তিষ্ক আসতে হয়না! আশেপাশের গানের দোলা আমাদেরও দোলালো! আমাদের এই সঙ্গীতচর্চা শুরুর কিছুক্ষণের মধ্যেই সেই নেপালি ভাইটি এসে খাওয়ার ডাক দিলো, ওরা বোধহয় ভেবেছিলো আমরা খিদের জ্বালায় চেঁচামেচি করছি! সুরের দেবতা আমাদের ওপর উপুড়হস্ত কিনা! রাতের খাবারে চিকেন, বব প্রত্যাশাভঙ্গ করেনি, আমাদের ও, ওদের ও!

খাবার পর আরো কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়েছিলাম, কয়েকটা ট্রেকিং গ্রুপ এসেছে, তাদের সাথে টুকটাক গল্প হচ্ছিল। একজন এসেছেন সান্দাকফু, ফালুট হয়ে, যাবেন রিবদি। তিনি জানালেন রাতের খাওয়ার পর ছাং (স্থানীয় পানীয়, সম্ভবত যবের তৈরী) খাওয়া উচিত, সকালে পেট পরিষ্কার হয়ে যাবে। আমি আর অনি ঠিক ভরসা পেলুম না, কিন্তু বব যথার্থ ট্রেকার, "অচেনা কে ভয় কি আমার ওরে"! পেটভর্তি খাবার,রাতের বিছানাও যথেষ্ট আরামদায়ক ছিলো, ভার্সে থেকে হিলে, আবার ভরেঙ থেকে গোরখে একইদিনে হাঁটার ক্লান্তিও ছিলো, তবু ঘুমোতে দেরী হল। তিনবন্ধু এক জায়গায় হলে নরকগুলজার তো হবেই! আরেকটা কারণ হল জানলার বাইরে চাঁদের আলোয় ভাসতে থাকা

পাহাড় আর পাইন বন। তাকে উপেক্ষা করে বিছানায় পপাত চ, মমার চ, হবেন এমন বেরসিক ক্ষণজন্মা! শেষটায় যখন ঘুমিয়ে পড়লাম, তখনো জানিনা কাল সকালে আমাদের জন্য নিম দরজি কি চমক তুলে রাখছেন..............

অনির বচন

আজ চতুর্থ দিন। ইডেন লজের জানালার কাঁচের শার্সি দিয়ে চকচকে রোদ্দুর এসে পড়েছে আমাদের বিছানায়। কোনো কোনো সকালের আলো মন ভালো করে দেয়, যেন মনে হয় কোথাও তো কোনো কিছুই হয়নি, কোথাও তো কিছুই হারায়নি, কোথাও তো কেউ চলে যায়নি ছেড়ে, কোথাও কোন সংকীর্ণতা নেই, মলিনতা নেই বরং দিব্যি একটা নতুন দিন অনন্ত আনন্দপথের দিকে আরো এক পা এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার অপেক্ষায়!

আমি একটু আগেই উঠেছি বাকি দুজন তখনো ঘুমোচ্ছে। আজ তেমন কোন কাজ নেই। প্ল্যান বলতে সকালে গ্রামটা একটু ঘুরে দেখা। পশ্চিমের দিকে যে রাস্তাটা শ্রীখোলার দিকে গেছে সেদিকটায় একটা পাইনবন আছে। ববের খুব ইচ্ছা ওঁর ব্রেক আপ সেলিব্রেশনটা সেখানেই হোক, সেলিব্রেশন বলতে চুপচাপ বসে থাকা আর কি! তারপর ব্যাক টু ভরেঙ, দেন ওখরে। অতনু শ্রীরূপা ওখানেই আছে সানবার্ডে। গতকালের পর থেকে ওদের সাথে যোগাযোগ নেই । গোরখেতে আমাদের কারোর মোবাইলের নেটওয়ার্ক নেই আর ববের ফোনের চার্জও শেষ। গতরাত্রে আমরা ফোনপিছু পঞ্চাশ টাকা খসিয়েছি চার্জ দিতে। পাহাড়ের বেশিরভাগ জায়গায় এটাই দস্তুর । তবে গোরখের পরিস্থিতি বার্সে বা

হিলের তুলনায় ভালো। এখানেও সন্ধ্যা ছটা থেকে রাত দশটা অবধি আলো থাকে। জেনারেটরের আলো। এই ফেসিলিটি অবশ্য হোমস্টে গুলোতেই আছে, বাকি গ্রাম অন্ধকার।

রাতের দিকে আর বৃষ্টি হয়নি বরং চাঁদ উঠেছিল। আমাদের ঘরের ঠিক পিছন দিক থেকেই, যেখানে পাহাড় উঠে গেছে আকাশে। এইরকম ভাসিয়ে নেওয়া জোছ্না আমরা বহুকাল দেখিনি । আমি এইরকম চাঁদের আলো দেখেছিলাম জয়ন্তী রিভারবেডে। সেবারেও সাথে ছিল দীপঙ্করদা। দূরে বনের থেকে ভেসে এসেছিল ময়ূরের ডাক... সে এক অন্য অনুভূতি ! আমরা অনেক রাত অবধি জেগেছিলাম। কথা হল... কথা হল তাঁদের নিয়ে যাঁরা হয়ত কোনোদিনই আমাদের জীবনে দিনের আলোর মতন স্পষ্ট হবেনা অথচ এই চাঁদের আলোর মতই আবছায়া বিষন্নতায় ভরিয়ে রাখবে সারাজীবন। এ জোছ্না বিষন্নতার জোছ্না, এ জোছ্না "গৃহত্যাগী জোছ্না"।

বব আর পলু উঠল সাড়ে সাতটায়। চা জুড়িয়ে জল হয়ে গিয়েছিল। গতকাল আমাদের গোরখে পৌঁছে দিয়ে নিম দোরজি ভরেঙএ ফিরে গেছে; জানিনা কোন বিবির কাছে। পলু বলে দিয়েছে সকাল আটটার মধ্যে যেন সে গোরখে চলে আসে। তাই ঘুম থেকে উঠেই আমরা রেডি। পেমদিকি দিদিও ব্রেকফাস্ট দিয়ে দিয়েছে সব্জি পুরি আর ডিম ভাজা। দেখলাম অন্যান্য টিমগুলোও ব্রেকফাস্ট সেরে নিচ্ছে। তাঁরা যাবে রিব্দি আর আমরা ফিরব ভরেঙ একই পথে।

পাইনবনের ভিতর দিয়ে শ্রীখোলার দিকে কিছুটা ঘুরে এলাম দুজনে, ববকে পাইনের বনে কিছুক্ষণ একলা রেখে। পাইনের বিশেষত্ব হল এর উচ্চতা অদ্ভুত এক প্রাগৈতিহাসিক পরিবেশ তৈরী করে ।

নিম দোরজির আসার কথা ছিল আটটায়। পলু পইপই করে বলে দিয়েছিল "দের মত করনা" অথচ দশটা অবধি নিমের দেখা নেই। আমরা বুঝলাম আমাদের ডুবিয়েছে নিম দোরজি, সে আর আসবেনা। পলু কিছুক্ষন নিম দোরজির নামগান করল , অতঃপর ঠিক হল তিনজনেই ফিরব। পলু ভরসা দিল যে সে রাস্তা চিনে গিয়েছে। যদিও চিন্তার বিষয় ছিল কারন গতকাল যখন আমরা আসছিলাম তখন দেখেছিলাম লোকাল ফরেস্টগার্ডরা একদল ট্রেকার্সকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে তাঁরা নাকি হারিয়ে গিয়ে একরাত ফরেস্টেই কাটিয়েছে। যাই হোক, আমরা তিনজনেই বেরিয়ে পড়লাম। চেকপোস্টে তিনশ টাকা এন্ট্রীফিস্ দিতে হল। এটা আসলে গতকালই দেওয়ার কথা ছিল। সেখান থেকে একজনকে পাওয়া গেল যে কিনা ভরেঙএ যাবে নিজের কাজে। দুশোটাকায় রাজি হল সে আমাদের সাথে যেতে। আমরা আমাদের হোস্ট আর সুন্দরী গোরখেকে বিদায় জানিয়ে হাঁটা শুরু করলাম।

যুধিষ্ঠিরকে মহাপ্রস্থানের পথ দেখিয়ে নিয়ে গিয়েছিল সরমা। একটি কুকুর। ট্রেকার্সদের এই সারমেরসঙ্গের এক্সপেরিয়েন্স থাকেই। আমারও ছিল। প্রত্যেকবারই কোনো না কোনো কুকুর আমাদের চলার পথের সঙ্গী হয়েছে , এবারেও সে নিয়মের ব্যতিক্রম হলনা। হয়তো মহাভারতের নিয়মবাদ। ফেরাটা চড়াই-উৎরাই-ওয়ালা তবে বেশিটাই ওঠা। টার্গেট বারোটার মধ্যে ভরেঙ পৌঁছানো। গাড়ি থাকবে। বেরোবার আগে পেমদিকির রান্নাঘরের জানলার একদম এক কোনা থেকে অতনুকে কল্ করে দিয়েছি যে যদি আমরা তিনটের মধ্যে ওখরে না পৌঁছাই যেন খোঁজ করে কারন তখনো অবধি আমরা ফেরবার গাইড পাইনি। আমরা আস্তে আস্তে ফিরতে লাগলাম আর রামাং এর জলের আওয়াজ কমতে লাগল। কিছুদূর গিয়ে আমরা দেখে নিচ্ছিলাম নীচের পাহাড়ী ভ্যালিগুলোকে। পাহাড়ের এই বিশালতার সামনে নিজেদের তুচ্ছ মনে হয়। পাহাড়ের সামনে এলে মাথা নীচু হয়ে যায় আর সমুদ্রের সামনে দাড়ালে উদারতা আসে।

ঠিক বারোটাতেই আমরা ভরেঙএ পৌঁছলাম। বব মশালা ম্যাগি আর আমরা চা খেলাম। তারপর একটা অল্টো ছিল তাতে তিনজনে চড়ে বসলাম। গন্তব্য ওখরে। পাহাড়ের পাকদন্ডী বেয়ে গাড়ি নামতে থাকল। মিনিট খানেকের মধ্যে একটা পাহাড়ী বাঁক নিতেই চোখে পড়ল সাজানো সবুজ রঙের সানবার্ড হোমস্টে। আজকের দিনটাই হাতে। পলু বলে উঠল,"সবটা দেখে নিতে হবে আজই, বিশেষ করে ওখরে মনেস্ট্রীটা যেটা দেখতে কিনা আবার তিনশ সিঁড়ি চড়তে হবে"। গাড়ি এগিয়ে এসে থামল হোমস্টের সামনে। দেখলাম হোমস্টের মালিক পেমা সিরিং আর অতনু দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে আর শ্রীরূপার কোলে আপেলের মত লাল ফুটফুটে একটা মেয়ে, আমাদের দেখে হেসে উঠল ।

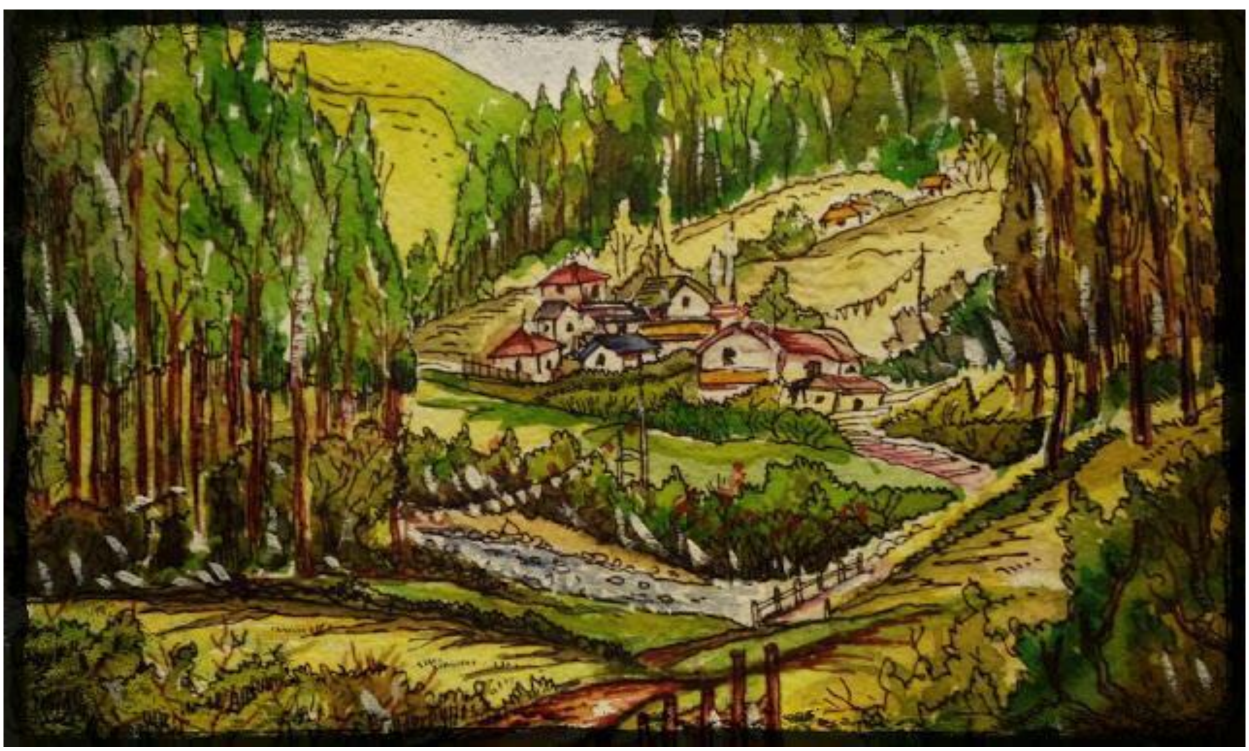

৪

কুমারের কপচানি

বেড়ানো অনেক রকমের হয়। কেউ যান দুর্গম গিরি কান্তার মরু পেরিয়ে অজানা দেশের সন্ধানে। কেউ চান প্যাকেজ ট্যুরে যাবতীয় দর্শনীয় স্থান দেখে নিতে। কারো পছন্দ আবার স্রেফ শহরের কোলাহল, ব্যস্ততা ভুলে দুটো দিন নিভৃতে নির্জনে কাটাতে। আমরা আবার কোন ব্যাপারেই কট্টরপন্থী নই। তাই ভ্রমণের সবরকম স্বাদই ঘুরিয়ে ফিরিয়ে নিতে চাই। হিলে-ভার্সের সাড়ে চার কিলোমিটার ট্রেক, খাবার ও জলের অপ্রতুলতা, বিদ্যুৎ, নেট ও নেটওয়ার্ক হীনতা – এগুলো উপভোগ করিনি বললে ভীষণ ভুল হবে। তেমনি ছোট্ট একখানি নীড়ের জন্য ভেতো বাঙালী মনটা টান দিচ্ছিল তা-ও অস্বীকার করতে পারিনা।

তাই এঁকাবেঁকা পাহাড়ি রাস্তা বেয়ে আমাদের গাড়ি যখন ছবির মত সানবার্ড হোমস্টের সামনে এসে দাঁড়ালো আর লাল টুকটুকে দুই নেপালি ছোকরা পেমা আর নিমো আমাদের ব্যাগগুলো ছোঁ মেরে নিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে ওপরে উঠে গেল আর লজের মালিক পেমা সিরিং শেরপা আমাদের হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানিয়ে ঘরে নিয়ে গেলেন তখন মনে হল আহ এটাই স্বর্গ! ছোট্ট ঘর, বাইরে একটা ব্যালকনি। জানলার ওপারে দেখা যাচ্ছে বিস্তীর্ণ পাহাড়ের সারি। পাহাড়ের গা কোথাও নেড়া, বেশীরভাগ জায়গাতেই সবুজে ঢাকা। আরো ভালো করে তাকালে দেখা যাবে আনেক জায়গাতে ধাপ কেটে চাষ হচ্ছে, তার মধ্যে ছোট্ট একটা কুঁড়েঘর। কোথাও আবার গ্রাম ধরণের, খেলনাবাড়ির মত অনেকগুলো ঘর। আর এর মধ্যে সাপের মত এঁকেবেঁকে রাস্তাটা ছোট হতে হতে দূরে হারিয়ে গেছে। মাঝে মাঝে গাছপালা, পাহাড়ের মধ্যে রাস্তাটা চাপা পড়ে গেছে, আবার কিছুদূরে গিয়ে উদয় হয়েছে।

বোঝা গেল এই ঘর বাড়ির লোকেরাই ব্যবহার করেন, আমরাই প্রথম অতিথি। পেমাদাজু বিছানাপত্র ঠিক করতে করতে বললেন, "এসব কাজ নতুন করছি, ভুল হয়ে গেলে মাফ করবেন!" সরকারের থেকে লীজ নিয়ে এই লজটা তাঁরা চালু করেছেন মাত্র ২ মাস আগে। ভার্সের গুরস কুঞ্জের সর্বেসর্বা পাসাং শেরপা এনারই দাদা। পাসাং-এর গাইডেন্সেই উনি এই হোমস্টেটা চালাচ্ছেন। সরু চালের ভাত, তরকারি আর ডিমের ঝোল দিয়ে লাঞ্চ করতে করতে কথা হচ্ছিল পেমা সিরিং এর স্ত্রী ফুর্বা ডিকি শেরপার সঙ্গে। ভদ্রমহিলা গ্যাংটক থেকে ২১ কিমি দূরে নামথাং এ কৃষি দফতরে চাকুরিরতা। সপ্তাহান্তে ওখরেতে এসে স্বামীকে সাহায্য করেন। তাঁদের ন মাসের ফুটফুটে গোলগাল মেয়ে ছিমি সোরেং তো শ্রীরূপার কোল ছেড়ে নামতেই চায় না। ফুর্বা ডিকি বলছিলেন, "সংসার আর কাজের অ্যাত টানাপোড়েন, মাঝে মাঝে মনে হয় চাকরি ছেড়ে দিই।" শ্রীরূপা বলল, "সব জায়গাতেই মেয়েদের এই সমস্যা।" চমৎকার লাঞ্চের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে তাঁকে আবদার করে এলাম, "কাল কিন্তু আপনার হাতে গড়া সিকিমি মোমো খাচ্ছি!"

ভার্সের তুলনায় ওখরে অনেকটা নিচে হলেও সেদিন প্রচণ্ড ঝড়বৃষ্টির কারণে ঠাণ্ডাটা ভালোই ছিল। এই আবহাওয়ায় বেরনোর প্রশ্ন নেই। তাছাড়া গত দুদিন হিলে, ভার্সে তে ঠিকমত ঘুম হয়নি। তাই একটার ওপর একটা কম্বল চাপা দিয়ে ভাতঘুমটা সেরে নিলাম। ঘুম ভাঙল পেমাজির শ্যালিকার ডাকে। আমাদের জন্য গরম গরম পকোড়া আর চা নিয়ে এসেছেন তিনি। বৃষ্টি তখনো পড়ছে, তবে বেগ কমেছে। দিনের আলো কমে এসেছে। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলোয় আলো জ্বলে উঠতে দেখা যাচ্ছে। অনির্বান, বব, পল্লব গোর্খে গেছে, এই বৃষ্টিতে ঠিকমত পৌঁছাল কি না চিন্তা হচ্ছিল, কিন্তু তিনজনের ফোনেই বারবার চেষ্টা করেও লাইন পেলাম না। ওখরে নেটওয়ার্ক দুনিয়ার মধ্যে, গোর্খে নয়। বার বার কারেন্ট চলে যাচ্ছিল। একটা ফাঁকা মদের বোতলের মুখে মোমবাতি বসানো ছিল, সেটা জ্বালিয়ে মোবাইলে ডাউনলোড করে রাখা সানডে সাসপেন্স চালিয়ে দিলাম। মোমবাতির আলোয় বর্ষণস্নাত পাহাড়ি গ্রামে সিকিমি চা-এর সঙ্গে জমে উঠল শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঐতিহাসিক গল্প।

পরের দিনটা ছিল রবিবার। এখানে এসে অবশ্য বার তারিখ কিছুরই হিসেব রাখার দরকার ছিল না। টিভি-কাগজ-ইন্টারনেট হীন এক নতুন রাজ্যে যেন বাস করছিলাম। সকালবেলায় আকাশ একদম পরিস্কার। অনির্বান ঠিকই বলেছে, "প্রেমিকার মতন পাহাড়েরও মন বোঝা দায়, খামখেয়ালি কিন্তু বড়ই প্রিয়!" (পাহাড়ের ডায়েরি ৩)। সানবার্ড লজের আতিথেয়তার জবাব নেই। আমরা ঘুম থেকে উঠেছি টের পেয়েই হাসিমুখে ধোঁয়া ওঠা চা নিয়ে এল পেমা। পেমা আর নিমা – পেমা সিরিং এর দুই আসিস্ট্যান্টের মুখে হাসি ছাড়া কিছু দেখিনি। সকালটা ঘরে বসে নষ্ট করার মানে হয়না। তাই চা খেয়েই বেরিয়ে পড়লাম। একটা অদ্ভুত পরিবেশ। চারদিকে নানারকম গাছ, তাদের কতরকম পাতা, ফুল। পাথরের গায়ে ফুটে আছে ফার্ন জাতীয় গাছ, বুনোফুল। সকালের নরম রোদ উঁকি মারছে পাতার ফাঁক দিয়ে। চারদিক নিস্তব্ধ, খালি কিছু পাখির ডাক শোনা যাচ্ছে। দূরের কোন পাহাড়ি গ্রাম থেকে একটা কুকুরের ডাক পাওয়া যাচ্ছে। মাঝে মাঝে গাড়ির আওয়াজ আসছে অনেক অনেক দূর থেকে। তারপর আওয়াজটা জোর হতে হতে আমাদের পাশ দিয়ে বেরিয়ে যাচ্ছে।

দুপুরের মধ্যেই তিনমূর্তি ফিরে এল গোর্খে থেকে। লাঞ্চ করতে করতে ওদের গোর্খে ট্রেকের গল্প শুনলাম। সেসব গল্প আপনারাও নিশ্চয়ই শুনে ফেলেছেন পাহাড়ের ডায়েরি (৩) এ? সন্ধ্যায় চা আর মোমো খেয়ে লজের সামনের লনে কাঠে আগুন জ্বালিয়ে ক্যাম্প ফায়ার হল। গল্প আড্ডার পর শুরু হল গানের লড়াই। খানিকবাদে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন পেমা সিরিং। কথায় কথায় জানা গেল তিনি বাঁশি বাজাতে পারেন। নিজে নিজেই বই-টই পড়ে শিখছেন দু বছর ধরে। আমাদের উপরোধে জনপ্রিয় নেপালি গান "রেশম ফিরি রে"র সুর তুললেন বাঁশিতে। তারপর মোবাইলে আরেকটা নেপালি গানের সঙ্গে শুরু হল নাচ। প্রেম সিরিং এর সঙ্গে তাল মিলিয়ে নেচে গেল পল্লব। ক্রমশ আগুন নিভে এল। আমরা উঠে পড়লাম। ব্যাগপত্র গুছিয়ে নিতে হবে। সকালেই রওনা দেবো এনজেপির উদ্দেশ্যে। সিকিম ভ্রমণ এবারের মত সাঙ্গ হল।

রাত্রে খাওয়ার জন্য ডাইনিং এ এসে দেখি পাসাং বসে আছেন। মাথায় ডেভি'স ল্যাম্পের মত আলো সমেত বেল্ট, সামনের টেবিলে মদের গ্লাস। তখন দশটা বাজে। বললেন এখান থেকে উঠেই ভার্সে যাবেন। কেমন আছেন জিজ্ঞেস করতে বললেন, "এভরিথিং ইজ ফাইন, হোয়েন অন দা টেবল দেয়ার ইজ আ গ্লাস অফ ওয়াইন!"

অনির বচন

মেঘপিওনের ব্যাগের ভিতর মনখারাপের দিস্তা
মন খারাপ হলে কুয়াশা হয়, ব্যাকুল হলে তিস্তা
মন খারাপের খবর আসে বনপাহাড়ের দেশে
চৌকোন সব বাক্সে যেথায় যেমন থাক্ সে,
মনখারাপের খবর পড়ে দারুণ ভালোবেসে...

সত্যি হয়ত আমাদের সাথেসাথে পাহাড়েরও মনখারাপ, নাহলে বেলাশেষে এত কুয়াশা সারা ওখরে জুড়ে! তিনজনে গোরখে থেকে ফিরেছি দুপুরবেলায়। ঠিক ছিল একটু রেস্ট নিয়েই ওখরেটা বিকেলের মধ্যেই দেখে নেব। পল্লব বলেছিল ওখরেতে মনেস্ট্রীটা অ্যাট লীস্ট দেখতেই হবে। সেইমত ঠিক হল চারটে নাগাদ পাঁচজনেই বেরোবো। অতনু শ্রীরূপা আগেরদিনই এসে গেছে তাই ওরা ওখরের ব্যাপারে আমাদের চেয়ে একটু বেশি ইনফর্মড। ওরাই বলল মনেস্ট্রী যাওয়ার দুটো ওয়ে আছে একটা তিনশ সিঁড়ি চড়াই আরেকটা শর্টকাট। আর স্বাভাবিকভাবেই আমরা শর্টকাটটাই বেছে নিলাম।

দুপুরের ওয়েদার ছিল একদম পরিষ্কার কিন্তু বেলা বাড়তেই দেখলাম খারাপ হতে শুরু করেছে। সানবার্ড হোমস্টে থেকে ভিউ চমৎকার । জানালা দিয়েই দেখা যায় সিঙ্গালীলা রেঞ্জের প্যানারোমিক ভিউ। বাঁদিক ঘেঁষে সিঙ্গালীলার হায়েস্ট পয়েন্ট সান্দাকফু তারপর ফালুট, শ্রীখোলা, গোরখে আর একদিকে রিম্বিক আর ঠিক তার পিছনেই "অতিধীর, গুরুগম্ভীর" হিমালয়। হোমস্টের ডরমিটরির কাঁচের বিশাল জানালা দিয়েই দেখতে পেলাম কুয়াশার মতন মেঘ ভেসে আসছে আমাদের দিকে।

শর্টকাটটা হোমস্টে থেকে বেড়িয়ে বাঁদিকে । সেই দিকে কিছুক্ষণ হাঁটার পরও আমরা কোনো রাস্তা পেলামনা তারপর আরেকটু এগোতেই চোখে পড়ল ডান দিকের পাহাড়ের গায়ে কিছু ফুটস্টেপস্। সিঁড়ি বা রাস্তা বলে কিছু নেই বরং সেই ফুটস্টেপস্ গুলোই খাঁড়া উঠে গেছে উপরেরদিকে। কোথায় গেছে নীচ থেকে ঠাওর করা যাচ্ছেনা। শর্টকাটের এমন বহর দেখে অতনু শ্রীরূপা রনে ভঙ্গ দিল বলল ওরা নীচেই ঘুরে কাটবে বিকেলটা সম্ভব হলে তিনশ সিঁড়িযুক্ত পথটা ধরবে। শেষঅবধি আমরা তিন বাঙলা মায়ের দামাল ছেলে আবার পাহাড় চড়া শুরু করলাম। ডেস্টিনেশন ওখরে মনেস্ট্রী।

ওঠার পথ বলতে কিছুই নেই।সেই দিয়েই কোনোরকমে তিনজনে উপরে উঠলাম। দুপুরের ওইরকম জম্পেশ্ খাওয়ার পর এই চড়াই ভাঙার জন্য রীতিমত কসরত করতে হল তিনজনকেই। উপরে উঠে পাকদন্ডী বেয়ে একটু গিয়ে যখন পাকা রাস্তা পেলাম তখন আমাদের চারপাশে এক কুয়াশাচ্ছন্ন বিকেল। এইসব দিকে লোকজন অনেকটা কম, তাই মনেস্ট্রীটা কোনদিকে জানার জন্য লোক পাচ্ছিলামনা তার উপর এমন মেঘ যে দশহাত ডিসটেন্সও পুরো ব্লাইন্ড। পলু ভরসা । ও ওর ইনবিল্ট জিপিএস নেভিগেট্ করে ডান দিক ধরে হাঁটতে শুরু করল ,আমরাও ওর পিছু নিলাম। মেঘের ভিতর দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে খালি মনে হচ্ছিল যেন সময় থেমে গেছে। এখানে সময় থেমে থাকে পাহাড়ের গায়ে, নাম না জানা পাখিদের গলায়, পাইনের শ্যাওলা-ধরা কান্ডে, যে লোকগুলো মাথায় কিলোকিলো সামান চাপিয়ে টুকটুক করে এগিয়ে আসে তাঁদের পায়েপায়ে। সময় থেমে থাকে।

পলুর আন্দাজ একদম ঠিকঠাক। কিছুটা গিয়েই আবছা চোখে পড়ল একটা ঘর আর দুটো স্তূপ। অনেকগুলো লম্বাটে পতাকা উড়ছে। আসার সময়ই জেনে ছিলাম এই পতাকাগুলোতে লেখা থাকে সম্ভবত টিবেটিয়ান ভাষায়। মনেস্ট্রীর নাম "দি উরগেন থং মনলিং মনেস্ট্রী"। ১৯৫২ তে দরজী লামা এটি তৈরি করেন এবং ১৯৬৬ তে দুক্পা লামা দায়িত্বে এসে এখানে একটি ছেলেদের মনেস্টিক স্কুল স্থাপন করেন যেটি আজও চলছে। বর্তমানে ৪৫ জন বৌদ্ধ

ভিক্ষু আছেন এই মনেস্ট্রীতে। "মঙ্ক " থেকেই এসেছে "মনেস্ট্রী" আর "মঙ্ক "এসেছে "মনো" থেকে। অ্যালোন। বৌদ্ধইসম্ এর তত্ত্বীয়ভাব বোধিলাভ। কে জানে হয়ত একাকীত্বই বোধলাভের একটা পথ!

বাইরের ঘিরে থাকা প্রেয়ার হুইল ঘুরিয়ে তিনজনে ঢুকে গেলাম মনেস্ট্রীর ভেতরে ,ভিতরে দুজন লামা ছিলেন । একজন একটা বই পড়ছিলেন ঠিক যেমনটি আমরা পাঁচালি পড়ি তেমনটি , আরেকজন একটি ছবি পরীক্ষণ করছিলেন। মনেস্ট্রীর ভেতরে অদ্ভুত এক অ্যাম্বিয়েন্স। ববের একদম শান্তভাব আর পলু চারদিকে ঘুরে ঘুরে মোবাইলে ছবি তুলতে লাগল। ভিতরের দেওয়াল আর ছাদ কাঠের আর তার উপর অদ্ভুত কারুকার্য করা। "ওয়ার্ক অব্ আর্ট"। মনেস্ট্রীর উপাস্য দেবতাটিও অদ্ভুতদর্শন। পলু জিগ্গাসা করাতে জানা গেল নাম গুরু রিন্পোচে। তাঁর এক পাশে বুদ্ধের ইন্কারনেশন্। এছাড়াও আরো অনেক কিছু যেমন দুটো শাঁখ যাকে বলে "কারদুং", দুটো বড় (দুংচেন) আর দুটো ছোট(কাংলিং) ট্রাম্পেট জাতীয় বাজনা, কয়েকটা বই, কাঠের বাঁশি জাতীয় একটা বাজনা (গিয়ালিং) আর কিছু লাল শালুজাতীয় কাপড়।

কিছুক্ষণ থেকে আমরা বেড়িয়ে এলাম। বব একদম নেতিয়ে গেছল। বেড়িয়ে এসে বললাম "ওম মনি পদ্ মে হুম", পলু জবাব দিল "হুমম্"। মনে হল ববেরই যেন এই ক'মিনিটে বোধিলাভ হয়ে গেছে। বেড়িয়ে দেখলাম তখনো আলো আছে। পলু ওখানেই একটি কালো তুলতুলে কুকুরছানাকে চট্ করে দিব্যি আদর করে নিল। তারপর আমরা ফেরার পথ ধরলাম, সামনে সেই তিনশ সিঁড়ির উতরাই।

মেঘ তখন একটু পাতলা হয়ে এসেছে আমরা পাইনবনে ঘেরা আঁকাবাঁকা সিঁড়িপথ দিয়ে এসে নামলাম পাকা রাস্তায়। মাইলস্টোনে লেখা টেন মাইল। বুঝলাম আমরা সানবার্ড থেকে এক মাইল দূরে আছি কারন ওটা ইলেভেন মাইলে। পাহাড়ের রাস্তা ধরে গোধূলিকালীন আলোতে ফেরার অনুভূতি আলাদা। পাকদন্ডী পথ। আমরা এগিয়ে চলেছি হোমস্টের দিকে। দুপাশে গাছেদের সারি পাহাড় থেকে নেমে এসেছে রাস্তার ধারে। দুটো বাঁক নিতেই চোখে পড়ল আমাদের আস্তানাটা। দূর থেকে দেখা যাচ্ছে। মনে হল এই তো এসে গেছি কিন্তু আসছে কোথায়? পাহাড় হল

মেয়েদের মন ,মনে হয় নাগালের মধ্যেই তো আছে কিন্তু যত কাছে যাওয়া যায় ততই দূরে সরে যায়। বড়ই কঠিন বাস্তব।

তিনজনে এগিয়ে চললাম। বব রাস্তায় শুয়ে পোজ্ দিয়ে খানকতক ছবি তুলে নিল। হঠাৎ ববের মাথার কাছদিয়ে চৌকো ঘুড়ির মত কি একটা উড়ে এ গাছ থেকে ওগাছে চলে গেল। "জায়েন্ট ফ্লাইং স্কুইরল্" গ্লাইড করে চলে গেল আমাদের সামনে দিয়ে। ঠিক যেন একটা বাদামী রঙের খোলা বই উড়ে গিয়ে পড়ল। তিনজনে দেখলাম একটা গাছের ডালে গিয়ে আটকে রইল চুপচাপ। এ ও এক দেখা।

পাক্কা আড়াই ঘন্টা লাগল। চারটে তে বেড়িয়ে ফিরলাম সাড়ে ছটায়। পেমাজিকে বলে একটা ক্যাম্পফায়ার অ্যারেঞ্জ করা হল। শ্রীরূপা আগে ফিরেই মোমোর ব্যাবস্থা করে রেখেছিল ,এসব ব্যাপারে ও ঠিক "মায়ের মতন ভালো"। সান্ধ্যভোজ সেরে আমরা চললাম ক্যাম্পফায়ার করতে। পলু শ্রীরূপা আর বব গাইবে আমি আর অতনু বেসুরো (বরং অসুর বলা ভালো) তাই আমরা শ্রোতা। অদ্য শেষ রজনী , তাই শেষটুকু চেটেপুটে নেওয়া আর কি! কাল ভোরেই তো ফেরা।

মনে পড়ে যাচ্ছে "তিতলির" সেই গান যেটা দিয়ে শুরু করেছিলাম ,

...মেঘের ব্যাগের ভেতর ম্যাপ রয়েছে,
মেঘপিওনের পাড়ি,
পাকদন্ডী পথ বেয়ে তার
বাগানঘেরা বাড়ি
বাগান শেষে সদর দুয়ার
বারান্দাতে আরামচেয়ার

কালচে পাতা বিছানাতে ছোট্ট রোদের ফালি
সেথায় এসে মেঘপিওনের সমস্ত ব্যাগ খালি...

কিন্তু আমাদের ব্যাগ খালি নেই বরং ভরে উঠেছে দারুন এক ঘোরার আনন্দে,অনন্য অভিজ্ঞতায়....!!

পেমা সিরিং এর বাঁশিতে "রেশম ফিরি রে" শুনুন এই ভিডিও তে।

ওখরে সানবার্ড লজের ডিটেলসঃ

Sunbird Lodge
Okhrey, West Sikkim – 737121
P. T. Sherpa. (Phone – 9647811674)
pema.ribdi@gmail.com

৫

শ্রী-তনু-র শেষকথা

সাড়ে নটা বেজে গেল কিন্তু সাগরভাই বা তার গাড়ির দেখা না পেয়ে সবারই কপালে চিন্তার ভাঁজ। এন জে পি তে ট্রেন বিকেল ৬টায়। এমনি তে ৭ ঘন্টার রাস্তা। কিন্তু অনি বলেছে যতটা পারা যায় সময় হাতে নিয়ে বেরোতে হবে। পাহাড়ি রাস্তা কখন কোথায় ধ্বস টস নেমে বন্ধ হয়ে যায় তার ঠিক থাকে না। আমরা দাঁড়িয়ে ছিলাম ওখরের সানবার্ড লজের সামনে। সিকিম ভ্রমণ সাঙ্গ করে এবার আমাদের ফেরার পালা। গতকাল পূর্বা ডিকি দিদির হাতে গড়া সিকিমি মোমো আর আড্ডা, ইয়ার্কি, নাচ, গান, নেপালি বাঁশির সুরে ক্যাম্প ফায়ারের মাধ্যমে জমে উঠেছিল সিকিম ট্রিপের অন্তিম রজনী। এত আনন্দের মাঝেই মনখারাপের মেঘ ঘনিয়ে আসছিল। কাল সকাল থেকেই আবার

যে যার জীবনে ফিরে যাব। মনের মেঘ কাটাতে তাই বেশী করে করে পরের ট্রিপের প্ল্যান এর দিকে মনোনিবেশ করছিলাম।

সাগরভাইয়ের দেখা পাওয়া গেল তখন ঘড়ির কাঁটা দশটা ছুঁই ছুঁই। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে পেমা সিরিং এর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে মালপত্তর নিয়ে গাড়িতে উঠে পড়লাম। ঠাণ্ডা হাওয়া তখনও হাড় কাঁপাচ্ছিল। মনে মনে ভাবলাম আর কিছুক্ষণ, তারপরেই এই এক দমক ঠাণ্ডা হাওয়ার জন্য মনটা হু হু করে উঠবে। এঁকা বেঁকা রাস্তা দিয়ে গড়ি ছুটছিল। একদিকে পাহাড়, অন্যদিকে ধাপ কাটা উপত্যকা। কোথাও নদী আবার কোথাও বা গভীর খাদ। মনে হচ্ছিল কোন video যেন rewind করছি। ঠিক যেমন যেমন হচ্ছিল আসার দিন, আজও ঠিক একই রকম সবকিছু। সেই রাস্তা, সেই প্রকৃতি, সেই সাগরভাইয়ের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্ন জিনিস পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব, সুন্দরী মেয়েদের লিফট দেওয়া, গাড়ীর অডিও জ্যাকে আমাদের মোবাইল গুঁজে চিরপরিচিত গান। তফাৎ শুধু একটাই – যাওয়ার দিন মনে ছিল অসম্ভব একটা আনন্দ, curiosity, excitement আর এখন মনে পরিতৃপ্তির স্বাদ আর অল্প অল্প মনখারাপ।

২টোর সময় যখন শিলিগুড়ির কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামের সামনে নামলাম তখন মনে হল যেন স্বর্গ থেকে নরকে নেমে এসেছি। গাড়ির জ্যাম আর প্রচণ্ড গরমে মনে হচ্ছিল শিলিগুড়ি নয়, কলকাতার এম জি রোডে দাঁড়িয়ে আছি! বব চটপট সবার জন্যে আখের রস এনে দিল। ছায়ায় দাঁড়িয়ে সেটা শেষ করার আগেই দেখি দলনেতা অনির্বান সামনের দিকে হাঁটা লাগিয়েছে। অনির্বানকে নেতার পদে পেতে হলে এটা মেনে নিতেই হবে। ও কোথায় যাচ্ছে, কেন যাচ্ছে কোন প্রশ্ন করা চলবে না। শুধু বাধ্য সৈনিকের মত অনুসরণ করতে হবে। তবে অনুসরণ করে পস্তেছি বলা যাবে না। এবার যেমন অনির্বানের পিছু পিছু গিয়ে দাঁড়ালাম "হোটেল নন্দিতা"র সামনে। হোটেল দেখেই খিদেটা চাগাড় দিয়ে উঠল। মধ্যাহ্নভোজ শেষ করে উঠে অনির্বান বলল, "পান খাবি তো? চকোলেট পান?" একে পান, তার ওপর চকোলেট! এ লোভ কি সামলানো যায়! আবার সকলে লিডারকে অনুসরণ করলাম।

এতদিন লালরঙের ভিজে কাপড় দিয়ে পানপাতা চাপা দেওয়া গুমটি থেকে ৬ টাকার পান কিনে খেয়েছি। শিলিগুড়ির পান প্যালেসে এসে চমকে চ! কাঁচে ঘেরা শীততাপনিয়ন্ত্রিত দোকান। একদিকে নানা ধরণের তামাক আর পানীয় রয়েছে। চাইলে হুঁকোও খাওয়া যেতে পারে। অন্যদিকে বিভিন্ন রকম পান আর আইসক্রিমের সম্ভার। চটপট চকোলেট পান চলে এল সাদা প্লেটে করে। সাধারণ পানের দ্বিগুণ। ওপরে চকোলেটের কোটিং তার ওপর একটা লাল চেরী বসানো। বেশ কসরত করে কামড় দিলাম। চকোলেট, মিঠা পাতা পান আর হরেক রকম ড্রাই ফ্রুটসের অংশবিশেষ স্বাদকোরক ছুঁতেই অদ্ভুত একটা স্বর্গীয় শান্তি অনুভব করলাম। একে পান বললে ভুল হবে, একটা গোটা মিলের সমান! অনি যদি আগে বলত লাঞ্চ টা স্কিপ করে পানভোজন করেই কাটিয়ে দিতাম। এই চকোলেট পান দলনেতার তরফ থেকে আমাদের ট্রিট। পান খাইয়ে ট্রিট দেওয়া শুনে যাঁরা ভুরু কোঁচকাচ্ছেন তাঁদের জানিয়ে রাখা যাক আমরা যে চকোলেট পানগুলো খেলাম তার এক একটার দাম ১৩৫ টাকা। দেয়ালে টাঙানো রেট চার্ট দেখে আরো জানা গেল ঐ দোকানের সবচেয়ে দামী পানের দাম ৭০০ টাকা!

উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস এনজেপি ঢুকলো আধঘন্টা দেরিতে। আমাদের সবারই সিট একসঙ্গে পড়েছিল। খালি পল্লবের একটু দূরে। এক্সচেঞ্জ করার লোক খুঁজে খুঁজে যখন হাল ছেড়ে দিলাম তখনই জানলার ধার থেকে একটা দাড়িওলা ছেলে গোঁফের তলা দিয়ে হাসতে হাসতে বলল, ''চিন্তা করবেন না, আমি ঐ সিটটায় চলে যাব।" হাতে একটা বই নিয়ে বসে সে আমাদের কার্যকলাপ দেখছিল। কিন্তু তাকে আর ছাড়া গেল না। কারণ কয়েক মিনিটের মধ্যেই সেই সুজন বণিক আমাদের গ্রুপে একদম খাপে খাপ হয়ে মিশে গেল। ডিটেকটিভ গল্প থেকে ফুটবল, বেড়ানো থেকে খাওয়াদাওয়া আড্ডা আর হাসিঠাট্টায় তুফান তুলে অন্য সহযাত্রীদের যথেষ্ট বিরক্তি উৎপাদন করে যখন শোয়ার তোড়জোড় করলাম তখন আর খেয়াল করা হল না কে কার সিটে শুচ্ছে!

আগামীকাল ভোরের আলো ফোটার আগেই যে যার গন্তব্যে নেমে পড়ব। কিছু কিছু সময় থাকে যেখানে আমরা আটকে যাই। এই ৫ দিন ঠিক তেমনি। অসাধারণ অবাক করা প্রকৃতি আর আমরা ৫ জন এমন বন্ধু যারা শুধু বন্ধু নয়, একটা পরিবারের অংশ। আড্ডা, গল্প, হাসি, ইয়ার্কি, অ্যাডভেঞ্চার – প্রকৃতির এক অদ্ভুত কম্বিনেশন। আজও ওখানেই আটকে আছি। রোজই স্বপ্ন দেখি কোন এক অজানা রাস্তায়, অপরিচিত পরিবেশে আমরা পাঁচজন খিল্লি করতে করতে হেঁটে চলেছি।

অপেক্ষা নেক্সট ট্রিপের।

ট্যুর প্ল্যানঃ

ট্রেনযাত্রা বাদ দিয়ে এই ট্রিপটা পাঁচদিনের। ***প্রথমদিন*** সকাল সকাল নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনে নামুন। শেয়ারে বা রিজার্ভ করে গাড়ি নিয়ে ১৩০ কিলোমিটার দূরে ওখরে বা আরো ১০ কিলোমিটার এগিয়ে হিলে তে চলুন। ৭-৮ ঘন্টা লাগবে। হিলে তে একটি মাত্র ট্রেকার্স হাট। থাকার ব্যবস্থা আরামদায়ক নয়। ওখরে তে অনেক ভালো লজ/ হোমস্টে পাবেন। কিন্তু ওখরে তে থাকলে পরদিন সকালে গাড়ি করে হিলে যেতে হবে। ***দ্বিতীয়দিন*** ২-৩ ঘন্টা ট্রেক করে ভার্সে যান। ভার্সেতে গুরস কুঞ্জ বা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লজে থাকুন। ***তৃতীয়দিন*** সকালে ট্রেক করে হিলেতে নামুন। সেখান থেকে ২ ঘন্টা গাড়িতে ভোরেং যান। ভোরেং থেকে আবার ঘন্টা দুয়েকের ট্রেক করে গোর্খে পৌছন। ইডেন লজে রাত্রিবাস করুন। ***চতুর্থদিন*** আবার ট্রেক করে ভোরেং আসুন। ভোরেং থেকে গাড়িতে ওখরে। বিকেলের দিকে ওখরে মনাস্ট্রি দেখে নিতে পারেন। ***পঞ্চমদিন*** সকালে গাড়ি করে নিউ জলপাইগুড়ি আসুন।

বিঃ দ্রঃ রডোডেনড্রনের বাহার দেখতে হলে মার্চ মাসের শেষদিক থেকে মে মাসের প্রথমদিকে মধ্যে যেতে হবে। ভোরেং থেকে থেকে গোর্খে ট্রেকটা একটু কঠিন হলেও হিলে-ভার্সে ট্রেকটা খুব বাচ্ছা বা বৃদ্ধ ছাড়া যেকোন সুস্থ মানুষ করতে পারবে।

দরকারি ফোন নম্বরঃ

1. Dipankar Dey (Majestic Himalayan Treks & Tours): 9749061941, 9733828481
2. Raj Nambang (Hilley Tour & Travel): 9733271137, 9593980310
3. Gopal Thapa (Pusai) (Barsey Home Stay): 9733412807, 9547219305
4. P. T. Sherpa (Sunbird Lodge Okhrey): 9647811674

সময়টা চারটে চল্লিশ

দীপ্তজিৎ মিশ্র

সেপ্টেম্বর ২৬, ২০১৭

'স্যর, পঞ্চাননতলা, ফাঁসিতলা, দুদিকেই বিশাল জ্যাম। ব্রিজে গাড়ি তুলব কী করে?' প্রশ্নটা শুনে চটক ভাঙল অরিজিতের। ও হ্যাঁ! তাই তো! আজ তো কী সব মিটিঙ আছে। ওদিকে ট্যাক্সিড্রাইভার বোকার মতো তাকিয়ে আছে। তাকে স্যর অনিচ্ছা সত্তেও ইন্সট্রাকশন দিলেন, 'এক কাজ করো, শরৎ সদন দিয়ে গাড়ীটা ঘুরিইয়ে নিয়ে কোর্টের পাশ বরাবর হয়ে রামকৃষ্ণপুর ঘাট হয়ে চলো।'

সাধারণতঃ এই র‍্যুটটা অরিজিৎ বরাবর এড়িয়ে চলেন আজ বছর পাঁচেক তো হলই। আজ আর কোনো উপায় নেই বলে যেতে হচ্ছে তাঁকে। গাড়িতে যাওয়ার সময় এসি গাড়ি হলেও কাচ নামিয়ে রাখেন, গাড়িটা যখন দেখলেন শরৎ সদনের দিকে ঢুকছে, হঠাতই সব কাচ তুলে দিয়ে এসি চালিয়ে দিলেন তিনি। গাড়ীটা বেশ। কাচগুলো কালো। তাই বাইরেটা দেখা যাচ্ছে না। এই অঞ্চলটা অরিজিতের হাতের তালুর মতো চেনা। তবু কাচটা তুলে দেওয়ায় স্বস্তি পেলেন তিনি। আর যাই হোক মনের মধ্যে সেই অসাধারণ বন্ধুত্বের, সম্পর্কের স্মৃতিটা মনের মধ্যে রোমন্থিত হলেও সেই পরিবেশটা না দেখতে হলে তাঁকে অতটাও কষ্ট পেতে হবে না। হাওড়া স্টেশনে এমনিতেই অনেক কষ্ট অপেক্ষা করছে, আর না। চোখ বন্ধ করে রামকৃষ্ণপুর ঘাট, রেলওয়ে মিউজিয়াম এসব জায়গাতে সেই প্রিয় মানুষটাকে পিক আপ করা, ড্রপ করে দেওয়া, কত বোকাবোকা প্রেমিকমার্কা ফিলোসফি বলে নিজেই হেসে ফেলা, সব মনে করতে লাগলেন অরিজিৎ। বা বলা ভাল মনে পড়তে লাগল তাঁর।

অরিজিৎ চ্যাটার্জী। যাদবপুর ইউনিভার্সিটি থেকে জন মিলটনের ওপর রিসার্চ ওয়ার্ক করে ইংলিশ ক্রিটিক জগতে এক কিংবদন্তী। পেশায় যাদবপুরেরই মাস্টার্স কোর্সের লেকচারার। বর্তমানে তিনি ফরাসী ফোনেটিকসের ওপর রিসার্চ করছেন, ফরাসী ভাষার প্রভাব ইংরেজি সাহিত্য এবং বাংলা সাহিত্যে ঠিক কতটা, সেটা নিয়েই তাঁর কাজ। অবশ্য এ কাজে তাঁর সহকারী আছে। বা বলা ভালো তিনি তাঁর এক ছাত্রের পথপ্রদর্শক এই কাজে। অর্ক খুব ব্রাইট স্টুডেন্ট। সাধারণতঃ অরিজিৎ কাউকে কোনো রিসার্চ ওয়ার্কে গাইড করেননা। কিন্তু একে করছেন। ছেলেটার পরিশ্রমের ওপর কীরকম মায়া পড়ে যাওয়ায় অর্কের অনুরোধটা তিনি ফিরিয়ে দেন নি। কিন্তু এত ব্যস্ত মানুষ হওয়া সত্ত্বেও তিনি খুব একটা কারুর সঙ্গে মেশেন না। আজ চোখ বন্ধ করে তিনি এরকম পালটে যাওয়ার কারণটা ভাবছিলেন। সত্যিই এরকম হতে পারে? ব্যাপারটা তো তাঁর কলেজ জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা! ব্যাপারটা যে তাঁর মধ্যে এভাবে দাগ ফেলবে তিনি ভাবতে পারেননি। যে জন্যে তিনি যেসব জায়গার সঙ্গে তাঁর সেই কষ্টকর স্মৃতি জড়িয়েছিল, সেই জায়গাগুলোকে আজও তিনি এড়িয়ে চলেন। এমনকি অর্কর সঙ্গে ফীল্ডওয়ার্কে কাজ করার সময়ও তিনি সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। সাধারণতঃ কোনো বড় অ্যাসাইনমেন্ট থাকলে গাইডরা সঙ্গে থাকেন স্টুডেন্টের বা খুব বাজে পরিস্থিতি হলে গাইডরা নিজেরাই ক্রেডিট নিয়ে নেন কাজটা সফল করার। কিন্তু এক্ষেত্রে সেটা ঘটেনি।

অর্ক একদিন হঠাতই তাঁর অফিসে এসে বলেছিল, 'স্যর এক ভদ্রলোকের সন্ধান পেয়েছি। ক্রুশিয়াল লীড দিতে পারবেন তিনি। যাবেন?' লাফিয়ে উঠেছিলেন অরিজিৎ। কোথায় থাকেন সেই ভদ্রলোক, কিছু না জিজ্ঞাস করেই বেরিয়ে পড়েছিলেন অর্কের ঠিক করে আখা ট্যাক্সিতে। গড়ী যখন রাসেল স্ট্রীটে ঢুকছে, তখন অরিজিতের প্রশ্নে অর্কে জবাব দেয় তাঁর বাড়ি পার্ক স্ট্রীটের গোরস্থানের পাশে। অরিজিৎ আর যেতে চাননি। ট্যাক্সি থেকে নেমে, অর্ককে কী কী প্রশ্ন করতে হবে বুঝিয়ে দিয়ে বাড়ী ফিরে গেছিলেন। অর্ক বোকার মতো তাকিয়েছিল। ব্যাপারট থেকে সত্যিই একটা ক্রুশিয়াল লীড পাওয়া গেছিল। অর্ক কাল অফিসে এসে বলেছিল চন্দননগর যেতে হবে। শুনেই অরিজিতের মুখটা কেমন থমথমে হয়ে যায়। তারপরেই তিনি বলেন, 'ফরাসডাঙা তো যেতেই হবে। বাংলায় ফ্রেঞ্চের এফেক্ট তো ওখানেই বেশি। কিন্তু ওখানে গিয়ে কার সঙ্গে যোগাযোগ করবে?'

'স্যর সেসব হয়ে যবে। আপনি যাবেন তো? আমি আজই যাচ্ছি। আপনি কাল এলেও হবে।'

মাথার মধ্যে আবছা হয়ে আসা কিছু কথা, কিছু স্মৃতি ফুটে উঠছিল অরিজিতের। তবু তিনি রাজী হলেন। 'ঠিক আছে স্যর। বিকেল চারটে চল্লিশে হাওড়া স্টেশন থেকে বিশ্বভারতী প্যাসেঞ্জার ছাড়ে। ওটাতে চলে আসুন। তাড়াতাড়ী হবে।।'

চারটে চল্লিশ? বিশ্বভারতী? অরিজিতের মনে পড়ে যায় প্রিয় মানুষটার তাড়াহুড়ো এই ট্রেনটার জন্যে। হঠাত করে যে কী হয়ে গেল!

'স্যর, যাবেন তো?'

'অ্যাঁ? হ্যাঁ, যাবো। তুমি স্টেশনে থেকো।'

'শিওর স্যর।'

এসব ভাবতে ভাবতেই কখন হাওড়া এসে যায়। যথারীতি অ্যারাইভাল ডিপার্চার স্ক্রীন দেখেন অরিজিৎ। নাঃ, টাইম শুধু না, প্ল্যাটফর্মটাও পালটায় নি। সেই দশ নম্বর। মনের মধ্যে আবার ভীড় করতে থাকে সেই 'প্ল্যাটিনাম ভ্যালুড' কয়েকটা মাসের স্মৃতি। ভাবতে ভাবতেই কখন পৌঁছে গেলেন তিনি চন্দননগর। অর্ক ছিল স্টেশনে। আর চন্দননগরের ফটকগোড়া? সে তো মেমোরির ডিপো। তাই স্টেশনে নেমে থেকেই তিনি একটু চুপচাপ ছিলেন। অর্ক অনেক কিছু বলছিল, কানে ঢুকছিল না অরিজিতের। হঠাৎই সামান্য দূরে একজনকে দেখে অরিজিৎ অবাক হয়েই ডেকে উঠলেন, 'প্রশান্তকাকু!'

যাঁকে ডাকা হল, তাঁর বয়স দেখে মনে হয় অন্ততপক্ষে ষাট। বয়সের ভারে একটু কুঁজো হয়ে গেলেও হাঁটাচলা দেখে বোঝা গেল যে এখনও দেহমনের দিক থেকে যথেষ্ট সুস্থ তিনি। অরিজিতের ডাকটা শুনে তিনি থামতেই অরিজিৎ প্রায় দৌড়ে গিয়ে তাঁকে প্রণাম করলেন। একটু ইতস্তত করে বৃদ্ধ বললেন, 'থাক থাক, কিন্তু তোমায় তো ঠিক চিনতে পারলাম না!'

অরিজিৎ তাতে একটুও দমলেন না। বরং যেন কতদিনের চেনা, এভাবে উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'না চেনারই কথা। মৌ — ইয়ে, মানে মধুপর্ণার সাথে একবারই আপনার বাড়িতে গেসলাম। সেও বহুদিন আগের কথা। তখন আমি ফার্স্ট ইয়ারের স্টুডেন্ট। তবে হ্যাঁ, আমার নামটা আপনার মনে থাকা উচিত। আমাকে নিয়ে বেশ খানিকটা গোলমাল হয়েছিল বটে।'

'কী নাম বলোতো?'

'অরিজিৎ। অরিজিৎ চ্যাটার্জী।'

বৃদ্ধের চোখ দেখে বোঝা গেল স্মৃতির অতলে ডুব দিয়েছেন তিনি। যদি কেউ থট রিডিং পারত, তাহলে হয়তো দেখতে পেত বৃদ্ধের মনে পড়ছে অনেক অশান্তি, অনেক ঝগড়া, মারপিট, এবং পরবর্তীকালে অরিজিতের হঠাৎ কোনো খবর না পাওয়া থেকে ব্যাপারগুলো আস্তে আস্তে ঠান্ডা হয়েছিল। সেকেন্ড দশেক এভাবে চিন্তার মধ্যে থাকার পর তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, মনে পড়েছে। তা হঠাৎ এখানে?'

'এখানে এসেছি কাকু একটা জরুরী কাজে। জাস্ট এলাম। আজকের রাতটা থাকব, এখানে এক পরিচিত আছেন। কাল কাজ শেষ করে ফিরে যাবো।'

'তা বেশ তো, রাতের খাওয়াটা না হয় আমাদের এখানে—'

'থাক কাকু, আমার বলা হয়ে গেছে আমার রিলেটিভের বাড়িতে। কেন খামোকা অসুবিধে পোয়াবেন আমার জন্যে?'
'আচ্ছা বেশ। কিন্তু তুমি এখন কী করছ সেটা বললে না তো?'

'আমি এখন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের লেকচারার।'

'তোমার তো খুব লিটারেচারের প্রতি টান ছিল। রিসার্চ করবে বলেছিলে কিছু লেখা নিয়ে, তা সেটা হয়েছে?'
অরিজিৎ ছোট্ট করে হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, করেছি একটা ছোট কাজ।'

এতক্ষণ ফ্যালফ্যাল করে অর্ক দেখছিল। স্যারের ক্ষ্যাপামোর সব সহ্য হয়, শুধু এও এক্সট্রীম মডেস্টিটা বাদে। তাই এবার সে মুখ খুলল, 'অরিজিৎ স্যার জন মিলটনকে নিয়ে রিসার্চ ওয়ার্ক করে সারা পৃথিবীর সেরা ক্রিটিকদের মধ্যে একজন এখন।'

বৃদ্ধ অবাক। অরিজিৎ অপ্রস্তুত। তাই একটু হেসে তিনিই বললেন, 'ওঃ! আলাপ করানোই হয়নি। কাকু, এ আমার ছাত্র অর্ক, বর্তমানে এরই একটা রিসার্চে আমি সাহায্য করছি। ফোনেটিকস সংক্রান্ত। সেই সূত্রেই এখানে আসা। অর্ক, ইনি আমার এক কলেজমেটের বাবা, প্রশান্ত বোস।'

বৃদ্ধ এতক্ষণ অরিজিতের উন্নতিতে হতবাক হয়ে গেছিলেন। এবার তিনি বললেন, 'বাঃ বাঃ, মধুপর্ণাও তো কীসব ভাষা নিয়ে কাজ—'

'কাকু, এবার আমায় যেতে হবে। আসি?' বৃদ্ধকে মাঝপথে থামিয়ে দিয়ে বললেন অরিজিৎ।

'হ্যাঁ হ্যাঁ, এসো। সময় থাকলে একটু আসার চেষ্টা কোরো।'

'নিশ্চয়ই।' বলে অরিজিৎ অর্ককে প্রায় টেনে নিয়ে গিয়ে একটা টোটোতে উঠলেন, বললেন, 'স্ট্র্যান্ডের কাছে কোনো হোটেল থাকলে নিয়ে চলুন।'

***

টোটো চলছে তার রাস্তায়। অর্ক সবে মাত্র 'স্যর' কথাটা বলেছে, অরিজিৎ বলে উঠলেন, কেন, কী ব্যাপার, মিথ্যের কারণ কী, কিচ্ছু জিজ্ঞাসা করবে না। কারণ এখন আমি উত্তর দেব না। যদি কোনো দিন মনে হয় যে তোমার জানা উচিত এটা কী ঘটল, তবে বলব। অরিজিৎ তাঁর কথা শেষ করা মাত্র তাঁর ফোনে 'ডিড ইউ ডু ইট' বেজে উঠল। অরিজিতের এই ক্ষ্যাপামিটা স্যরের অদ্ভূত লাগে। যেটা মানুষের বাড়ির কলিং বেল হয়, সেটা কিনা নোটিফিকেশনটোন! অরিজিতের যদিও নোটিফিকেশন দেখে ভুরু কুঁচকে গেছে। অর্ককে ফোনটা দিয়ে বললেন, 'যতক্ষন না আমি হাওড়ায় পৌছচ্ছি, ফোনটার দায়িত্ব তোমার। যা কিছু নোটিফিকেশন, এস এম এস, ফোন কল, সব তুমি হ্যান্ডল করবে।'
'কী ব্যাপার স্যর?'

'আরে নিশি। লাইসিডাস নিয়ে কাজ করবে বলে পাগল করে দিচ্ছে, ওকে বুঝিয়ে পারছি না যে ওটা থেকে নতুন করে কিছু আর বের করার নেই। গত একমাস শান্ত ছিল। কাল থেকে আবার পোকাটা নড়েছে। ফোন, এস এম এস, সবই দেখবে নিশিরই আসবে আজ আর কাল। তুমি একটু হ্যান্ডল কোরো ভাই।'
অর্ক রাজি হয়ে গেল। ইতিমধ্যে হোটেল এসে গেছে। অর্ককে অরিজিৎ ২০০০টাকার একটা নোট ধরিয়ে বললেন, 'তুমি যেখানে উঠেছো, সেখান থেকে চেক আউট করে এখানে চেকইন করো। তোমার নামে ঘর বুক করিয়ে রাখছি। তুমি এগুলো সারো, ততক্ষন আমি একটু গড়িয়ে নিই।'

সেদিন আর বিশেষ কিছু কাজ হল না। অরিজিৎ এখানে অর্কের প্রোগ্রেসটা শুনলেন, কাল ওর সঙ্গে গিয়ে কয়েকজনের সঙ্গে একটু নতুন করে দেখা করবেন ঠিক করলেন।

***

পরদিন সব কাজ শেষ হতে হতে প্রায় বারোটা বেজে গেল। খাওয়াদাওয়া শেষ করে মৃত্যুঞ্জয়ের দোকানে যখন দুজনে দাঁড়িয়ে দই খাচ্ছেন, তখন হঠাতই 'এই যযাঃ' বলে অর্ক জিভ কাটলো।

'কী হল?'

'স্যর আর একজনের সঙ্গে মীট করতে হবে। আপনি আসার জন্যে ওয়েট করছিলাম। আমি একা দেখা করতে সাহস পাইনি। সরি স্যর। আর একটু ছুটতে হবে।'

অরিজিতের এই ভুলোমন অভ্যেসটা খুব ভালো লাগে। তিনি হেসে বললেন, 'আচ্ছা চলো।'
টোটো যখন চন্দননগর বঙ্গ বিদ্যালয়ের সামনে এসে থামল, তখন অর্ক দেখল অরিজিতের ভুরু কুঁচকে গেছে। অর্ককে

পেমেন্ট করতে না দিয়ে অরিজিৎ টোটোওয়ালাকে টাকা দিয়ে দেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমরা কার কাছে এসেছি অর্ক?'

'এখানকার হেডমিস্ট্রেস — মধুপর্ণা বোস। তিনি ফ্রেঞ্চ লেক্সিস নিয়ে রিসার্চ করেছেন, ইনিও একটা ক্রুশিয়াল লীড অ্যান্ড কনক্লুডিং।'

'বেশ। তাহলে তুমি যাও। আমি যাবো না।'

'স্যর?'
অরিজিৎ হেসে বললেন, 'কাজটা তো তোমার। তুমিই যাও। আমি বাইরে আছি। বেরোলেই আমায় দেখতে পাবে। তুমি আমার এনকোয়ারী স্টাইল জানো। অ্যাপ্লাই দ্যাট!'

অর্ক চলে গেল। চারতলায় হেডমিস্ট্রেসের অফিস। তাঁকে নিজের পরিচয় দিতে হেডমিস্ট্রেস সবেমাত্র কিছু জিজ্ঞাসা করতে যাচ্ছেন, অরিজিতের ফোনটা বেজে উঠল অদ্ভুত রিঙটোনে, ' আজগুবি চাল বেঠিক বেতাল, মাতবি মাতাল রঙ্গেতে, আয়রে তবে ভুলের ভবে অসম্ভবের ছন্দেতে।' অর্ক ফোনটা হাতে নিয়ে দেখল নিশি। এবার নিশিকে বেশ একটু কড়া করেই শুনিয়ে দিল অর্ক। কাল থেকে সাত বার ফোন করেছে। ফোনটা পকেটে পুরতে দেখল হেডমিস্ট্রেস অবাক হয়ে তার দিকে তাকিয়ে আছেন।

'সরি ম্যাম। হঠাতই ফোনটা এল। অ্যাম এক্সট্রীমলি সরি।'

'ফোনটা তোমার?'

'না ম্যাম। আমার স্যরের। আমাকে ফোনটা আপাতত রাখার দায়িত্ব দিয়েছেন।'

'কে তোমার স্যর?'

'অরিজিৎ চ্যাটার্জী, গোল্ড মেডালিস্ট, লেকচারার, জে ইউ।'

'তিনি আসেননি?' হেডমিস্ট্রেসের গলায় উৎকন্ঠা।

'এসেছেন, কিন্তু শুধু আমায় পাঠালেন। নিজে এলেন না। আমি অনেক করে বললাম—'

'ঠিক আছে। দাঁড়াও ওঁকে আনার ব্যবস্থা করি।' একটা কাগজে কিছু লেখে বেয়ারাকে দিয়ে নীচে গেটের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা ভদ্রলোককে দিয়ে আসার অর্ডার দিলেন।

দশ মিনিট বাদেই সিঁড়িতে একটা দুড়দাড় আওয়াজ শোনা গেল। ঝোড়ো কাকের মত চেহারা নিয়ে ভেতরে ঢুকে অরিজিৎ প্রথম প্রশ্নটাই করলেন, 'এত্ত ইগো? এখনো? কেন রে?'

অরিজিতের ঝোড়ো কাকের মতো চেহারা দেখে অর্ক ঘাবড়ে গেল। অর্ক কোনদিন তার স্যরকে এরকম অবস্থায় দেখেনি। অরিজিৎ বরাবরই ফিটফাট প্রকৃতির। সামান্য চুল ঘেঁটে গেলেও যে মানুষটা পকেট-চিরুনী দিয়ে চুল আঁচড়ে

নেয়, তার এ কী চেহারা? তার ওপর বোঝাই যাচ্ছে সদ্য সিগারেট খেয়েছেন। এটাও অরিজিতের একটা নতুন রূপ। এর আগে কখনো এক কুচি সুপুরি দিয়েও অরিজিতকে নেশা করতে দেখেনি অর্ক। হেডমিস্ট্রেসের মুখ সাম্য হাসি। তিনি বললেন, 'এখনো সিগারেটটা ছাড়তে পারলি না?'

প্রায় সঙ্গে সঙ্গে অর্ক বলে উঠল, 'স্যর? এ কী চেহারা হল আপনার? শরীর খারাপ করছে? আপনি সিগারেট খান?' অরিজিৎ কোনোমতে একটু ধাতস্থ হয়ে চেয়ারে বসে বললেন, 'আমি সিগারেট খাই কী খাই না, ছাড়তে পেরেছি কী পারিনি, সে কৈফিয়ৎ তোমাদের দেব না।' তারপর হাতের কাগজটা হেডমিস্ট্রেসকে দেখিয়ে বললেন, 'এর অর্থটা জানতে পারি? এত ঘ্যাম হয়েছে তোর? গাইড ছাড়া কোনো রিসার্চ স্কলারের সঙ্গে দেখাই করিস না!' 'করব না কেন? নিশ্চয়ই করি। কিন্তু যে স্কলারের গাইড মিস্টার অরিজিৎ চ্যাটার্জী, অর অ্যাস ইউসুয়াল, শুড আই সে, মাস্টার? হোয়াটএভার। তো সেই গাইডের সঙ্গে দেখা না করে কী ডিসকাশন শুরু করা যায়?'

'দেখা হয়েছে? এবার ডিসকাশন করে নে। আমার তাড়া আছে।'

'অরি, কেমন আছিস?'

'অবান্তর প্রশ্ন করিস না। তি খুব ভালোই জানিস যে প্রশ্নটা আপেক্ষিক। কেউ শারিরীকভাবে ভালো থাকলেও মানসিক ভাবে থাকে না, কেউ মানসিকভাবে ভালো থাকলেও শারিরীকভাবে থাকে না, কেউ দুদিক দিয়েই ভালো থাকে, কেউ দুদিক দিয়েই খারাপ থাকে, কেউ কিছু মানুষের সঙ্গে থাকলে মানসিকভাবে ভালো থাকে, কিছু মানুষের সঙ্গে থাকলে থাকে না, সুতরাঙ তোর প্রশ্নের জবাব দেওয়া অসম্ভব।'

'বাব্বাঃ! এখনো লেকচার দেওয়ার স্বভাবটা যায় নি দেখছি!'

হাসি ফুটল অরিজিতের মুখে, 'প্রেসেন্ট ডেসিগনেশনটাই তো লেকচারার। তাই অভ্যেস হয়ে গেছে লেকচার দেওয়া। যাকগে, তোরা একটু ক্যুইক ডিসকাশনটা করবি প্লিস? আমার কোলকাতায় কাজ রয়েছে। আর অর্ক, টেপরেকর্ডারটা নীচে দেখছিলাম গোলমাল করছে, একটু শর্টহ্যান্ডে লিখে নিও।'

যতক্ষণ ডিসকাশন চলল, ততক্ষণ অরিজিৎ পুরোপুরি চুপচাপ রইলেন। একটা কথাও তিনি বলেননি, শুধু দু-এক জায়গায় অর্ক কিছু পয়েন্ট মিস করে যাচ্ছিল, সেগুলো একটু ধরিয়ে দিলেন। আলোচনার শেষে যখন অরিজিৎ বেরোবার জন্যে উঠছেন, তখন হেডমিস্ট্রেস জিজ্ঞাসা করলেন, 'অরি, এখনো আমার ওপর রেগে আছিস, বল?' 'না তো! কেন?'

'সত্যি বল।'

'দেখ মৌ, কাসুন্দী অতিরিক্ত ঘাঁটলে তেতো হয়ে যায়, যেটা আমি করেছিলাম। আর পুরোনো কাসুন্দী ঘাঁটলেও সেম ব্যাপার হয়। তাই আর তেতো করিস না। বাই দ্য ওয়ে, কাকুর সঙ্গে দেখা হয়েছিল। আমার নাম শুনে তো মনে হল চিনতে পেরেছেন। যাকগে, আসি, এসো অর্ক।' অরিজিৎ বেরিয়ে গেলেন।

অর্ক এতক্ষণ এই কথোপকথন চুপ করে শুনছিল। স্যারের ডাক শুনে কোনোমতে বিদায়ী সম্ভাষণ জানিয়ে চলে গেল। যাওয়ার সময় দেখল হেডমিস্ট্রেস মধুপর্ণা বোসের মুখ থেকে হাসি মিলিয়ে গেছে। সেখানে এখন বৃষ্টির আগের থমথমে অবস্থা।

***

বঙ্গ বিদ্যালয় থেকে বেরিয়ে হোটেলে গিয়ে লাগেজ নিয়ে চেক আউট করা থেকে স্টেশনে পৌঁছে টিকিট কাটা, ট্রেনের জন্যে অপেক্ষা করা অবধি অরিজিৎ কোনো কথা বলেননি। অর্কের জিজ্ঞাসু দৃষ্টি তাঁর চোখে পড়লেও তিনি দেখেও না দেখার ভান করেছেন। দুপুরের ট্রেন ছিল। তাই বেশ ফাঁকাই ছিল গাড়ি। ট্রেনে উঠে অর্ক আর চুপ থাকল না, অরিজিতকে চেপে ধরল, 'ঢাক ঢাক গুড় গুড় চলবে না স্যর। খুলে বলুন না কী ব্যাপার!'

'সব কথা না জানলেও তোমার চলবে অর্ক।' ক্লান্ত গলায় বললেন অরিজৎ।

'স্যর, মাস্টার্স করতে যেদিন থেকে আমি জে ইউ তে ঢুকেছি, সেদিন থেকে আপনার ছায়ায় থেকে অনেক কিছু শিখেছি। এখনো কোথাও কোনো রিইউনিয়ন থাকলে নতুন মানুষদের সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দেওয়া হয় আপনার স্নেহধন্য বলে। আর তাছাড়া অন্যদের কাছে আপনি শুধুই স্যর। কিন্তু আমার কাছে তার চেয়ে অনেক বেশি কিছু। সেটা আপনি নিজেও জানেন। আর আপনিই তো বলেন যে মনে কোনো কষ্ট থাকলে তা শেয়ার করলে মনটা হাল্কা হয়ে যায়।'

'ইউ নটি বয়, ইউ হ্যাভ হিট অ্যাট মাই উইক ফিলোসফিস।' হেসে বললেন অরিজিৎ, 'শোনো তবে,' অরিজিৎ শুরু করলেন, 'হ্যাঁ, মধুপর্ণার সঙ্গে আমার কলেজের প্রথম জীবনে একটা ইমোশন্যাল সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। আমিই ইনসিস্ট করেছিলাম। মৌ প্রথম থেকেই আমায় সিরিয়াসলি বিষয়টা নিতে বারণ করত। আমি ভাবতাম আমি প্রচন্ড ইম্পালসিভ, তাই হয়তো সিরিয়াসলি নিতে বারণ করছে। তাই আমি ব্যাপারটা খুবই সিরিয়াসলি নিতাম, ওকে নানাভাবে বিরক্তও করে তুলতাম সেই সিরিয়াসনেসের জ্বালায়। মধুপর্ণা বলেই দিয়েছিল, সিরিয়াসলি নিলে নিজের রিস্কে নাও, পরে ভেঙে পড়লে আমার দায়িত্ব নেই। আমি তাও নিয়েছিলাম। কিন্তু পরে দেখলাম, সত্যিই মধুপর্ণা বিষয়টা সিরিয়াসলি নেয়নি। আমাদের বিষয়টা ওর, আমার দুজনের বাড়িতেই জানাজানি হয়ে গেছিল। আমার বাড়িতে ব্যাপারটা অ্যাকসেপ্ট করলেও কাকু, কাকিমা, মানে মৌয়ের বাবা-মা, আমার ওপর খুব রেগে যান। তার আগে থেকেই আমার আর মধুপর্ণার সম্পর্ক আর বন্ধুত্ব, দুটো সুতোতেই প্রচুর আঘাত পড়েছিল। এই ঘটনাটা শুধু আগুনে ঘি ঢেলেছিল। মৌ হঠাতই আমার সঙ্গে সব যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দেয়। তারপর আর ওর কোনো খবর পাই নি। তবে মাঝে মাঝে সুনতে পেতাম যে আমি ওর লাইফে, এমনকি বন্ধু-চক্রেও না থাকায় নাকি ওর জীবনটাই অন্য খাতে বইছে। ও নাকি অসাধারণ স্টুডেন্ট। হ্যাঁ। সেটা আমি জানতাম। কিন্তু সেই ধাক্কাটা আমি আজও সামলে উঠতে পারিনি। ব্যাপারটা ঘটার পর প্রথম প্রথম কষ্টগুলো সবাইকে বলতাম, তারপর আস্তে আস্তে নিজের কষ্টগুলো কনসীল করে নিই। তবে এখনো যেসব জায়গার সঙ্গে মৌয়ের স্মৃতি জড়িয়ে আছে সেগুলোকে এড়িয়ে চলি।
'যেমন পার্ক স্ট্রীট, চন্দননগর?'

'হুঁ। আরো আছে। দশ নম্বর প্ল্যাটফর্মের বিশ্বভারতী এক্সপ্রেস, রামকৃষ্ণপুর ঘাট –'

'আর ঐ কবিতার কেসটা কী স্যর?'

'ওটা তেমন কিছু না। আমি ঐ লাইনদুটো মধুপর্ণাকে হোয়াটসঅ্যাপের স্টেটাস করতে সাজেস্ট করেছিলাম। আমাদের শেষ কথা হওয়ার দিন অবধি সেটা ছিল। তার পর আমি ওটাকেই আমার রিংটোন করি। পাল্টাই নি আর সে থেকে।'

'স্যর, আপনার রুড বিহেভিয়ারে ম্যাডাম কষ্ট পেয়েছেন মনে হল মুখ দেখে। উনি হয়তো ব্যাপারটা আবার ঠিক করে নিতে চাইছিলেন।'

'জানি। কিন্তু ইচ্ছে করেই করলাম না আর ঠিক।'

'কেন স্যর?'

'আমি জানি, মধুপর্ণা যদি আবার আমার জীবনে ফিরেও আসে, আবার চলে যাবে। সেই চলে যাওয়ার ধাক্কাটা আর সামলাতে পারব না হে অর্ক। বয়সটা বেড়ে গেছে। ইমিউনিটি পাওয়ারটা কমেছে।' অরিজিৎ চুপ করলেন। ট্রেন তখন হাওড়ায় ঢুকছে। বাঙালবাবু ব্রীজের আলো আঁধারিতে তিনি দেখলেন অর্কের চোখে জল। দূর থেকে শোনা গেল স্টেশনের যান্ত্রিক অ্যানাউন্সমেন্ট, "ফাইভ থ্রী জিরো ফোর ফাইভ, বিশ্বভারতী ফাস্ট প্যাসেঞ্জার বিকেল চারটে বেজে চল্লিশ মিনিটে দশ নম্বর প্ল্যাটফর্ম থেকে ছাড়বে।"

কলকাতা – ১০৩

যদুবাবু

নভেম্বর ৬, ২০১৬

এই হাল্কা হাল্কা শীতকালের সকালে যদি মর্নিং ওয়াক করতে করতে চলে যান জামরুলতলায় আমাদের সেই ছোট্টো ভাড়াবাড়িটায়, একদম কোনের ঘরটায় দেওয়ালে দেখতে পাবেন, অল্প-অল্প খসতে থাকা পলেস্তারার পাশ থেকে, শাহরুখ খান আর মধুবালার থেকে নিরাপদ দূরত্বে একটা ঢাউস বাঁধানো ছবি – আস্তে আস্তে ড্যাম্প ধরে ঝাপসা হয়ে যাচ্ছে দিন কে দিন, ছবিটা মাটি থেকে দেখলে মাথামুন্ডু কিস্যু বোঝা যায় না, একটা ছাদে ইউনিফর্ম পরা গুচ্ছের লোকজন, লিট্যার‍্যালি-ই যাকে বলে 'দেড়শো খোকার কান্ড'। অত্যুৎসাহী দর্শকদের জন্য তলায় একটা লিস্টও দেওয়া, 'যে যেখানে দাঁড়িয়ে'। সেইটা না দেখলে বোঝা মুশকিল যে যাঁরা গাঁটের পয়সা খরচা করে এই বিশাল জিনিষটা টাঙ্গিয়ে রেখেছেন, তাঁদের পোলাপান-ও ওই ভিড়ের-ই অংশ … কোথাও একটা পিছনের দিকে লুকিয়ে আছে, চট করে ধরা মুশকিল …

সত্যি বলতে নরেন্দ্রপুর নিয়ে আমার দশা ওই ছবিটার মতন-ই, ঝাপসা, অন্ধকার, আস্তে আস্তে নামগুলো মুছে যাচ্ছে। তাও, হঠাৎ একটা রোববারের বিকেলে পুরোনো ছবি থেকে ধুলো ঝাড়তে কার না ভালো লাগে বলুন?

আজকের এই লেখাটা অনেকটা সঞ্জয় মঞ্জরেকারের কমেন্টারির মতন, ধরুন শচীন একটা দারুণ ইনিংস খেলে যখন আউট হয়ে গেলো আর অকর্মার ঢেঁকি বাকি তিনটে উইকেট মিলে সামান্য সতেরোটা রান-ও তুলতে পারলো না, অমনি ম্যাচের পরে স্যুট-টাই পরে এসে মঞ্জরেকার বলে বসলেন, 'আরেকটু চালিয়ে খেললেই পারতো'।

মনে মনে চার অক্ষর বলে টিভিটা অফ না করে দিয়ে কি ওয়েট করেছিলেন সেদিন? গ্রীক ট্রাজেডির মতন লাস্ট সিনে ম্যান অব দ্য ম্যাচটা তো শচীন-ই পাবেন আর পরের দিন হেডলাইনে বেরোবে, *India snatched defeat from the jaws of victory.* তাহলে সবুর করুন, মেওয়া না ফলুক, গবার ভবিষ্যৎবাণী অবিশ্যি ফলবে …

নরেন্দ্রপুরে যাঁরা পদধূলি বা কোমল খুলি কোনো একটা বিলিয়ে গেছেন, তাঁদের কাছে আর ভেতরের বর্ণনা দেওয়া বাহুল্য, আর যাঁরা সেমুখো হননি এজীবনে, তাদের কাছে বলে শেষ করা যাবে না, তবু চেষ্টা করতে দোষ নেই – মেইন গেট দিয়ে ঢুকে ডাইনে-বায়েঁ-আর সিধে তিনদিকেই যাওয়া যায়: যদি সোজা হাঁটেন, তাহলে কলেজ, স্কুল, একটা নালা, নালার উপরে ব্রিজ, এসব পেরিয়ে একের পর এক কলেজের হস্টেলঃ ব্রম্ভানন্দ, গৌরাঙ্গ আর সবশেষে রামকৃষ্ণানন্দ, আমার নরেন্দ্রপুরের জীবন প্রায় পুরোটাই ওই "যে জন আছেন মাঝখানে" তার কাছেই. .. অর্থাৎ গৌরাঙ্গ ভবন এবং তার একতলা, দোতলা আর মধ্যিখানের চাতাল।

আর কিছু গল্প রয়েছে ঐ ডানদিকের রাস্তাটায় মিশে, যার আদরের নাম 'এক বিড়ি পথ' – সত্যি সত্যি রাস্তাটার এমুখে একটা বিড়ি ধরালে, ওমুখ অব্দি সে আপনার সঙ্গ দেবে, আর ঝড়বৃষ্টির রাতে সব আলো নিভে গেলে যদি ওই রাস্তায় পায়চারি করেন, বিড়ির সঙ্গে আরো কিছু, আরো কেউ ...

আমার বন্ধু সন্দীপ বলতো, ওকে নাকি রোপন-দা* বলেছেন, ওঁরা ঠিক পিছনে পিছনে আস্তে আস্তে হাঁটেন এই সব অন্ধকার রাত্রে। সবসময়েই মনে হয় এই বুঝি পেরিয়ে গেলো কেউ, হয়তো এক ঝটকায় পেছনে তাকালেই তিনিও চমকে যাবেন, কিন্তু তাকানোর সাহস আজ-ও হয়ে ওঠেনি, সত্যি ...

তো মাধ্যমিকের ছুটি ফুরোলো, আর উদভ্রান্ত সেই আদিম দিবসে হঠাৎ একদিন বগলে পুঁটলি নিয়ে পৌঁছে গেলাম হোস্টেলে, দেখলাম সে এক দুরন্ত জায়গা, এক-একটা ঘরে চারটে বিছানা, চারটে করে আলমারি আর অজস্র ইরোডভ, এইচ-সি-ভার্মা, দত্ত-পাল-চৌধুরীরা গড়াগড়ি খাচ্ছেন। কোনো কোনো ঘরে স্কুলের চোখা ছেলেরা দাপিয়ে শক্ত প্রব্লেম নামাচ্ছে, আর কয়েকটায় সদ্য বাড়ি ছেড়ে আসা ধেড়ে খোকারা হাপুস নয়নে কাঁদছে ...

এসব কান্নাকাটি আর আই-আই-টির ধাক্কা সামলে বুঝলাম, হঠাৎ লাইফ পালটে গেছে, যা আগের ষোলো বছরে ছিলো না, পরের ষোলোয় তো আরোই থাকবে না, সেই ডিসিপ্লিন এলো জীবনে। জীবন মানে তখন "চারিদিকে মোর একি কারাগার ঘোর" আর সকাল-বিকেল গগনবিদারী একটি করে ঢং – সেটা শুনে ধুতি-ফুতি সামলে কাকভোরে "খন্ডন ভব" করতে ছোটো, আর সন্ধ্যেয় মাইক্রোস্কোপিক মাছভাজা আর অড়হর ডাল খেতে। বিকেলে পাওয়া যেতো ধুলো বিস্কুট আর মাঝেসাঝে মুড়ি-ঘুগ্নি – সে আবার এমনি ঘুগ্নি নয়, কপাল খারাপ থাকলে তাতে শুধুই মান্ডেন মটরডাল, আর খুলে গেলে সে এক ভূমধ্যসাগর, এক সিনিয়র একবার পাতে একটা পোড়া বিড়ি পেয়ে খুব দুঃখ করে বলেছিলো, "আলাদা করে দিলে দুটোই খেতাম, একসাথে কেনো দিলেন দাদা?"

দাদা মানে অরুণদা, ভালো নাম আগা খাঁ, হপ্তায় একদিন মাংসের বাটি আর বুভুক্ষু জনতার মাঝে যিনি সাদা বেম্মচারীর ড্রেস পরে দাঁড়িয়ে বলবেন, 'কই, মন্ত্র দাও'**, তিনিই আগা। আগা আসলে অনেকটা জুজুর মতন, তফাৎ এই যে একটা বয়েসের পরে আর জুজুর ভয় লাগে না, আগা-র লাগে ...

আর ভয় লাগে কিছু সত্যদার থাপ্পড়ের, ওরেব্বাস সে কি জোর মাইরি লোকটার হাতে! আমাদের সময় নিয়ম ছিলো প্রেয়ারের সময় দেরি করে পৌঁছলে হয় রেকর্ডবুকে উঠে যাবে বা গার্জেন কল হবে, তো একদিন দেরি হচ্ছে দেখে যেই না উল্টোদিকে ফিরেছি, দেখি হোস্টেলের দিক থেকে কট্মট করে এগিয়ে আসছেন সত্যদা ... আমার স্থির বিশ্বাস সেইদিন ডানগালে ওই বিরাশি সিক্কার চড়টা খেয়ে যে মাথাটা কিঞ্চিৎ লেফট লিবেরাল হয়ে গেছিলো, আজ-ও সেটা পুরোপুরি সারেনি ...

সত্যদার সেকেন্ড-ইন-কম্যান্ড ছিলেন গবা মহারাজ, নরেন্দ্রপুরের গল্প হবে, গবা আসবেন না, এ যেন ইন্ডিয়া টিম ব্যাট করতে নামছে আর শচীন বললেন আজ গা-টা ম্যাজম্যাজ করছে, বা পুজোবার্ষিকী আনন্দমেলা বেরুলো, কিন্তু শীর্ষেন্দু মাইটোসিস আর মিয়োসিসের তফাৎ নিয়ে রচনা ফেঁদে বসলেন। আমাদের এক সিনিয়র গুরুচন্ডালির ব্লগে লিখেছিলেন, স্বামী বিবেকানন্দের পরে সবথেকে বিখ্যাত সন্নিসী গবা, খুব একটা অত্যুক্তি নয় সেটা !

গবার নাম কেন গবা তা কেউ জানেনা, ওনার বয়েসও যে কি করে ওই এক জায়গায় গিয়ে আটকে গেছে, তা-ও না, ওই ইস্টার আইল্যান্ড বা বারমুডা ট্র্যায়াঙ্গলের মতোন রহস্যজনক ব্যাপার। অনেকে বলে, ভগবানে র 'ভ' আর 'ন' কেটে গবার আবির্ভাব, তবে এর সত্যাসত্য যাচাই করা আমার সাহসের বাইরে ... তবে হ্যাঁ তিনি ফোক লিজেন্ডের মাথায় বাড়ি, তাঁর সব গল্প করতে গেলে অবশ্য এ লেখা আর শেষ হবে না, তবে দু-এক পিস না বললে বেস্মপাপ হবে, যদিও সবকটাই এদিক-ওদিক থেকে হাওয়ায় ভেসে আসা বা কুড়িয়ে পাওয়া, নিজের চোখে দেখা নয় !

নরেন্দ্রপুর একটু ঝড়বাদলা হলেই সব আলো নিভিয়ে এক্কেরে নিঝুমপুরী হয়ে যেতো, আর যেই আলো নিভতো হোস্টেলের ব্যালকনি থেকে শয়ে শয়ে পোলাপান কোরাসে চিল্লাতো, "গবা আলো দে, গবা আলো দে" ... সে এক অতিপ্রাকৃত দৃশ্য ! এক সিনিয়রের গল্প শুনেছি, একবার নাকি আম্রিগার এক সিনেমা হলে আলো নিভে যাওয়ায় পুরোনো অভ্যেসে ভুল করে চিল্লে ফ্যালেন, 'গবা আলো দে' বলে, অমনি পিছন থেকে স্পষ্ট বাংলা গলায় ভেসে আসে, 'আমি নাইন্টি টু-এর ব্যাচ, আপনি?'

এমনও গপ্পো শুনেছি যে, গবার অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে নাকি একবার এইরকম-ই এক লোডশেডিং-এর রাতে মাথায় বালতি চাপা দিয়ে কয়েকজন দুষ্কৃতী ছাত্র দুই-ঘা কষায়, নিজের মুণ্ড বালতির তলায় তাই ছাত্রদের মুখ দেখতে না পেয়ে মহারাজ হুমকি দেন, যার বালতি তার কপালে টিসি নাচছে! বিধাতার কি পরিহাস, আলো এলে দেখা গেলো বালতিটাও গবার-ই ...

আর একবার নাকি এক জাপানী ভিজিটর নরেন্দ্রপুরে এসেছেন, তাঁকে লাঞ্চে আপ্যায়ণ করে খাওয়াতে নিয়ে গেলেন সত্যদা আর গবা, এটাসেটা খাওয়ার পর দই এলো। জাপানী অতিথি যাতে এই সুবর্ণ সুযোগ হাতাছাড়া না করেন তাই গবা মহারাজ দই নিয়ে যারপরনাই পীড়াপীড়ি শুরু করলেন – তাতে অতিথি খানিক উৎসাহ বোধ করে জিজ্ঞেস করেই ফেললেন জিনিষটি কি? গবা মুখ উজ্জ্বল করে বললেন, This is spoiled milk, বলেই বোধহয় অতিথির মুখের দিকে চেয়ে খেয়াল হলো হেব্বি ছড়িয়েছেন, তাই তড়িঘড়ি নিজেকে সামলে বললেন, 'না রে বাবা এটা Intentionally spoiled milk ..'

(যতই মশকরা করি, এ ব্যাপারে আমার সত্যিই একটা গর্বের জায়গা আছে, গবা মহারাজ সন্নিসী হওয়ার আগে যে স্কুলে তরুণকান্তি দে হয়ে দশ-দশটা বছর কাটিয়েছেন, আমিও সেই বরানগর মিশনের বাই-প্রোডাক্ট !)

আমাদের সময় ইলেভেন-টুয়েল্ভ ছিলো কলেজে, আর ক্লাস নিতেন হরেক রকমের মজার লোক, আর তাদের ডাকনামগুলোও দারুণ, HKC হয়ে গেলেন হিরণ্যকশিপু, আর BKS, বকাসুর ... আর কিছু ছিলেন বহুমুখী প্রতিভা, কেমিস্ট্রি ক্লাসে প্রথম দিন-ই এসে বেঞ্জিন রিং দেখিয়ে যিনি আমার বাপের নাম খগেন করে ছেড়ে দিলেন, একদিন লাইব্রেরীতে গিয়ে দেখি সেই সন্তোষ মাজীর একটা আস্ত কবিতার বই – বাংলা পড়াতেন দুইজনায়, গোবিন্দ-স্যার আর প্রণব-স্যার, অর্থাৎ পেনো ... পেনোস্যারেরও একটা গল্পের বই ছিলো, তাতে আবার দুষ্টু ছেলেরা হাল্কা উত্তেজক জায়গাগুলো আণ্ডারলাইন করে রাখতো, পরবর্তী প্রজন্মের জন্য ... বইটার নাম মনে পড়ে না, তবে তার একটা গল্পে অমর একটা স্লোগান ছিলো, সেইটে গেঁথে আছে ভিতরেঃ "নেশার খেয়ালে, মুতেছে দেওয়ালে' ...

অঙ্ক করাতেন বিজয় বেরা, পি এস এম আর ননী-দা, দারুণ লোকজন সব, শেষের জনের উপর সত্যি বলতে দশ নম্বরের নামকরণের সার্থকতা লিখে ফেলা যায় চাইলেই। বিজয়বাবু অসম্ভব ভালোমানুষ, আমরা ভুল করলে উনি-ই লজ্জা পেয়ে যেতেন, আর পিএসএম একেবারে যাকে বলে tour de force, শক্ত শক্ত অঙ্ক ওনাকে দেখলে চুপচাপ নিজেরাই QED লিখে বসে থাকতো... আর ছিলেন ইংরেজী স্যার সতীপ্রসাদ মাইতি, নিশ্চিন্তে লাস্ট বেঞ্চে বসে ঢুলছি – হঠাৎ তুলে বললেন বানান করো তো ম্যানুএভর... আমি তো ইদিকে বাংলা মিডিয়াম, প্যান্টে হেগে একশেষ...

পাশ থেকে ছোট্ট চিরকুটে কোনো কোনোদিন চলে আসতো শক্ত বানানগুলো, কখনো পরীক্ষার হলে অরগ্যানিক কেমিস্ট্রির ফরমুলা, একবার অঙ্ক পরীক্ষায় একটা বন্ধুকে একটা গোটা ইন্টিগ্রেশান দায়িত্ব নিয়ে টোকালাম, সে বেরিয়ে বললো, সব-ই বুঝলুম, খালি ওই পাশে চাউমিনের মতন কি একটা একেঁ গেলি সারা পাতা জুড়ে ওইটা বুঝিনি, বাকিটা দাঁড়ি-কমা শুদ্ধু টুকে দিয়েছি ...

কোনো-কোনোদিন পড়াশুনো মুলতুবি থাকতো, সে বিকেলগুলো বড়ো মায়াময় হতো, এক একদিন অনি বা সৌম্যর সাথে বসে কবিতা পড়তে পড়তে ভাবতাম প্রেম বোধহয় শঙ্খ ঘোষের কবিতা, হয়তো বিপ্লবও তাই – একদিন সন্দীপ এসে বলতো চল রাজপুরের কালিবাড়ি নিয়ে যাবো, সন্ধ্যে ছটায় আরতি হবে – একটা এইটুকুনি ছেলে ঢাক বাজায় আর তার আওয়াজ এক মাইল দূর থেকে স্পষ্ট শোনা যায় ...

একটা দারুণ বন্ধু ছিলো, শুভ্রকান্তি – অনেক অনেকদিন পরেও তার চিঠি আসতো আমার ঠিকানায়, সে লিখতো গরমকালে কেমনি দামোদর নদের জল শুকিয়ে গেলে হেঁটে হেঁটে পেরিয়ে যাওয়া যায়, আর আমিও লিখতাম তাকে, ঘোর বর্ষায় আমার বাড়ির পাড়াই কেমন দামোদর হয়ে যায়, আর বাবা কেমন সকালে উঠে ইঁট পেতে দেন যাতে ইস্কুলের জুতোটা না ভিজে যায় গলিটা পেরোতে গিয়ে...

আমাদের ইস্ট উইং-এর একদম শুরুর ঘরটায় থাকতো অরিজিৎ আর দেবাঞ্জন, মাঝে মাঝে বসতো আড্ডা আর অন্তাক্ষরী – বানিয়ে টানিয়ে ভুজুং-ভাজুং দিয়ে গান মিলিয়ে দারুণ হতো ব্যাপারটা ... সেই একবার তো আমি, রবিরঞ্জন আর সুদীপ্ত একটা গান-কুইজ প্রায় জিতেই গেছিলাম, লাস্ট রাউন্ডে জিজ্ঞেস করলো বাংলাদেশের একটা আধুনিক গান গাও (নাঃ, আমার সোনার বাংলা গাইলে হবে না), তখন কোথায় আয়ুব বাচ্চু, কোথায় এল আর বি আর জেমস, আমরা তো হতাশ হয়ে পাস করে দিলাম – ওমা, পাশের টিম দেখি লজ্জাঘেন্নার মাথা খেয়ে শুরু করে দিলো আজগুবি একটা গান, "সাতদিন এক হপ্তা, বারোদিনে মাস, তিনমাস পর এগজামেতে, টিচার দিলো বাঁশ "... তুমুল আপত্তি সত্ত্বেও জাজদের সেইদিন মানতে হয়েছিলো, যে কোনো জিনিষের Existence disprove করা ভয়ানক কঠিন, সে নিরাকার ঈশ্বর -ই হোন বা বাংলাদেশী র‍্যাপ...

ভয়ানক দুষ্টু ছেলে ছিলো জ-বাবু (আসল নামটা চেপে গেলাম, সে এখন একটা সফল স্টার্ট-আপের সি-ই-ও), পেনো-গোবিন্দো তো এসেই তাকে বের করে দিতো, তাও জ-বাবু ঠিক টাইমে পৌঁছে যেতো ক্লাসে, এক একদিন আবার একগাছা জংলা ফুল থান ইঁট দিয়ে চাপা দিয়ে রাখতো স্যারের টেবিলে, "ভিতর থেকে" সরি বলবে বলে ... একদিন গোবিন্দো-স্যার ক্লাসে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস পড়াচ্ছেন, হঠাৎ জ-বাবু সামনের বেঞ্চ থেকে বলে উঠলো, "স্যার

জয়েন্টের সাজেশান দিন"... গোবিন্দ-দা হেব্বি খচে গিয়ে বল্লেন, "হয় তুমি ক্লাসে থাকবে, নয় আমি", জ-বাবু সাজা শুনলো, আস্তে আস্তে উঠে ক্লাসের দিকে ফিরে বললো, 'তোরা তো শুনলি, স্যার বলেছেন, হয় স্যার থাকবেন, নয় আমি থাকবো, এবার তোরা বল, তোরা কি চাস?'

আরো কত্ত-কত্ত মজার গল্প, রাত কাত হয়ে যাবে লিখতে লিখতে, এই এতোদিন পরে লিখতে বসে নিজেই একচোট হেসে নিলাম সেসব ভেবে ভেবে, আর মনটাও বেশ ফুরফুরে হয়ে গেলো, মনে হলো যেনো শীতের ছুটি পড়েছে, সেই এক-বিড়ি পথটায় হাঁটছি পুরোনো বন্ধুদের সাথে, হাতে একটা ব্যাট আর ক্যাম্বিস বল, আর কদিন পরেই টেস্ট পরীক্ষা, তারপর জয়েন্ট, সব্বাই কে কোথায় ছিটকে যাবে কেউ জানে না, কিন্তু কিছুই যায় আসে না, আজকে জমিয়ে খেলা হবে, আর সন্ধ্যেবেলায় মহামায়াতলার দোকানটায় শেয়ার করে এগরোল, বা গড়িয়া মোড়ের রাঁদেভুতে গিয়ে তড়কা-রুটি।

একজন দুজন তবু পাশে থেকে যাবে, বড় ক্লান্ত হয়ে ব্যালকনিতে গিয়ে একটা সিগারেট ধরালেই জানি অরিজিতের একটা ফোন আসবে এক্ষুনি, বা ইনবক্সে অনির একটা সদ্য হাতে লেখা কবিতার ছবি এসে বলবে, 'আমার চিঠিটা কবে আসবে, হাবু?'

আমিও এসব ভাবতে ভাবতে, সেই স্মৃতিগুলোর সাথে আড্ডা মারতে মারতে ফিরে যাই সেই শীতের দুপুরগুলোয়, পা ছড়িয়ে বসি একটা পুরোনো পুকুরের পাড়ে, আর এই রংলাগা রোদ্দুরটায় আমাদের কি যেন একটা হয়ে যায়!

শয়েক থেকেই কয়েক কথা

নবকলম

অক্টোবর ২৪, ২০১৭

রোজের রুটিন রণের কথা,
রণপা-ভীত মনের কথা,
মনগহীনের বন ফুরোলেই
বনের মাথায় ড্রোনের কথা!

এদের কথা, ওদের কথা,
শ্বাদন্তঋণ শোধের কথা;
ক্রোমোজোমের বিজ্ঞাপনে
রেগিস্তানের রোদের কথা।

চিমনিছাড়া ধুঁয়োর কথা,
শ্যাওলাধরা কুয়োর কথা;
বন্ধ্যা জমি ধরলে ঢ্যাঁড়শ,
তার গায়েরই শুঁয়ো-র কথা।

চাবির গোলাম ঘড়ির কথা,
বালির জাহাজ লরির কথা,
চিলতে সোঁতায় দু-হাঁস দেখেই
বণিকপাড়ার পরীর কথা ।

পরীর কথায় দিন থেমে যায়,

এ কোন মাদকজড়ির কথা!

সূর্য একাই হিসেব লাগায়,

হেমবিলানোর ভরি'র কথা।।

বিদায় নেওয়া ও মুচকি হাসি

সৌরদীপ

ফেব্রুয়ারী ৯, ২০১৭

গাঁয়ের চণ্ডীমণ্ডপের আর সেই দিন নেই! মোড়লরা আগে সেখানেই আসত, গাঁয়ের লোকজন আসত, আড্ডা গল্প তামাক সালিশি সবই হত, মান্যিগন্যি লোকেরা যা বলত বাকিরা তা মেনেও নিত। তারপর হঠাত নব্য দুনম্বরী দুশ্চরিত্র একটা লোক স্রেফ পয়সার জোরে সব নিজের কব্জা করে নিল। নতুন এই শর্মাকে পুরনোপন্থীরা কিছুতেই মানতে পারে না। এই নিয়েই আস্ত একটা উপন্যাস লিখেছিলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, সেই উপন্যাসই তাঁকে এনে দিয়েছিল ভারতীয় সাহিত্যের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্মাননা। শুধু তারাশঙ্করই বা কেন? রবীন্দ্রনাথ, যার প্রতিভার বিস্তার ব্রহ্মাণ্ডের প্রায় কিছুই বাকি রাখেনি, সেই তিনিও **১৯৩২** সালে ভেবেছিলেন, এবার তাঁর সরে দাঁড়ানো উচিত। কবিগুরুর দৌহিত্র নীতুকে পাঠানো হয়েছিল জার্মানিতে, ছাপাখানার কাজ শেখার জন্য। '৩২ সালের জুন মাস নাগাদ খবর এল, তাঁর সেই একমাত্র দৌহিত্রের রোগে ভুগে মৃত্যু হয়েছে। এদিকে আর্থিক অবস্থার সমস্যায় তাঁকে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপকের পদ নিতে হয়েছে। কবিগুরু ভাবলেন, আর কদ্দিন কবিতা লিখবেন? লিখে ফেললেন, "পরিশেষ!" সুকুমার সেন বলছেন, *"পরিশেষ বইটিকে এক হিসেবে রবীন্দ্রনাথের কবিজীবনস্মৃতি বলা যায়।"*

কিন্তু তিনি তো বিশ্বকবি! তিনি নিজেই নিজের অনুপ্রেরণা! লেখা শেষ হয়ে গিয়ে যদি কিছু বাকি পড়ে যায়, আমরা 'পুনশ্চ' দিয়ে নিচে লিখে দিই। রবীন্দ্রনাথ লিখলেন, 'পুনশ্চ!' তিনি পুরনো, তাঁর কবিতা সেকেলে -বলে বুদ্ধদেব বসুদের কল্লোলগোষ্ঠী যত হইচই করেছিল, তার সমস্ত জবাব এসে গেল তাতে। রবীন্দ্রনাথ বোঝালেন, তাঁর যাবতীয় লেখার শেষে একটা "পুনশ্চ"-ই যথেষ্ট, স্বঘোষিত বোদলেয়রপন্থী আধুনিকদের তম্বি থামাতে।

এইভাবে যাওয়ার সময় হলে বিদায় নেওয়াটাই বুদ্ধিমানের লক্ষণ, কারণ সেটাই বোধ হয় উত্তরসূরির প্রতি পূর্বসুরীর শ্রেষ্ঠ উপহার। জন গ্রিশ্যামের বিখ্যাত উপন্যাস 'দ্য টেস্টামেন্ট'-এর বিলিওনেয়ার নায়ক সেটাই করে যাননি, ফলে বিস্তর জলঘোলা হল। চলে যাওয়ার সময়ে না গেলে বা গ্যাঁট হয়ে বসে থাকলে যে কি হয়, তার ভুরি ভুরি উদাহরণ মেলে ভারতীয় রাজনীতিতে।

অনেকসময় চলে গিয়েও রাশ নিজের হাতে রাখার লোভ ছাড়তে পারেননা অনেকে। রতন টাটা যেমন। ভারতের বৃহত্তম শিল্পগোষ্ঠীর কর্ণধার পদ থেকে রিটায়ার করেও থেকে গিয়েছিলেন চেয়ারম্যান 'এমেরিটাস' হয়ে, কলকাঠি নাড়ছিলেন সর্বত্রই। ফল ভুগতে হল হাজার হাজার মানুষকে। একে তো টাটা বনাম সাইরাস দ্বৈরথ, তার ওপর কয়েকশো কোটি টাকার ক্ষতি। উল্টোদিকে ইনফোসিস প্রধান নারায়ণমূর্তি বিশাল সিক্কাকে সিইও করেই কাজ সেরেছেন, ছড়ি ঘোরাতে যাননি। ফারাক আজ সবাই দেখছেন।

ফলে, আসার মত যাওয়ার সময়টা আন্দাজ করাও হল একজাতের বিচক্ষণতা। সেটা না থাকলে জীবনে যতই কীর্তি থাকুক, সবই একসময় ছড়িয়ে ছত্তিরিশ হয়ে যায়। যেমন ধরা যাক লালকৃষ্ণ আডবাণী। ২০০৯ লোকসভায় এনডিএ হেরে যাওয়ার পরেই সবাই বলাবলি করছিল, এবার তাঁর সরে যাওয়া উচিত, দায়িত্ব নিক নতুন মুখ। এককালের লৌহমানব আডবাণী নিমরাজি হয়েও সরতে রাজি হলেন না। জোর করে বিরোধী দলনেতার পদ তাঁর হাত থেকে সরিয়ে দেওয়া হল সুষমাকে। ২০১৪ লোকসভা ভোট, ইউপিএ টুজি স্পেকট্রাম, কোলব্লক, কমনওয়েলথ গেমস সহ হাজারটা দূর্নীতির অভিযোগে টলমল করছে, অশোক রোডে বিজেপির শীর্ষ নেতৃত্বের বৈঠক বসল। গুজরাট মডেলের হাত ধরে উঠে এলেন ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির নরেন্দ্র মোদী। সঙ্গে উত্তরপ্রদেশের রাজ্য-সভাপতি থেকে বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হলেন অমিত শাহ, ক্ষমতায় এলেন রাজনাথ-জেটলিরা। আডবাণী বা মুরলীমনোহর জোশীর নাম কেউ নিল না। গোঁসা করলেন আডবাণী-ঘনিষ্ঠ সুষমা, তাঁকেও মোদী শিবির পাত্তা দিল না। শেষে 'মার্গদর্শক' নামক একটি নাম-কা-ওয়াস্তে পদ তৈরি করে কার্যত বহু যুদ্ধের দুই ঘোড়াকে বৃদ্ধাশ্রমে পাঠিয়ে দিলেন মোদী-অমিত, লোকসভা ভোটে বিপুল ভোটে জিতে ক্ষমতায় এল বিজেপি। তারপর আজকাল আডবাণী মাঝেমাঝে প্রেসে দু'চারটে কোট দেওয়া ছাড়া কোনও খবরেই নেই।

বয়স হলেও ক্ষমতা না ছাড়ার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ বোধ করি তামিল রাজনীতির "কলাইনার" করুণানিধি। গত বিধানসভা ভোটেও ডিএমকের মুখ্যমন্ত্রী পদপ্রার্থী হতে ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন কলাইনার, ৯২ বছর বয়েসে! তিনি জিতেছেন, দল জেতেনি। ভাগ্যিস জেতেনি! অবশ্য বেশি বয়েসে প্রধানমন্ত্রী হবার রেকর্ডও আছে। ১৯৭৭ সালের ২৩ মার্চ ৮১ বছর বয়েসে প্রধানমন্ত্রী হয়েছিলেন মোরারজি দেশাই।

সেইজন্যই বোধ হয় মহেন্দ্র সিং ধোনি সব দিক দিয়ে ব্যতিক্রম। যেমন টেস্টে ব্যর্থ হয়ে সবার অলক্ষ্যে ছেড়ে দিয়েছিলেন টেস্ট ক্যাপ, সেরকম যেখানে তিনি অবিসংবাদী সম্রাট, সেই ওয়ান ডে'র ক্যাপ্টেন্সিও তিনি সবাইকে অবাক করে ছেড়ে দিলেন। তাবড় ক্রিকেটলিখিয়েরা ভেবেছিল, ২০১৯ বিশ্বকাপে ক্যাপ্টেন হিসেবে শেষ চেষ্টা করবেন ধোনি। কিন্তু ধোনি বোঝালেন, উত্তরসূরিকে জায়গা দেওয়াটাই হল প্রকৃত অধিনায়কের কাজ!

সেইজন্যই বোধ হয় বলে, নায়ক বা নেতা সবাই হয়, ক্যাপ্টেন হাতেগোনা।

"যেতে পারি কিন্তু কেন যাব" বলে গোঁ ধরে বসে থাকলে কি হয়, তার জ্বলন্ত উদাহরণ হিসেবে এই মুহূর্তে সবকিছুকে ছাপিয়ে গেছেন মুলায়ম সিং যাদব। এককালে ভারতীয় রাজনীতির কলকাঠি নাড়তেন তিনি, ক্রাইসিস হলেই মুলায়মের দিকে তাকিয়ে থাকত সবাই। কিন্তু আজ লখনউয়ে তাঁর বিখ্যাত বিক্রমাদিত্য মার্গের বাড়ির দারোয়ান এক চেনা সাংবাদিকের কাছে দুঃখ করছেন, "কিছুদিন আগেও বাড়ির সামনে গাড়ির লাইন পড়ত, সবাই দেখা করতে আসত নেতাজির সঙ্গে। এখন এই ভোটের আগেও কেউ খবর নিতে আসছে না! অখিলেশ ভাইয়া কা জমানা হ্যায়, দলের সেজ নেতারাও এখন অখিলেশের দিকে হত্যে দিচ্ছে!" অথচ মুলায়ম সম্পর্কে বলা হত, তিনি নাকি আকাশে হেলিকপ্টারে চেপে উড়ে যেতে যেতে নিচের কোন গ্রামের কি নাম বলে দিতে পারতেন!

অতএব, জায়গা দখল করতে পারার মত জায়গা ছেড়ে দেওয়াটাও বিচক্ষণতা। সবাই সেটা পারে না। রাজনীতিতে বিচক্ষণতার বাকি সব পরীক্ষায় লেটার মার্কস পেয়ে পাস করা ছাত্রটি ফাইনালে ডাহা ফেল করে আরও একবার এটা প্রমাণ করে দিয়ে গেলেন।

মার্শাল ভুতো

দৃপ্ত বর্মন রায়

অক্টোবর ১৭, ২০১৭

আমার ছোটবেলাটা কেটেছে কোলকাতা বর্ধমান লাইনের ওপর ছোট্ট একটা মফঃস্বল শহরে। আমার মতন তোমরা যারা নব্বই-এর দশকে তাঁদের টিন-এজটা কাটিয়েছ তাদের কাছে আর নতুন করে বলার কিছুই নেই যে আমরা আমাদের ছোটবেলাটা কিরকম এনজয় করতাম। আজকালকার কচিকাঁচাদের মতন আমাদের তো আর সাত সকালে ঘুমচোখে উঠে মাইকেল ফেল্পস বা সচিন তেন্ডুলকার হবার জন্যে সুইমিং বা ক্রিকেট শিখতে যেতে হত না, তারপর সেখান থেকে বাড়ি ফিরেই নাকে মুখে গুঁজে আবার স্কুল বাসের সাথে প্রতিযোগিতাতেও নামতে হত না বা স্কুল শেষ করেই হয় ড্রয়িং অথবা ওয়েস্টার্ন ডান্স বা উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতে পারদর্শী হবার ইঁদুর দৌড়ে সামিল হবার দরকার পড়ত না। আমরা ধীরে সুস্থে সাতটা সাড়ে সাতটায় ঘুম থেকে উঠতাম। উঠে খানিক পড়াশোনা করে, চান খাওয়া সেরে দশটায় পায়ে হেঁটে বা সাইকেলে বন্ধুদের সাথে আড্ডা দিতে দিতে স্কুলে যেতাম। স্কুল শেষ করে বাড়িতে এসে খাওয়া দাওয়া সেরে আবার দৌড়তাম পাড়ার মাঠে। সেখানে চুটিয়ে শীতকালে ক্রিকেট, গরমকালে ফুটবল খেলে সন্ধ্যেবেলা হাত পা ধুয়ে খানিক আড্ডা মেরে বাড়ি ঢুকতাম। তারপর কিছুক্ষণ পড়তে বসার নাম করে ঢুলে কোনোমতে রাতের খাওয়া সেরে 'লেটস কল ইট আ ডে' বলে স্বপ্নের জগতে ডুব লাগাতাম। মোটকথা আমাদের শৈশবটা ছিল অখণ্ড অবসরে ভরা, সেখানে 'কেরিয়ার', 'টার্গেট', 'ডেডলাইন' এই জাতীয় শব্দগুলো ছিল একেবারে এলিয়েনদের মতই।

ছোটবেলা সবারই একগাদা বন্ধু থাকে। আমারও ছিল। তার মধ্যে একজন ছিল ভুতো। নামটা শুনে নাক সিঁটকানোর কিছু নেই, তখনকার দিনে ভুতো, নাড়ু, পাঁচু, খেঁদি এরকম নাম হামেশাই পাওয়া যেত। সে যাই হোক, ভুতোকে শুধু বন্ধু বললে হয়ত কম বলা হবে, ছোটবেলায় সে ছিল আমার সবচেয়ে প্রিয় বন্ধু। ওর চেহারা খুব আহামরি কিছু না হলেও অন্তত ভুতের মতন মোটেও ছিল না। ভাল নামও ওর একটা ছিল, দেবর্ষি। কিন্তু পাড়ায়, স্কুলে ও ভুতো নামেই বেশী পরিচিত ছিল। আর এই নামটাতেই ও যেন বেশী স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করত। আমার সাথে একই ক্লাসে পড়ত। থাকতও একই পাড়াতে। পড়াশোনায় বেশ ফাঁকিবাজ হলেও কি ভাবে জানি অ্যানুয়াল পরীক্ষায় ঠিক প্রথম দশের মধ্যে নিজের জায়গাটা করে নিত। ওর যে বৈশিষ্ট্যটা সবচেয়ে উল্লেখ করার মতো ছিল সেটা হল ওর সেন্স অফ হিউমার। আজকাল 'ওয়ান লাইনার' বলে যে বস্তুটি বহুল প্রচলিত সেটার স্রষ্টা কে আমি তা জানি না। কিন্তু সেই সময়েই ভুতো মুখে মুখে এ জাতীয় ওয়ান লাইনার হামেশাই প্রয়োগ করত। তার উপস্থিত বুদ্ধি, তার লোককে হাসানোর ক্ষমতা এই গুনগুলোর জন্যে সে অনায়াসে পাড়ায় বা স্কুলে আমাদের অলিখিত নেতা হয়ে গিয়েছিল। তাকে নিয়ে বিভিন্ন ঘটনাগুলো মনে পড়লে আজও অজান্তেই ঠোঁটের কোনায় একটা হাসি এসে পড়ে। সেই রকম কিছু ঘটনাই শেয়ার করব বলে এই লেখাটা লিখছি।

স্কুলে ভুতোর জন্যে আমাদের ক্লাসকে স্যারেরা বেশী ঘাঁটাতেন না। দুএকটা উদাহরণ দিলেই কারণটা স্পষ্ট হবে। আমাদের ক্লাস নাইনে ইংরাজি পড়াতেন সনাতন স্যার। উনি খালি ট্র্যান্সলেসন করাতে ভালবাসতেন। মাঝে মাঝেই এখান ওখান থেকে একটা বাংলা প্যারাগ্রাফ দিয়ে আমাদের বলতেন ইংরাজিতে ট্র্যান্সলেট করতে। আর না পারলেই শুরু করতেন জ্ঞান বিতরন। স্যারের বক্তব্য ছিল ট্র্যান্সলেসনের মাধ্যমেই নাকি লোকে ভালভাবে ইংরাজি শিখতে পারে আর ভালভাবে ইংরাজি না শিখলে মনুষ্য জীবনটাই বৃথা। হাফ ইয়ারলি পরীক্ষায় উনি এমন সাংঘাতিক একটা প্যারাগ্রাফ দিয়েছিলেন অনুবাদ করতে যে অধিকাংশ ছাত্রই তাতে দাঁত ফোটাতে পারেনি। এরপর খাতা ফেরত দেবার দিন উনি পুরো পিরিয়ড জুড়ে আমাদের জ্ঞান দিয়েছিলেন। তার দুদিন পর ভুতো লাইব্রেরী থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের আনন্দমঠ যোগাড় করে তার থেকে একটা দাঁত ভাঙ্গা প্যারাগ্রাফ খাতায় টুকে নিয়ে সনাতন স্যারকে দিয়ে বলেছিল ট্র্যান্সলেট করে দিতে। প্যারাগ্রাফটা সাধুভাষা থেকে চলতি ভাষাতে অনুবাদ করতেই অতি বড় বড় পণ্ডিতের ঘাম ছুটে যাবার কথা। সনাতনস্যার বাংলা সাহিত্যে অত ওয়াকিবহাল ছিলেন না। ফলে প্যারাগ্রাফটা যে আনন্দমঠ থেকে নেওয়া সেটা ধরতে পারেননি। কোথা থেকে পেয়েছে জিজ্ঞেস করায় ভুতো অম্লানবদনে বলল সে টেস্ট পেপারে কোনও এক স্কুলের ইংরাজি প্রশ্নপত্রে সেটা পেয়েছে। স্যার বহুক্ষন মাথা ঘামিয়েও বঙ্কিমভাষা উদ্ধার করতে না পেরে বললেন যে এক দুদিন পরে অনুবাদ করে এনে দেবেন। সেই এক দুদিন পরটা যদিও আর আসেনি, তবে এরপর থেকে উনি অন্তত আমাদের ক্লাসে ট্র্যান্সলেসন নিয়ে জ্ঞাণ দেওয়াটা কমিয়ে দিয়েছিলেন।

আমাদের আরেকজন স্যার ছিলেন পরিতোষবাবু। টিফিনের ঠিক আগের পিরিয়ডটায় অঙ্ক পড়াতেন আমাদের ক্লাসে। নিপাট অঙ্কপাগল ভালোমানুষ। অঙ্ক কষতে অসম্ভব ভালবাসতেন। নিজেই অনুশীলনীর একটার পর একটা অঙ্ক

ব্ল্যাকবোর্ডে কষতে থাকতেন আর বলতেন, “আহা কি সুন্দর অঙ্ক, দেখ দেখ কি ভাবে করছি। খাতায় টুকে নাও।” আমরা তাঁর পিছনে তাঁর করা অঙ্ক খাতায় টুকছি না কাটাকুটি খেলছি, সেদিকে ওনার ভ্রূক্ষেপই ছিল না। তাঁর সবই ভাল, খালি অঙ্ক করতে শুরু করলে তাঁর আর সময়ের খেয়াল থাকত না। আমাদের ক্লাসের অন্য সেকশনেও উনিই অঙ্ক করাতেন। কিন্তু সেটা সেকেন্ড পিরিয়ডে। ফলে পিরিয়ড শেষ হয়ে গেলে যখন থার্ড পিরিয়ডের স্যার চলে আসতেন, তখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও উনি অঙ্ক কষা বন্ধ করতে বাধ্য হতেন। আমাদের বেলায় সেটা হত না। যেহেতু টিফিনের আগের পিরিয়ডটায় উনি আসতেন, তাই টিফিনের ঘণ্টা পড়ে গেলেও ওনার অঙ্কতৃষ্ণা মিটত না। এদিকে আমাদের হত মহা বিপদ। জানলা দিয়ে দেখতাম বাকী ছেলেপুলেরা মাঠে নেমে বল পেটাচ্ছে, আর আমরা হতাশ হয়ে বসে স্যারের অঙ্ক করা দেখছি। মাঝে মাঝে কেউ যদি সাহস করে বলে ফেলত যে টিফিন টাইম হয়ে গেছে, স্যার বলতেন, “ঠিক আছে, তোমরা টিফিন খেতে খেতেই দেখ আমি কিভাবে অঙ্কগুলো করি।” কিছুক্ষণ পরে অতিষ্ঠ হয়ে আবার তাড়া দিলে স্যার বলতেন, “এই তো আর দুই মিনিট।” তখন তো আমাদের আর হাতে ঘড়ি থাকত না, সেই দু মিনিটটা বেড়ে গিয়ে পাঁচ মিনিটে দাঁড়াত। আবার তাড়া দিলে উনি আরও দুই মিনিট চাইতেন। এভাবে দুই মিনিট দুই মিনিট করতে করতে কুড়ি মিনিট টিফিন টাইমের সিংহভাগ শেষ করে যখন উনি তৃপ্ত মনে হাসি মুখে ক্লাস ছাড়তেন, ততক্ষণে বাকী ক্লাসের ছেলেরা বেদম দৌড়ঝাঁপ করে হাঁপাতে হাঁপাতে ক্লাসে ফিরে এসেছে। একদিন উনি এরকম প্রথমবার দুই মিনিট সময় চেয়ে নিয়ে মনের সুখে অঙ্ক করছেন বোর্ডে, হঠাৎ শুনতে পেলাম অ্যালার্ম ঘড়ির আওয়াজ। কি হল খোঁজ নিয়ে দেখা গেল ভুতো একটা অ্যালার্ম ক্লক নিয়ে এসেছে, আর স্যার দুই মিনিট সময় চাওয়ায় ঠিক দুই মিনিট পরে তাতে অ্যালার্ম দিয়ে বসে আছে। স্যার আরও একবার দুই মিনিট সময় চাইলেন। আবার দুই মিনিট পর অ্যালার্ম বেজে উঠল। এভাবে আরও এক বার দুবার অ্যালার্ম বাজায় স্যার নিজেই বাধ্য হয়ে সেদিন তাড়াতাড়ি ছেড়ে দিলেন আমাদের।

সম্ভবত স্কুলে সবচেয়ে বড় ঘটনাটা ভুতো ঘটিয়েছিল ইলেভেনে পড়ার সময়। আমাদের স্কুলে দুজন কেমিস্ট্রির সাবজেক্ট টিচার ছিলেন। শৈলেনস্যার আর পবিত্রস্যার। এদের মধ্যে একটু ক্ষারাক্ষারি ছিল। দুজনেই প্রাইভেটে পড়াতেন এবং শৈলেনস্যার পবিত্রস্যারের কাছে যে সব ছাত্ররা পড়ত তাঁদের পছন্দ করতেন না। এই ব্যাপারটা সবারই জানা ছিল। প্রত্যেক ব্যাচেই এই দুজনের মধ্যে শৈলেনস্যারের কাছেই কম স্টুডেন্টরা পড়ত। এতে তাঁর গাত্রদাহটা আরও বেড়ে যেত। যদিও এর প্রতিশোধটা উনি তুলতেন পরীক্ষার প্রশ্ন করার সময় আর খাতা দেখার সময়, তাও এটাকে সবাই ইগ্নোরই করত। কারণ শেষ পর্যন্ত বোর্ডের পরীক্ষায় তো আর ওনার কোনও জারিজুরি খাটত না। সে যাই হোক, একবার শৈলেনস্যার আমাদের ক্লাস নিচ্ছেন। হঠাৎ উনি আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় সুদীপ্তর ওপর খাপ্পা হয়ে তাকে ধমকাতে শুরু করলেন। কারণ আর কিছুই নয়, ক্লাস চলাকালীন সে কেমিস্ট্রি বই খুলে কিছু একটা পড়ছিল। স্যার তাকে যা নয় তা বলে বকাবকি শুরু করলেন যে সে নাকি ক্লাসে উনি কি পড়াচ্ছেন সেটা মিলিয়ে দেখছে, সন্দেহ করছে যে স্যার ঠিকঠাক পড়াচ্ছেন কি না, এরকম হলে পড়ানোর ছন্দ কেটে যায়, এটা খুব বাজে স্বভাব ইত্যাদি ইত্যাদি। সুদীপ্ত যতই তাকে বোঝাতে যায় যে না, উনি যেটা ভাবছেন সেটা ঠিক নয়, স্যার ততই ক্ষেপে গিয়ে এর ফলে তাঁর অসম্মান হয়েছে এই বলে সুদীপ্তকে উত্তাল ঝেড়ে গেলেন। এটা বুঝতে কারোরই

অসুবিধা হচ্ছিল না যে সুদীপ্তর ওপর ওনার রাগের আসল কারণ হল, সুদীপ্ত ওনার কাছে না পড়ে পবিত্র স্যারের কাছে পড়ে। উনি শুধু শুধু একটা তুচ্ছ অজুহাতে ওর ওপর নিজের অন্য রাগটা ঝেড়ে দিলেন। ব্যাপারটা সেদিন কোনও মতে মিটে গেলেও দু একদিন পর সোমবার স্কুলে এসে দেখি বিভিন্ন জায়গায় দেয়ালে দেয়ালে, নোটিশ বোর্ডের পাশে, প্রত্যেকটা থামে একটা জেরক্স করা পাতা সাঁটা। তাতে একটা ছোট ছড়া লেখা। আজকে দাঁড়িয়ে যতদূর মনে পড়ছে ছড়াটা এরকম -

শৈলেন কইলেন
বই কর বন্ধ।
বই খোলা থাকলে যে
মনে জাগে দ্বন্দ।।
ক্লাসে বই খুললে হে
চোখে লাগে ধন্দ
লেকচারে মন দাও,
পাবে যে আনন্দ।।
পড়াই ঠিক না ভুল,
হচ্ছে কি সন্দ?
ভাল নয়, এ স্বভাব...
একেবারে মন্দ।।

আমরা দেখেই বুঝে গিয়েছিলাম এটা ভুতো ছাড়া আর কারোর কাজ হতেই পারে না। কিন্তু এটা নিয়ে ছাত্র আর শিক্ষকমহলে ফিসফাস আলোচনা চালু হয়ে গেল। আসল ঘটনাটা জানা না থাকলেও কার উদ্দেশ্যে লেখা এটা বুঝতে কারোরই সমস্যা হল না। আমাদের বায়োলজি পড়াতেন অশোকস্যার। বয়সে উনি খুব আমাদের চেয়ে একটা বড় ছিলেন না। আমাদের সাথে বন্ধুর মতই মিশতেন। উনি সেদিন আমাদের ক্লাস নিতে এসে সরাসরি বললেন যে টিচাররা ভালো ভাবেই বুঝতে পেরেছেন এটা কার লেখা। খালি ওরা জানতে চান আসল ঘটনাটা কি। স্যার কথাও দিলেন যে ব্যাপারটা ওঁকে খুলে বললে পাঁচ কান হবে না। আমরা সবাই চুপ করে আছি। শেষ পর্যন্ত ভুতো উঠে দাঁড়িয়ে স্বীকার করল যে এটা ওরই কাজ। সে ছড়াটা লিখে সেটার ফটোকপি করে আগের দিন সন্ধ্যেবেলা এসে স্কুলে সেঁটে দিয়ে গেছে। কোন ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে সে এই কাণ্ডটা ঘটিয়েছে সেটাও খুলে বলল। টিচারদের মধ্যে শৈলেনবাবুর জনপ্রিয়তা সাদ্দাম হুসেনের ইরাকে সিনিয়র বুশের জনপ্রিয়তার চেয়ে খুব একটা বেশী ছিল না। তাই শৈলেনবাবু জব্দ হওয়ায় মুখে কেউ কিছু না বললেও মনে মনে প্রত্যেকেই বেশ খুশীই হল।

খালি স্কুলে নয়, আমাদের পাড়াতেও ভুতো নানা ধরণের কাণ্ড কারখানা ঘটাত। আমাদের পাড়ায় একজন প্রচণ্ড খিটখিটে বদমেজাজী দাদু ছিল, নাম গণেশ মাইতি। তাঁর ছেলে বাইরে কোথাও চাকরী করত। দাদু স্ত্রীকে নিয়ে মস্ত

বাড়িতে একা একা থাকতেন আর পাড়ার সবার সাথে ঝগড়া করতেন। পাড়ার মা মাসীরা তখন ভোরবেলা এর ওর বাড়ি থেকে পুজোর ফুল সংগ্রহে বেরোতেন, দাদুর বাড়িতে ভুল করে ফুল নিতে ঢুকে পড়লে দাদু তাঁদের সাথে ঝগড়া করতেন। প্রতিদিন বিকেলে পাড়ার কলে কর্পোরেশনের জল আসত, প্রত্যেকের বাড়ি থেকে সেই জল নেবার জন্যে লাইন দিতে হত। দাদু রোজ সেই জলের লাইনে দাঁড়িয়ে ঝগড়া করতেন। মাসে দুমাসে তুমুল ঝগড়া করে বাড়ির কাজের লোককে তাড়াতেন। তো সেই দাদু একবার কালীপুজোর চাঁদা চাইতে যাওয়ায় আমাদের বিনা কারণে প্রচুর বকাবকি করে ভাগিয়ে দিয়েছিলেন। এক টাকাও চাঁদা ধরাননি। ভুতো শুনে খুব ক্ষেপে গেল। আমাদের বলল কৌটো যোগাড় করে আনতে। আমরা সবাই বাড়ি থেকে আমুল স্প্রে জাতীয় কিছু কৌটো নিয়ে এলাম। এবার কালীপূজোর দিন ভুতো বুড়িমার দশ বারোটা চকলেট বোমের সলতেয় ধূপকাঠি লাগিয়ে টাইম বোম তৈরি করল। এক একটা চকলেট বোমে এক এক সাইজের ধূপকাঠি। এবার রাত বেশ গভীর হবার পর চারিদিকে যখন বোম ফাটানো প্রায় শেষের পথে, তখন সেই টাইম বোমগুলোয় আগুন ধরিয়ে, আমূল স্প্রের কৌটোয় রেখে দাদুর বাড়ির পাঁচিল টপকে ঢুকে দাদুর শোবার ঘরের জানালার আসে পাশে স্ট্র্যাটেজিক্যালি প্লেস করে এল। তখন শব্দবাজী আজকের মত নিষিদ্ধ ছিল না। বুড়িমার চকলেট বোম এমনিতেই প্রচণ্ড আওয়াজ করে ফাটত। সেটা আবার কৌটোর মধ্যে রাখলে শব্দটা প্রায় দ্বিগুন হয়ে যেত। দাদুর বাড়ির পাশের বাড়িতে থাকত চঞ্চলদা। কলেজে পড়ত। অনেক রাত অব্দি জেগে পড়াশোনা করত। সেই চঞ্চলদার কাছে পরের দিন শুনেছিলাম সেদিন রাত দেড়টা থেকে আড়াইটে পর্যন্ত নাকি বোম ফেটেছিল। পাশের বাড়িতে চঞ্চলদাই নিশুতি রাতে পাঁচ দশ মিনিট অন্তর অন্তর বোম ফাটার সেই আওয়াজে চমকে চমকে উঠছিল তো শোবার ঘরের পাশে সেই আওয়াজে সেই রাতে দাদুর ঘুম কেমন হয়েছিল সেটা পরের দিন দাদুর মুখ দেখেই ভাল মালুম পড়েছিল।

সুবীরজেঠার বাড়িতে ছিল প্রচুর ফলের গাছ। আম, কাঁঠাল, পেয়ারা, লিচু কি নেই। কিন্তু লোকটা ছিল হাড়কিপ্টে। কোনদিন পাড়ার কাউকে সেসব ফল খেতে দিত না।

নিজেরাও অত ফল খেতে পারত না, গাছেই নষ্ট হত। তাও লুকিয়ে লুকিয়ে পাড়তে গেলে তেড়ে আসত। একদুপুরে হঠাৎ খবর পেলাম জেঠা পুরো ফ্যামিলি সহ বাড়িতে তালা মেরে দুদিনের জন্যে কোথায় জানি বেড়াতে গেছে। ব্যাস, আমাদের আর পায় কে? ভুতোর নেতৃত্বে সেদিন বিকেলেই পাঁচিল টপকে ঢুকলাম জেঠার বাড়ি। কিন্তু হা হতোস্মি। প্রত্যেকটা গাছ দুদিন আগে অব্দি ফলে ভরা ছিল, গিয়ে দেখি সব খাঁ খাঁ করছে। জেঠা লোক ডেকে সব ফল পাড়িয়ে ঘরে রেখে তালা বন্ধ করে বেড়াতে গেছে। প্রচণ্ড হতাশ হয়ে কি করব ভাবছি, হঠাৎ কে একটা বুদ্ধি দিল বাড়ির পিছন দিকে যাবার। সেখানে জেঠার সবজি ক্ষেত। সেখানে দেখলাম বেগুনক্ষেতে বেশ দু তিনটে নধরকান্তি বেগুন ফলে রয়েছে। আমরা কিছু না পেয়ে ঠিক করলাম ওই বেগুনগুলোই পেড়ে নিয়ে বেগুনি খাওয়া হবে। কিন্তু বেগুন তো আর এমনি এমনি বেগুনি হয়ে যাবে না, বাড়িতে নিয়ে গেলে বেগুনির বদলে জুটবে ঠ্যাঙ্গানি। কি করা যায়? সবাই মিলে ঠিক করলাম স্টেশনের বাইরে হারুদার চপের স্টল। ওই বেগুনগুলো নিয়ে গিয়ে হারুদাকে বলব ভেজে দিতে। কাঁচামাল আমরা সরবরাহ করছি, তাই হারুদা নিশ্চয়ই টাকা চাইবে না। যেমন ভাবা তেমনি কাজ। কাঁটার খোঁচা খেয়ে কোনোমতে দু তিনটে বেগুন পেড়ে আমরা হাজির হলাম হারুদার স্টলে। বুঝিয়ে শুনিয়ে হারুদাকে রাজী করানো গেল। আমাদের আনন্দ আর ধরে না। এমন সময় হারুদা বলল, "বেসন কই?" আমরা পড়লাম আকাশ

থেকে। বেগুনি খেতে হলে যে বেগুন ছাড়া বেসনেরও দরকার সেটা তখন আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে কুলোয়নি। কি করা যায়? হঠাৎ মনে পড়ল আমাদের বন্ধু রামুর বাবার মস্ত মুদির দোকান বাজারে। রামুও ছিল আমাদের দলে। কিন্তু তাকে সাধতেই সে এক বাক্যে না করে দিল। ওর বাবা ভয়ানক রাগী। বেসন চাইতে গেলেই কারণ জানতে চাইবেন। তখন বিপদের সমূহ আশঙ্কা। শুধুমাত্র রিসোর্সের অভাবে আমাদের এত সুন্দর প্রোজেক্টটাই স্ক্র্যাপ হয়ে যেতে বসেছে। অনেক বোঝানোর পর শেষ পর্যন্ত রামু আর আরেকটা বন্ধু কে পাঠানো হল ওর বাবার দোকানে। প্ল্যান হল দোকানে রামুর বাবা যদি না থাকে, তাহলে কোনও এক কর্মচারীকে বলে চেয়ে চিনতে একটু বেসন আনা। আমরা অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করে রইলাম। কিছুক্ষণ পরে ওরা দুজন বিজয়ীর মতন হাসি মুখে ফিরে এল। বেসন যোগাড় হয়েছে। আমরা প্রচণ্ড খুশীতে চিৎকার চেঁচামেচি জুড়ে দিলাম। ভুতো তো আবার আনন্দে নাচতে নাচতে গানই জুড়ে দিল, “বেসন তো এসে গেছে!” আমাদের উল্লাস আর চিৎকার চেঁচামেচিতে আসে পাশের সবাই কৌতূহলী হয়ে আমাদের দিকে দেখছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম আমাদেরই বয়সী অপরিচিত একটা ছেলে রাস্তার ওপার থেকে ভুতোর নাচ গান দেখে অবাক হয়ে ওর দিকে তাকিয়ে আছে আর কি যেন একটা ভাবছে। বোধহয় ছেলেটার সাথে ওর আরেকটা বন্ধুও ছিল। সে দু পা এগিয়ে গিয়ে যখন দেখল ছেলেটা রাস্তায় দাঁড়িয়ে হাঁ করে ভুতোর গান শুনছে, একটু বিরক্ত হয়েই ডাকল, “কি রে অনুপম, আয়! দাঁড়িয়ে রইলি কেন।” বলতেই ছেলেটা যেন সম্বিত ফিরে পেয়ে, “হ্যাঁ হ্যাঁ, আসছি।” বলে পা চালাল। কিন্তু যেতে যেতেও দেখি মাঝে মাঝে ঘাড় ঘুরিয়ে ভুতোকে দেখছে। কি যে মাথামুণ্ডু এত ভাবছিল ভগবানই জানে। ততক্ষণে হারুদা বেগুনি বানানোর তোড়জোড় শুরু করে দিয়েছে। আমিও তখন এই তুচ্ছ ব্যাপারটায় অত গুরুত্ব না দিয়ে বেগুনির প্রতি মনোযোগ দিলাম।

ফিচকেমি করার সময় ভুতো বড়ছোটর ভেদাভেদ মানত না। একবার এক ছুটির দিনে আমরা কয়েকজন পাড়ার রবিদার ফার্মেসির সামনে আড্ডা মারছি। বলাই বাহুল্য ভুতোও আছে আমাদের সাথে। এমন সময় পাড়ার পরিমলজ্যেঠু হন্তদন্ত হয়ে এলেন। উনি পাড়ার একজন বয়োজ্যেষ্ঠ মানুষ। আমাদের বাবা কাকারাও ওনাকে শ্রদ্ধা করেন। তো জ্যেঠু এসে হাঁপাতে হাঁপাতে রবিদাকে বললেন, "রবি তাড়াতাড়ি একপাতা এন্টারোকুইনল দে তো বাবা, অবস্থা খুব খারাপ।" রবিদা চটপট ওষুধ খুঁজতে খুঁজতে জানতে চাইল কি ব্যাপার। জ্যেঠু জানালেন আগের রাতে এক বিয়েবাড়ির ভোজ সাঁটিয়ে তাঁর অবস্থা সঙ্গিন। বাঁ হাতের জল শুকোনোর সময় পাচ্ছে না। কোনোমতে এক ফাঁকে লুঙ্গি পড়া অবস্থাতেই ছুটে এসেছেন ওষুধ নিতে। রবিদা ওষুধ দিয়ে দামটা বুঝে নেবার ফাঁকে হঠাৎ ভুতো বলে উঠল, "জ্যেঠু আপনি অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ নিচ্ছেন! জানেন না সমস্ত অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ বেআইনি ঘোষণা করে দেওয়া হয়েছে?" বলেই জ্যেঠুকে আড়াল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে চোখ টিপল। জ্যেঠু ছিলেন একটু বোকাসোকা মানুষ। আইনের ব্যাপারে একেবারে আইনস্টাইন। তিনি অবাক হয়ে জানতে চাইলেন, "সে কি? কেন?" ভুতো তখন জানাল যে পার্লামেন্টে নাকি এরকম সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে যে সাইড এফেক্ট হয় বলে সব অ্যালোপ্যাথিক ওষুধ ব্যান করে দেওয়া হবে। আমরা ততক্ষণে বুঝে গেছি ভুতোর মাথায় কিছু একটা দুষ্টু বুদ্ধি এসেছে। তাই মজা দেখার আশায় আমরা মুখ টিপে হাসছি। রবিদা একটু প্রতিবাদ করতে যাচ্ছিল, কিন্তু ভুতো ইশারায় তাকেও থামিয়ে দিল। জ্যেঠু কিন্তু সরল মনে কথাটা বিশ্বাস করে জিজ্ঞেস করলেন, "তাহলে কি করব? আমার এরকম অবস্থা।" ভুতো বিজ্ঞের মত বলল, "একটা কাজ করুন। অনেক সহজ কিন্তু অব্যর্থ উপায়। ঘরে গিয়ে প্রথমেই দুই তিন গ্লাস জল খেয়ে নিন।"

– "জল খাব?" পেটের এরকম অবস্থায় জল খেতে বলায় জ্যেঠু আরও অবাক হল।

– "হ্যাঁ। জল খাবেন।" বলে হাতের তর্জনী আর বুড়ো আঙ্গুল এক ইঞ্চি মত ফাঁক করে বলল ভুতো, "এবার জল খেয়ে যখন পেট ভরে যাবে তখন এই সাইজের একটা আস্ত সুপুরি নেবেন।"

– "সুপুরি!!" জ্যেঠুর চোখদুটো তখন ওই সুপুরির থেকেও বড় বড় হয়ে গেছে। আমরাও ভেবে কুল কিনারা পাচ্ছি না ভুতো কি বলতে চলেছে।

– "হ্যাঁ, এবার আরেক গ্লাস জল দিয়ে টপ করে আস্ত সুপুরিটা গিলে ফেলবেন।" আমাদের সবার হতভম্ব অবস্থাকে পাত্তা না দিয়ে নির্বিকার ভাবে নিজের নিদান শেষ করল ভুতো, "পেট জলে ভর্তি তো। একটু নড়ে চড়ে ঠিকঠাক সেট করে নেবেন। সুপুরিটা জলে ডুবতে ডুবতে একেবারে ঠিক জায়গায় গিয়ে বসে পড়ে সব আটকে দেবে। ব্যাস কাজ হয়ে যাবে।"

আমাদের দুই এক সেকেন্ড লাগল ব্যাপারটা বুঝতে। তারপরেই বড় ছোট তোয়াক্কা না করে সবাই হো হো করে হাসতে শুরু করলাম। জ্যেঠু ওই অবস্থাতেই, "হতচ্ছাড়া, আমার সাথে মশকরা!" বলে নিজের পায়ের চপ্পলটা খুলে ভুতোকে মারতে গেলেন। ভুতো ততক্ষণে এক লাফে রাস্তায় নেমে পগার পার।

ভুতোর উপস্থিত বুদ্ধি ছিল মারাত্মক। একটা ঘটনা বলি। তখন আমাদের উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা সবে শেষ হয়েছে। কোলকাতা থেকে আমাদের বন্ধু ধ্রুবর এক ভাই বেড়াতে এসেছে। নাম প্রত্যূষ, আমাদেরই বয়সী। সেও উচমাধ্যমিক দিয়ে মফস্বলে পিসির বাড়ি বেড়াতে এসেছে। তফাতটা হল আমরা সবাই বাংলা মিডিয়ামের ছাত্র আর সে কোলকাতার নামী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের স্টুডেন্ট। প্রথম দিনই সে ধ্রুবর সাথে আমাদের আড্ডায় এল পিঠে একটা গিটার নিয়ে। মিউসিক্যাল ইন্সট্রুমেন্টের মধ্যে আমাদের দৌড় তখন ওই হারমোনিয়াম তবলা পর্যন্ত। বই আর টিভির পর্দা ছাড়া চর্মচক্ষে কোনদিন গিটার দেখার সৌভাগ্য হয়নি। রীতিমত অবজ্ঞার স্বরে সে আমাদের জানাল যে সে নাকি কোলকাতায় তার বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করা একটা রকব্যান্ডের লীড ভোকাল। মাঝে সাঝেই এদিক সেদিক প্রোগ্রাম টোগ্রাম করে থাকে আর তারা ইংরাজি গানই গায়। প্রত্যেক কথাতেই তার মফস্বলের আর আমাদের প্রতি তুচ্ছ তাচ্ছিল্য প্রকাশ পাচ্ছিল। তার এই হাম বড়াই ভাব বেশীক্ষণ সহ্য না করতে পেরে হঠাৎ ভুতো বলে বসল যে ইংরাজিতে গান গাওয়া কি আর এমন ব্যাপার। সে তো আমরাও গাইতে পারি। শুনেই প্রত্যূষ বলল, “তাই নাকি? তোমরা ইংরাজি গান গাইতে পার? গাও দেখি।” কথা নেই বার্তা নেই ভুতোও চ্যালেঞ্জটা পট করে অ্যাকসেপ্ট করে বলে বসল, “আগে তুমি গাও। তারপর আমরা গাইব।” আমরা তখন ভাবছি এবার কেসটা খেলাম বলে। আমাদের তখন ইংরাজি জ্ঞান বলতে শুধু পরীক্ষার জন্যে শেখা কিছু এসে আর প্রশ্নোত্তর। পেটে বোম মারলেও এক লাইন ইংরাজি বেরোবে কিনা সন্দেহ, সেখানে ভুতো বলছে ইংরাজি গান গাইতে পারে। এম টিভি আর চ্যানেল ভি-র দৌলতে তখন সবে আমরা একটু একটু করে ইংরাজি গান লুকিয়ে লুকিয়ে দেখতে শুরু করেছি। কিন্তু প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সেই সব ইংরাজি গান গাওয়া আর পার্থের পিচে ম্যাকগ্রার বাউন্সার সামলে সেঞ্চুরি করা আমাদের কাছে একই রকম ব্যাপার। নাকটা পুরোপুরি কাটা যাবার আগে আমরা মানে মানে কেটে পড়ার তাল করছি, এমন সময় দেখি প্রত্যূষ দিব্যি গিটার বাজিয়ে গান ধরল। আমরা অবাক হয়ে শুনছি আমাদেরই বয়সী একটা ছেলে ইংরাজিতে গান গাইছে। মানে মাথা কিছু বুঝতে পারছি না, তবে ইংরাজিতে যে গাইছে সেটা বুঝতে আসুবিধা হচ্ছে না। আড়চোখে দেখলাম ভুতো মন দিয়ে গান শুনছে আর তালে তালে মাথা নাড়ছে। সেটা দেখে আমার গা পিত্তি আরও জ্বলে গেল। কি দরকার ছিল আগবাড়িয়ে রাস্তায় রাখা কুড়ুলের ওপর গিয়ে যেচে পা ফেলার? যথাসময়ে গান শেষ হলে প্রত্যূষ গিটারটা ভুতোর দিকে এগিয়ে দিল। ভুতো গম্ভীর মুখে গিটারটা নিয়ে কিছুক্ষণ টুং টাং করে বাজাল। তারপরে গিটারটা ফেরত দিয়ে বলল, “এটা লাগবে না। খালি গলাতেই গাইছি।” আমরা তখন শুধু শুধু বেড়ে পাকামি করে নিজেকে এবং সাথে সাথে আমাদেরও অপদস্থ করার জন্যে মনে মনে ভুতোর মুণ্ডুপাত করে চলেছি। এমন সময় ভুতো এক দুবার গলাখাঁকারি দিয়ে আচমকা তারসপ্তকে গান ধরল, “ব্রাজিল! লা লা লা লা লা লা লা লা!” নব্বই দশকের শেষ দিকে রিলিজ হওয়া ভেঙ্গাবয়েজ ব্যান্ডের এই গানটা যারা শোনেনি তাদের উদ্দেশ্যে জানাই এই পুরো গানটায় ‘ব্রাজিল’ আর ‘লা লা লা লা’ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই। টেকনিক্যালি এটা ইংরিজি গানই বটে। অবশ্য ইংরাজি কেন, এই গানটাকে বাংলা, ল্যাটিন, গ্রীক, হিব্রু যে কোনও ভাষার গানই বলা যায়। যাই হোক ভুতোর এই গান শুনে শেষ পর্যন্ত প্রত্যূষও হেসে ফেলল এবং আমাদের সাথে তার ভাব হয়ে গেল। তারপর যে কদিন সে আমাদের শহরে ছিল তার হামবড়াই ভাবটা কিছুটা হলেও কমেছিল।

এতক্ষণ ধরে তোমরা যারা ধৈর্য ধরে আমার এই ফালতু বকওয়াস পড়লে, তারা নিশ্চয়ই মনে মনে ভাবছ, ঠিক আছে, বোঝা গেছে যে ভুতো বলে একটা ছেলে ছিল, যার খুব বুদ্ধি, দারুণ রসিক ইত্যাদি ইত্যাদি। কিন্তু তাই বলে এই গল্পের নামটা 'ভুতো' না হয়ে 'মার্শাল ভুতো' হল কেন? তাহলে কি...? হ্যাঁ, ঠিক ধরেছ। আমাদের প্রত্যেকেরই যেমন ছেলেবেলায় পিতৃদত্ত নাম ছাড়াও একটা করে মিত্রদত্ত নাম থাকত, ভুতোরও সেরকম নাম হল 'মার্শাল'। বলাই বাহুল্য 'মার্শাল টিটো'র সাথে মিলিয়ে ভুতোর এই নামটা আমিই দিয়েছিলাম আর ভুতো সহ প্রত্যেকেই অত্যন্ত খুশী হয়ে এই নামটা অ্যাকসেপ্টও করেছিল। যে ঘটনার পর আমি ওকে এই নামটা দিয়েছিলাম সেটাই বলব এবার।

ছোটবেলায় আমরা স্টেশন থেকে কিছুদূরে একটা মাঠে খেলতে যেতাম। সেই মাঠটাকে সবাই ফ্যাক্টরির মাঠ বলত। মাঠটার একপাশে একটা জুট মিল ছিল আর সেই কারণেই মাঠটার নাম হয়ে গিয়েছিল ফ্যাক্টরির মাঠ। জ্ঞান হবার পর থেকে যদিও আমি সেই মিলটাকে লক আউট অবস্থাতেই দেখছি, তবুও বড়দের কাছে শুনেছি যে সেটার নাকি এককালে বেশ রমরমা ছিল। লক আউট হয়ে গেলেও, হয়ত অদুর ভবিষ্যতে আবার ফ্যাক্টরি খুলতে পারে এই আশাতেই ফ্যাক্টরির ভিতর যন্ত্রপাতিগুলো কিন্তু সরানো হয়নি। তাই বন্ধ থাকলেও ফ্যাক্টরির গেটে সবসময়ই পাহারা দেবার জন্যে কোনও না কোনও দারোয়ান মজুত থাকত। যাই হোক সেই ফ্যাক্টরির মাঠটার একদিকে ছিল সেই ফ্যাক্টরিটা, আর এক পাশে স্টেশনে যাবার রাস্তা, উল্টোদিকে ছিল রেল লাইন, আর অন্য দিকটাতে ছিল কিছু পানাপুকুর আর আগাছাভরা, পরিত্যক্ত খালি জমি। রেল লাইনটা ক্রস করলে কিছুদুর গিয়ে একটা ইঁটভাঁটা। আর তার পিছনে একটা ছোট খালের পাশে শ্মশানঘাট। বেশ নির্জন জায়গাটা, কাছাকাছির মধ্যে মানুষের বসবাস অতটা ছিল না, ফলে সেই মাঠে দাপাদাপি করে খেলতে আমাদের বেশ মজাই হত। ক্লাস সিক্স সেভেন থেকে ইলেভেন টুয়েলভ অব্দি আমরা বিভিন্ন বয়সের ছেলেরা ওই মাঠে খেলেই বড় হয়েছি।

আমরা তখন ক্লাস এইটে পড়ি, অ্যানুয়াল পরীক্ষার কিছুদিন বাকী, এমন সময় একদিন বিকেলে খেলতে এসে দেখলাম, ফ্যাক্টরির দারোয়ান চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে যে দারোয়ানটা ছিল, সে বেশ ভালোমানুষ গোছের ছিল। পরিবার নিয়ে ফ্যাক্টরির বাইরে ছোট্ট ঘরটায় থাকত। কোনও কারণে সে চলে গেছে, তার জায়গায় এসেছে আরেকটা দারোয়ান। বিহারি, বয়স খুব বেশী না। একদম রাম গড়ুরের ছানা। মুখে একফোঁটা হাসি নেই। সারাক্ষণ গোল গোল চোখদুটোকে পাকিয়ে এদিক ওদিক সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখছে। সাথে মনে হল কেউ নেই, একাই এসেছে। কেন জানি না প্রথম দর্শনেই আমাদের কারোরই একটুও পছন্দ হল না লোকটাকে।

এক দুদিনের মধ্যেই আসল বিপদটা টের পাওয়া গেল। আমাদের মধ্যে পল্টু ছিল বেশ মোটাসোটা। পিঞ্চ হিটার হিসেবে ব্যাট করত। সেদিন জীবনদার লোপ্পা ফুলটসে এমন জোরে হাঁকড়ালো যে বল মাঠ ছাড়িয়ে পাঁচিল টপকে সোজা ফ্যাক্টরির ভিতরে। এটা এমন কিছু নতুন ব্যাপার ছিল না। মাঝে মধ্যেই ক্রিকেট বল বা ফুটবল পাঁচিল টপকে ফ্যাক্টরির ভিতরে গিয়ে পড়ত। তখন ফ্যাক্টরির দারোয়ানকে বললে হয় সে বল খুঁজে এনে দিত, অথবা আমাদের দু তিনজনকে ভিতরে ঢুকতে দিত বল খুঁজে আনার জন্যে। আমাদের নিয়ম ছিল যে বলটা ভিতরে ফেলবে সে যাবে বল আনতে। আরও একজন দুজনও মাঝে মাঝে সাথে যেত। প্রথামত পল্টু আর বাউন্ডারী লাইনে যে দুএকজন ফিল্ডিং করছিল তারা গিয়ে দারোয়ানকে বলল বলটা এনে দিতে বা গেটটা খুলে দিতে। কিন্তু ও হরি, নতুন দারোয়ানটা

সটান মানা করে দিল। বলল নাকি গেট খোলার হুকুম নেই। ওদের আসতে দেরী দেখে একে একে আমরা প্রত্যেকে হাজির হলাম ফ্যাক্টরির গেটে। আমরা বার বার চেষ্টা করলাম লোকটাকে বোঝাতে যে আমরা বলটা খুঁজে নিয়েই চলে আসব। এরকম আগেও আমরা বল আনতে ভিতরে গেছি। কিন্তু ভবি ভোলবার নয়। যতই বোঝাই ওর সেই এক বাঁধা বুলি, "হুকুম নেহি হ্যাঁয়।" আমরা বললাম তুমি গিয়ে খুঁজে এনে দাও তাহলে। তাতেও রাজী হল না সেই গোঁয়ার গোবিন্দ। পাঁচিলের গায়ে কাঁচের টুকরো, পেরেক এসব বসানো। তাই পাঁচিল টপকানোরও উপায় নেই। বিফলমনোরথ হয়ে আমরা সেই নতুন দারোয়ানটার উদ্দেশ্যে নতুন শেখা কিছু বাছা বাছা বিশেষণ প্রয়োগ করতে করতে ফিরে এলাম। তখনকারদিনে একটা কুড়ি টাকা দামের ক্যাম্বিস বল কেনার জন্যেও আমাদের নিজেদের মধ্যে চাঁদা তুলতে হত আর বাড়িতে সেই পার হেড এক টাকা বা দু টাকা চাঁদা চাইতে অনেক কাঠ খড় পোড়াতে হত। তাই বলের অভাবে সেদিনে সন্ধ্যে হবার অনেক আগেই আমাদের খেলা শেষ হয়ে গেল।

যাই হোক পরের দিন কোনও ভাবে আর একটা বল যোগাড় করে আমরা আবার খেলা শুরু করলাম। তবে এবার একটু সতর্ক ভাবে। বিগ হিটসের লোভ সামলে রানিং বিটউইন দ্য উইকেটস আর ফাইন্ডিং দ্য গ্যাপসে মন দিলাম আমরা। কিন্তু আবার দু এক দিন পর সেই একই ব্যাপার। সেই জীবনদার একটা শর্ট পীচ বল, পল্টুর হুক, আর বলটা আবার পাঁচিল টপকে ফ্যাক্টরির ভিতরে। শুধু পার্থক্য এবারে আর উড়ে নয়, একটা ড্রপ খেয়ে। পরের চিত্রনাট্যটাও একই রকম। দল বেঁধে আমাদের দারোয়ানের কাছে নানা রকম অনুরোধ উপরোধ, আর দারোয়ানের সেই এক জবাব, "হুকুম নেহি হ্যাঁয়।"

একে তো এরকম ঝামেলা। তার ওপর অ্যানুয়াল পরীক্ষাও এসে গিয়েছিল। হতাশ হয়ে আমরা ফ্যাক্টরির মাঠে খেলতে যাওয়াই ছেড়ে দিলাম। পাড়াতেই ছোট একটা মাঠে ছোট পীচে হাত না ঘুরিয়ে ছুঁড়ে বল করে ক্রিকেট খেলা শুরু করলাম। এক দেড় মাস পরে অ্যানুয়াল পরীক্ষা শুরু হল আর যথাসময়ে শেষও হয়ে গেল। আমাদের ফুটবল সিজন শুরু হবার সময় এসে গেল। ফুটবল খেলতে হলে ভরসা আবার সেই ফ্যাক্টরির মাঠ। মাঝে বেশ কিছুদিন এদিকে না আসায় ভেবেছিলাম, দারোয়ানটা হয়ত এতদিনে চেঞ্জ হয়ে যাবে। কিন্তু দেখলাম সেই ব্যাটাই বহাল তবিয়তে গেঁড়ে বসেছে। আমরা ভয়ে ভয়ে খেলা শুরু করলাম। এক দুই সপ্তাহ কোনও উপদ্রব ছাড়াই খেলা হল। কিন্তু তারপর আবার সেই এক গল্প। আবার বল গিয়ে পড়ল ফ্যাক্টরির ভিতরে আর আবার সেই দারোয়ানটা অনেক কাকুতি মিনতি স্বত্তেও আমাদের ভিতরে গিয়ে বলটা খুঁজে আনতে দিল না। রবার ডিউস বা ক্যাম্বিস বলের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা ছিল। কিন্তু তাই বলে ফুটবলের ক্ষেত্রেও একই ব্যাপার। আমরা আর পারলাম না সহ্য করতে। বেশ ঝগড়া ঝাঁটিই হয়ে গেল দারোয়ানটার সাথে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বলটা উদ্ধার করা আর সম্ভব হল না। যার বল, সে তো বল হারানোর জন্যে তার বাবার কাছে মার খাবার ভয়ে কাঁদো কাঁদো মুখে বাড়ি ফিরল। আমরা পাড়ার দু একজন কাকা জ্যাঠাদের ডেকে এনেও তাঁদের মধ্যস্থতায় ব্যাপারটার একটা ফয়সালা করানোর চেষ্টা করলাম। কিন্তু কোনও লাভই হল না। সেই হতভাগা দারোয়ানটাকে তার সিদ্ধান্ত থেকে এক চুলও নড়ানো গেল না।

হতাশ হয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নিলাম যে ভাবেই হোক দারোয়ানটাকে শায়েস্তা করতে হবে। ব্যাটা প্রচুর জ্বালিয়েছে। কিন্তু শায়েস্তা কিভাবে করা যায়। সবাই মিলে ভুতোকে দায়িত্ব দেওয়া হল একটা বুদ্ধি বের করার। ভুতো একটু

সময় চেয়ে নিল। দুতিন দিন পর একদিন টিফিনের সময় ভুতো আমাকে বলল যে ওর প্ল্যান রেডি। ওর মুখে সব শুনে আমিও এক কথায় রাজী হয়ে গেলাম। সত্যি, অসাধারণ আইডিয়া, ঠিকঠাক এক্সিকিউট করতে পারলে কেল্লা ফতে। সাপও মরবে, লাঠিও ভাঙবে না। প্ল্যান মাফিক আমাদের বন্ধুদের মধ্যে বাছাই করা হল ছয় জন তাগড়া ছেলেকে, পল্টু, শ্যামলদা, বিবেকদা, জয়দীপ, সুবল আর জিকো। ঠিক হল রোগা প্যাঁকাটে হলেও কম্যান্ডার জেনারেল হিসেবে ভুতো আর ওর বেস্ট ফ্রেন্ড হিসেবে আমিও থাকব এক্সিকিউশন টীমে।

প্ল্যানমাফিক পরবর্তী অমাবস্যার রাতে খাওয়া দাওয়ার পর আমরা সবাই হাজির হলাম ভুতোর বাড়িতে। ততদিনে ভ্যাপসানো গরম পড়ে গেছে, যদিও বৃষ্টির দেখা নেই। তার আগের বছর পুজোয় পাড়ায় রবীন্দ্রনাথের ‘বীরপুরুষ’কে নাট্যরূপ দেওয়া হয়েছিল।

সেই নাটকে ব্যবহৃত ডাকাত দলের কালো পোষাক যোগাড় করে রাখা ছিল। চটপট সেগুলো পড়ে নিলাম। ভুতো কয়েকটা বীভৎস দেখতে কালো মুখোশও এনে রেখেছিল। সেগুলোও মুখে এঁটে নিলাম। এবার দুগ্গা দুগ্গা বলে আমরা আটজন রওয়ানা দিলাম অপারেশনে। আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে রাখা ছিল, ছাতুখোরটা রোজ রাতে গাঁজা টেনে ফ্যাক্টরির গেটের সামনে খাটিয়া পেতে ঘুমোয়। সঙ্গে নেওয়া হল একটা হ্যারিকেন ল্যাম্প আর লম্বা একটা লাঠি। অকুস্থলে পৌঁছে দেখলাম দারোয়ানটা সত্যি সত্যি গেটের সামনে এমনভাবে নাক ডাকাচ্ছে মনে হচ্ছে গায়ের ওপর দিয়ে একপাল বাইসন চলে গেলেও টের পাবে না। প্রথমেই লম্বা লাঠিটা দিয়ে টিমটিমে স্ট্রিটলাইট গুলো ভেঙ্গে দেওয়া হল। মেন গেটের গ্রিলের ভিতর দিয়ে হাত ঢুকিয়ে ফ্যাক্টরির লাইটটাও নিভিয়ে দিলাম। চারিদিক নিশ্ছিদ্র অন্ধকার তখন। শুধু শোনা যাচ্ছে ঝিঁঝিঁ পোকার ডাক আর দারোয়ানটার নাসিকা গর্জন।

সবাই আগে থেকে ঠিক করে রাখা মতো নিজেদের পজিশন নিয়ে নিলাম। খাটিয়ার দুই পাশে তিন জন করে ছ জন। সামনে হ্যারিকেন হাতে ভুতো আর পিছনে লাঠি হাতে আমি। ভুতো চাপা গলায় ওয়ান টু থ্রি গোনার সাথে সাথে ছটা দামড়া ছেলে একসাথে দারোয়ানটা সমেত খাটিয়াটা কাঁধে তুলে নিল। ভয় ছিল এতে হতভাগাটা যাতে জেগে না যায়। তাহলেই সব মাটি। কিন্তু আমাদের ভাগ্য ভালো লোকটা কিছু টের পেল না, খালি নাক ডাকাটা এক দু সেকেন্ডের জন্যে একটু পাতলা হল। এবার একসাথে সবাই চাপা গলায় 'বল হরি, হরি বোল' বলতে বলতে সোজা হাঁটা শুরু করলাম খাটিয়াটা কাঁধে নিয়ে। কিছুক্ষণের মধ্যেই গেট ছাড়িয়ে আমরা নেমে পড়লাম ফ্যাক্টরির মাঠে। আমাদের অভিমুখ আড়াআড়ি মাঠ পার করে রেল লাইনের ওপারে সোজা শ্মশানের দিকে। পনের কুড়ি পা মতো হাঁটার পরে হঠাৎ খাটিয়ার ওপর নড়াচড়ার শব্দ শুনে আড়চোখে তাকিয়ে দেখি মহামান্য ব্যক্তিটির ঘুম ভেঙ্গেছে। ঘাড় তুলে এদিক ওদিক তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করছে ব্যাপারখানা কি? আমাদের হাঁটার গতি সেই দেখে আরেকটু বেড়ে গেল। এক দুই সেকেন্ডের মধ্যেই আমাদের 'হরি বোল' ধ্বনির সাথে আরেকটা চাপা একটানা শব্দ যুক্ত হল। দারোয়ানটার রাম নাম। আরও তিন চার পা যেতে না যেতেই আচমকা একটা বিকট চিৎকার করে দারোয়ানটা খাটিয়া থেকে লাফ মেরে নামতে গিয়ে খাটিয়ার দড়িতে পা জড়িয়ে গিয়ে ধপাস করে আছড়ে পড়ল মাঠে। পড়ে গিয়ে সেই একই মোশনে আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে আবার আছাড় খেল, এবার পরনের লুঙ্গিতে পা জড়িয়ে। ধস্তাধস্তি করে উঠে দাঁড়াতে গিয়ে লুঙ্গিটাই গেল খুলে। কিন্তু তাতেও না দমে সে লুঙ্গির মায়া ত্যাগ করে পরিত্রাহি চিৎকার করতে করতে দৌড় লাগাল পিছনের দিকে। আমরা ছাড়া আর কেউ সেই ঘটনার সাক্ষী ছিল না বলে, নাহলে আজ উসেইন বোল্টের জায়গায় হয়ত একে নিয়েই গোটা পৃথিবী মাতামাতি করত। আমরা কোনও মতে হাসি চেপে, খালি খাটিয়াটা মাঠের ওপর ফেলে, রেল লাইন ধরে স্টেশনে এসে অন্য রাস্তা দিয়ে বাড়ি ফিরলাম।

পরেরদিন ভয়ে ভয়ে আর ওই মুখো হইনি। তার পরের দিন বিকেলে গিয়ে দেখলাম, ফ্যাক্টরির গেটে তালা ঝুলছে, দারোয়ানটার কোনও পাত্তা নেই। তার আরও দু তিন পরে দেখলাম আরেকটা নতুন দারোয়ান বহাল হয়েছে সেই ফ্যাক্টরিটা পাহারা দেবার কাজে। আমাদের ভাগ্য ভালো ছিল, এই নতুন দারোয়ানটা একেবারেই তার পূর্বসূরির মতন ছিল না।

গল্পটা হাসি আনন্দের মধ্যে এখানেই শেষ করে দিতে পারলেই বোধহয় ভালো হত। কিন্তু সেটা করলে, ওই যে অনেক ওপরে বসে থাকেন যে ভদ্রলোক, যিনি আমাদের প্রত্যেকেকে প্রতি মুহূর্তে কড়া নজর রেখে চলেছেন আর নিক্তিতে মেপে আমাদের সবার ভাগ্যে সমান সমান করে সুখ আর দুঃখ ভাগ করে দিয়ে জীবনের ভারসাম্যটা বজায় রেখে চলেছেন, তাঁর প্রতি অবমাননা করা হয়ে যাবে। তাই জাম্প কাট টু বিংশ শতকের শেষ মাস। ওয়াই টু কের আশঙ্কায় আর অপেক্ষায় দিন গুনছে গোটা বিশ্ব। ততদিনে আমি জয়েন্টে ভাল র‍্যাঙ্কিং করে ভর্তি হয়ে গেছি যাদবপুরে। আমাদের শহর থেকে যাতায়াত করা অসুবিধাজনক বলে কোলকাতায় হোস্টেলে থেকে পড়াশোনা করি। ভুতোও হায়ার সেকেন্ডারিতে ফার্স্ট ডিভিশন পেয়ে সায়েন্স নিয়ে ভর্তি হয়েছে কাছাকাছি একটা কলেজে। প্রথমদিকে প্রত্যেক শনি রবিবার বাড়ি চলে এলেও, সেকেন্ড ইয়ারে উঠে আস্তে আস্তে পড়ার চাপ বাড়তে থাকায় আর হোস্টেলে থাকার মজাটা পেয়ে যাওয়ায় মাসে দুমাসে একবার বাড়ি আসতাম। তখন তো মোবাইলের চল ছিল না, তাই ভুতোর সাথে যোগাযোগটা কমে গিয়েছিল। এরকম সময়ে একদিন বাড়িতে ফোনে কথা বলার সময় বাবার কাছে দুঃসংবাদটা পেলাম। ভুতোর বাবা দেবাশিসকাকু একদিন কোলকাতা আসবেন বলে স্টেশনে এসে দেখেন একটা ট্রেন জাস্ট বেরিয়ে যাচ্ছে। উনি সেই দেখে দৌড়ে চলন্ত ট্রেনে উঠতে গিয়ে হাত ফস্কে পড়ে গেছেন ট্রেনের তলায়। প্রাণটা আশ্চর্যভাবে বেঁচে গেলেও ডান হাতটা কনুইয়ের কাছ থেকে কাটা পড়ে গেছে। মনটা ভীষণ খারাপ হয়ে গেল কথাটা শুনে। পরের সপ্তাহে বাড়ি ফিরেই গেলাম দেবাশিসকাকুকে দেখতে। বাড়ির বাইরে ভুতোর সাথে দেখা হল। বলল, “বাবা ট্রেনটার হাতে হাত ধরে চলতে চেয়েছিল, বুঝলি? কিন্তু ট্রেনটার মনে হয় সেটা পছন্দ হয়নি। তাই বাবার হাতটাই নিয়ে চলে গেল।” দেখলাম এত দুঃখের মধ্যেও ভুতোর মুখের হাসিটা অমলিন। শুধু চোখের কোনায় যেন একটু জল চিকচিক করছে।

দেবাশিসকাকুর চিকিৎসার জন্যে প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়েছিল। উনি কোলকাতায় একটা প্রাইভেট অফিসে সাধারণ একটা চাকরী করতেন। অফিস থেকে কিছুটা সাহায্য পাওয়া গেলেও সেটা যথেষ্ট ছিল না। তাছাড়া সে যাত্রায় বেঁচে গেলেও, ওঁর শরীর এই ধাক্কাটা সামলাতে পারেনি। এক বছরের মাথায় উনি মারা যান। এই আচমকা বিপর্যয়ে ভুতোর গ্র্যাজুয়েশনটা আর কমপ্লিট হল না। শুনলাম ভুতো নাকি এদিক ওদিক চাকরীর চেষ্টা করছে। ছুটি ছাটায় তখন বাড়ি এলেও ভুতোর সাথে সাক্ষাৎ খুব বেশী হত না। ইতিমধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পাশ করে ক্যাম্পাসিং-এ চাকরী পেয়ে আমি চলে এলাম ব্যাঙ্গালোরে। দু এক বছরের মধ্যে লং টার্ম অনসাইটে চলে গেলাম ইউ কে-তে। বাবার রিটায়ারমেন্টের পর বাবা মাও কোলকাতায় ফ্ল্যাট করে চলে এল। বিয়ে থা করে লাইফে সেটল করলাম। ভুতোর সাথে যোগাযোগটা একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল।

বছর দুয়েক আগে হঠাৎ খেয়াল হল কোলকাতার বাইরে এতদিন তো কাটালাম, এবার ঘরের ছেলে ঘরে ফেরা যাক। যেমন ভাবা তেমন কাজ, চলে এলাম কোলকাতা। ভালই কাটছিল জীবন। আমাদের পৈত্রিক বাড়িতে আমার জ্যেঠু, বড়দাদারা থাকত। গতবছর বিজয়ার সময় ঠিক করলাম বৌ বাচ্চা নিয়ে একবার ঘুরে আসব ওখান থেকে। গুরুজনদেরদের প্রণাম করাটাও হয়ে যাবে, বউ বাচ্চাকে একবার ঘুরিয়ে নিয়ে আসাও হবে আমার ছোট থেকে বড় হয়ে ওঠার সাক্ষী শহরটা থেকে। সত্যি অনেকদিন পর ওখানে গিয়ে খুব আনন্দে কাটল দিনটা। দেখলাম কতটা পাল্টে গেছে শহরটা। পুরনো বাড়িগুলো ভেঙ্গে দিয়ে একের পর এক জি প্লাস ফোর ফ্ল্যাটবাড়ি গজিয়ে উঠেছে। দু

একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর্সও চালু হয়ে গেছে। আমাদের পাড়ার মুখে যে মাঠটায় আগে পুজো হত, সেখানে রেলিং করে একটা শিশু উদ্যান বানানো হয়েছে। বড়দার কাছে শুনলাম পাড়ার আগের সব কাকু জ্যেঠুরা কেউ কেউ আর নেই। কথায় কথায় ভুতোর কথা উঠল। বড়দার কাছে জানতে পারলাম, ভুতো ওদের বাড়িটা একটা প্রোমোটারকে দিয়ে দিয়েছিল। এখন চুক্তি অনুযায়ী সেখানে তৈরি হওয়া অ্যাপার্টমেন্টটায় একটা ফ্ল্যাট পেয়ে সেখানে থাকে। এছাড়াও গ্রাউন্ড ফ্লোরে একটা কমার্শিয়াল স্পেস পেয়ে সেখানে একটা স্টেশনারি দোকান খুলেছে। সারাদিন সে ওই দোকানেই বসে। এছাড়া রোজ সকালে শিশু উদ্যানটাতে পাড়ার কচিকাঁচাদের ক্যারাটে শেখায়। বড়দার কথায় মনে পড়ল কলেজে ভর্তি হবার পর জ্যাকি চ্যানের মুভি দেখে উদ্বুদ্ধ হয়ে ভুতো বেশ কিছুদিন ক্যারাটে শিখেছিল বটে।

সারাদিন খুব আনন্দে কাটিয়ে সন্ধ্যেবেলা যখন বাড়ির বাইরে পার্ক করা গাড়ীতে ওঠার আগে সবার কাছ থেকে বিদায় নিচ্ছি এমন সময় দেখলাম সাইকেল চালিয়ে একটা খুব চেনা মুখ আমাদের দিকে আসছে। এক মুহূর্তের মধ্যে চিনতে পারলাম ভুতোকে। প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেলেও ভুতোও আমাকে চিনতে পারল। সাইকেল থেকে নেমে এসে বুকে জড়িয়ে ধরল। বউকে পরিচয় করিয়ে দিলাম আমাদের ছোটবেলার বেস্ট ফ্রেন্ড ভুতোর সাথে। এতদিন পর দেখা হওয়ায় অল্প সময়ের মধ্যেই কত কথাই না বললাম দুজনে। মিনিট দশ পনের কিভাবে কেটে গেল বুঝতেই পারলাম না। শেষে আবার আসব কথা দিয়ে গাড়ীতে ওঠার আগে ভুতোর হাত দুটো চেপে ধরে বললাম, "ভাল থাকিস রে, ভুতো!" জবাবে ভুতো ওর সেই সিগনেচার হাসিটা হেসে বলল,

– "সে ভালই আছি রে। এই দেখ না, জীবনে ফিল্ড মার্শালও হতে পারলাম না, ম্যালকম মার্শালও হতে পারলাম না। কিন্তু তাতে কি, এই তো পার্কে রোজ সকালে বাচ্চাগুলোকে মার্শাল আর্ট শিখিয়ে তোর দেওয়া নামটা সার্থক করার চেষ্টা করছি।"

অলঙ্করণঃ শ্রী অনির্বাণ সেনগুপ্ত

প্রযুক্তি ও তার ভবিষ্যৎ

সোহম

জানুয়ারী ১৯, ২০১৭

১

Technology যেন সমুদ্রের মতোই যতটা নেয়, ততটাই ফিরিয়ে দেয়। কথা-টা হয়তো সম্পূর্ণ ঠিক নয়; প্রযুক্তিকে ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কিন্তু কিছুটা তো ঠিক অবশ্যই। তাকানো যাক আজ থেকে মোটামুটি ১০ বছর আগের দিনগুলোয় বাংলার সংগীতজগৎ-এর দিকে। খুব সঙ্গীন অবস্থা। এখন যে খুব ভালো অবস্থায় আছে, তা নয়। তবে এখনকার থেকে তখন অবস্থা আরো খারাপ ছিল। MP3-এর ব্যবহার ততদিনে আমরা সকলে জেনে গেছি। ফলে Music CD আর প্রায় বিক্রিই হচ্ছে না। বাংলা ব্যান্ড যদিও ভীষণ পপুলার। private radio channel গুলো কিছুটা চেষ্টা করছে বাংলা গান বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু রেডিওগুলো বিভিন্ন অভিনব প্রক্রিয়ায় চেষ্টা করলেও, CD-এর কাটতি বাড়াতে পারছেন না।

Cut-to আজকের যুগ। CD ব্যাপারটাই প্রায় উঠে গেছে। পার্ক স্ট্রিটের Music World বন্ধ হয়ে গেল। YouTube, Spotify, Saavn, Gaana, Google Play Music – এসব চলে এলো। MP3 যে এখনো নেই তা নয়, এখনো যে পাইরেসি হচ্ছে না, তা নয়। কিন্তু একটা অল্টারনেটিভ রাস্তা খুঁজে পাওয়া গেছে। আজকালকার গানগুলো সব থাকছে কোনো এক সার্ভারে। সেখান থেকে সবাই download করে শুনছেন। শিল্পীও তার পয়সা পাচ্ছে, আর কিছু

advertisement-এর ন্যূনতম বিরক্তি সহ্য করে, আমরাও বিনামূল্যে গান শুনতে পারছি। বা কিছু টাকার বিনিময়ে সেই বিজ্ঞাপনের বিরক্তিও দূর করা সম্ভবপর হচ্ছে।

কিন্তু এতে আবার একটা নতুন সমস্যা তৈরী করেছে – এই যে শিল্পী আর শ্রোতার মধ্যিখানের কোম্পানিগুলি – এগুলো নাকি শিল্পীদের ন্যায্য দাম দিচ্ছেন না। এক উঠতি ব্যান্ডের গিটারিস্টের সাথে কথা হচ্ছিলো প্রযুক্তির পীঠস্থানে, মানে এই খোদ আমেরিকায়। তাদের বক্তব্য Spotify-এর মতো বড় বড় কোম্পানি যে পরিমান income-এর স্বপ্ন দেখে বা already যা income করছে, তার খুব সামান্যই musician-রা পান। Google-এর বিরুদ্ধেও এই অভিযোগ উঠেছে YouTube-কে নিয়ে। যাই হোক, আপাতত এটা মনে রাখা যাক, এই মধ্যিখানের কোম্পানিগুলোর ভূমিকা সামান্য ঝাপসা...

এবার একটু অন্য দিকে চোখ রাখা যাক। কিছু বছর আগের কথা, তখন আমি প্রাইভেট সার্ভিসেস কোম্পানির ঘানি টানছি কলকাতায়। মাস গেলে মাইনে পাচ্ছি, যদিও সন্তুষ্টি অধরা। এই সময় অনেক ধরণের নতুন চিন্তা মাথায় আসতো। সেই idea-গুলোই আমার বন্ধুদের সাথে শেয়ার করে নিতাম, যাদের সাথে আবার ফ্ল্যাটও শেয়ার করতাম।

এর মধ্যে একটা সমস্যা যেটা মনে হয়েছিল – সেটা হল, এই যে এতো ট্যাক্সি আমাদের শহরে ঘোরাফেরা করে, অনেক সময়ই ফাঁকায়, বিনা যাত্রীতে এদিক-ওদিক যায়। সেই ট্যাক্সিগুলোতে যদি একটি GPS device বসিয়ে centrally control করা যেত, তাহলে অনেক তেল আর সময় বাঁচানো যেত। জানি কি ভাবছেন। এটাই তো এখন Uber, Ola বা Lyft করে। আর আমার দাবি এই যে, Uber-এর আগেই আমি এই ভাবনাটা ভেবে ফেলেছিলাম? না আদৌ, তা নয়। এটা আমার মতো হয়তো অনেকেই ভেবেছিলো। Uber সেটা করে দেখিয়েছে। Information Technology-তে ভাবনার খুব একটা কোনো মূল্য নেই (আমার যে বন্ধুটিকে বলেছিলাম সে তো বলেছিলো যে এসব ট্যাক্সিওলাদের সাথে কোনোরকম deal করাটাই চাপের)

যাই হোক, আমার idea-টার আরও একটা part ছিল। আমি ভেবেছিলাম যখন একটা Software বানানো হয়ে যাবে এই idea-টা দিয়ে, তখন সেটাকে Government-এর কাছে বেচে দেব। কারণ খুব স্বাভাবিকভাবেই, Software তৈরী হয়ে যাওয়ার পর ওটায় আমার আর কোনো ভূমিকা দেখিনি। এবং এখানেই লুকিয়ে আছে পরের ব্যাপারটা।

Uber ঠিক করছেটা কি? কেউ তার নিজের গাড়ি চালাচ্ছে। আমরা সেইসব গাড়িতে চড়ছি। যে গাড়ি চালাচ্ছে, সে তার প্রতিদানে কিছু পাবে, সেটাই স্বাভাবিক। আমি গাড়ি চড়ছি, তাই আমি গাড়ির চালক ও মালিককে কিছু টাকা দেব, সেটাও স্বাভাবিক। কিন্তু Uber? সে কি করছে? সে Software-এর মাধ্যমে গাড়ি আর তার সওয়ারীকে connect করছে। কিন্তু Software যখন তৈরী হয়ে গেলো, তারপর সেটা maintain করার *প্রকৃত* খরচ তো খুবই সামান্য। এই maintenance cost-এর ব্যাপারটা সমস্ত Software Engineer-দেরই জানা। এবং আজকাল প্রযুক্তি এতটাই উন্নতির জায়গায় চলে যাচ্ছে, যে একটা computer নিজেই তার fault বুঝতে পেরে, তাকে সারিয়ে নেবার প্রাথমিক পদ্দক্ষেপগুলো নিয়ে নিতে পারছে। মানুষের সহযোগীতা খুব কমই দরকার হচ্ছে। এই automated

fault resolution নিয়ে এখন অনেক গবেষণাও হচ্ছে। সুতরাং, maintenance cost আরো কমবে ভবিষ্যতে, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

তাহলে এবার প্রশ্ন: Uber-কে আমি কি জন্য টাকা দেব? বা Uber-এর এই গাড়ির মধ্যস্থতা করার জন্য আলাদা করে আদৌ অস্তিত্বের কি প্রয়োজন আছে? কোনো Government-ই তো এটা operate করতে পারে। বরং Government-এর আরো সুবিধে আছে। গাড়ি চালকের বৈধতা, কোনো দুর্ঘটনা-জনিত সমস্যা – এ জাতীয় যাবতীয় জটিলতা (আজকাল পেপারেও দেখা যায়) মেটানোর ব্যাপারে Uber-এর মতো প্রাইভেট কোম্পানিগুলোর থেকে আমাদের সরকার অনেক বেশি সক্ষম এবং উপযুক্ত।

এবার একটা প্যাটার্ন ধরার চেষ্টা করা যাক। গানের জগতের Spotify, গাড়ির জগতের Uber, অথবা এরোপ্লেন বুক করার Yatra.com বা ঘুরতে গিয়ে বাড়িঘর বুক করার AirBnB – এই সমস্ত সংস্থাগুলো শুধুমাত্র একটা ব্রিজের ভূমিকা নিচ্ছে – পরিষেবা যে দেবে আর যে পাবে – তাদের মধ্যে। কিন্তু ক্রেতা এবং বিক্রেতা দুজনেই এই সংস্থাগুলোকে আলাদা করে টাকা দিচ্ছে। Uber যখন আপনি চড়েন, তখন Uber একটা charge কেটে নেয় আপনার থেকে, তার নিজের জন্য। আবার Uber-চালক আপনাকে গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেওয়ার জন্য যে টাকা পান, তার একটা অংশ Uber-কে দেন (আসলে procedure-টা আরো জটিল, কিন্তু মোটের উপর এটাই)। তাহলে আপনি বা গাড়ির চালক Uber-কে টাকাটা দিচ্ছেন কেন? শুধুমাত্র কোনোকালে তারা একটি Software তৈরি করেছিল বলে, মূলত তাই তো?

প্রযুক্তির বিষয়ে মূল প্রশ্নটা এখন এখানেই। প্রযুক্তি তো আমাদের নিরন্তর দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু প্রযুক্তির মালিকানাটা ঠিক কার হাতে? Uber, Spotify-এর Software-গুলো তৈরী করেছে আপনার-আমাদের মতোই হাজার হাজার Software Engineer-রা। কিন্তু কিছুদিন পর থেকেই Uber-এর আর দরকার হবে না এইসব Software Engineer-দের। কারণ তারা তো already Software-টা তৈরি করেই ফেলেছে। কিন্তু তাদের তৈরী করা এই Uber কিন্তু থেকে যাবে, আর তার মুনাফা পকেটস্থ করবে Uber-এর মালিকানা যাদের আছে, সেই গুটিকতক মানুষ।

এই নিয়ে খুব সচেতনভাবে ভাবা দরকার – প্রযুক্তির যে অসম্ভব প্রগতি আর তার যে দানগুলো আমরা সমাজে প্রকটভাবে দেখতে পাচ্ছি – সেটা আমরা কাদের হাতে ছেড়ে দেব! ভীষণ অদ্ভুত ব্যাপারটা হলো – এ নিয়ে যাদের সব থেকে বেশি কথা বলা দরকার – সেই বামপন্থী সংগঠনগুলো এই পরিবর্তনটা ধরতেই পারেননি ঠিক করে। পরবর্তী জামানাটা যে শুধুমাত্র এক তথ্যভিত্তিক জামানা হতে চলেছে – যে ব্যাপারে তারা পুরোপুরি উদাসীন। তথ্যের মালিকানা যার, আগামী সময়টাও তারই – এই নিয়ে বেশিরভাগ বামপন্থী সংগঠনগুলো কিছু বলে না। শুধুমাত্র সামান্য কিছু প্রগতিশীল, বামপন্থী নিউজপেপার এই নিয়ে একটু লেখালিখি করে।

এই বিষয়টা গুরুত্বপূর্ণ হওয়ার আর একটা বড় কারণ আছে। আমরা ভীষণ দ্রুতভাবে সেই যুগটায় যেতে চলেছি – যখন আমাদের বেশিরভাগ কাজ automated হয়ে যাবে। মনে হতে পারে এটা কোনো science fiction – কিন্তু

একটু প্রযুক্তির খোঁজখবর নিলেই বুঝতে পারবেন – আর কিছুদিন পর থেকেই আমাদের নিজেদের দৈনন্দিন কাজগুলো করার জন্য মানুষের সহযোগিতার আর প্রয়োজন হবেনা। কোনো artificially intelligent agent আমাদের সাহায্য করে দেবে।

ধরুন, একটা সারা দিনের কিছু কাজের কথা। সকালে উঠে আপনি ব্রেকফাস্ট করলেন, toaster-এ তৈরী করা ব্রেড আর জ্যাম দিয়ে। এর পর আপনি স্নানে যাওয়ার সময় Alexa (Amazon-এর voice assistant)-কে বলে দিলেন ১৫ মিনিট পরে একটা Uber ডেকে দিতে। Uber একটা driverless car পাঠিয়ে দিল (যা এখন ক্যালিফোর্নিয়া আর পিটসবার্গে already রাস্তায় commercially চলছে). আপনি অফিসে এসে দেখলেন computer আপনার সব কাজ এগিয়ে রেখেছে, আপনি শুধু একটু approve করে দিলেন কাজগুলো। তারপর আপনি ভাবতে শুরু করলেন যে নতুন, innovative আর কি করা যেতে পারে। ইতিমধ্যে বাড়ি ফেরার সময় এলো। আপনি অফিসে রাখা Alexa-কে বললেন বাড়ি ফেরার রাস্তায় Amazon Store-এ আপনার জন্য ১ কেজি চিকেন রেডি রাখতে। Amazon তার Robot দিয়ে সেটা রেডি রাখলো। আপনি চালকবিহীন Uber-করে বাড়ি ফেরার সময় Amazon Store থেকে টুক করে চিকেন তুলে আনলেন। বাড়ি এসে আপনার জামাকাপড় ধোওয়া এবং শুকোনোর জন্য Washing Machine-এ দিয়ে দিলেন। তারপর মুরগির মাংস দিয়ে জমিয়ে ডিনার সারলেন। এরপর ঘুমোতে যাওয়ার সময় Google Assistant-কে বললেন আপনার মোবাইলে সকাল ৭টার আল্যার্ম দিতে। খুব অকল্পনীয় ঘটনা কিন্তু নয়, কারণ প্রায় প্রত্যেকটা product মার্কেটে already পাওয়া যাচ্ছে।

এই artificial intelligence-কে যদি আমরা মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে ছেড়ে দিই, তাহলে মুনাফাটাও ক্রমশ জড়ো হবে সেই লোকগুলোর সিন্দুকেই। গরিব আর ধনীর মধ্যে তফাৎ যেভাবে এখন অশ্লীলভাবে বেড়ে চলেছে – এটা থামানো সম্ভব হবে না।

তাই সমাজের শিক্ষিত অংশ – মানে যারা এই প্রযুক্তির সুফলটা প্রথমেই পাচ্ছে আর যাদের আমার এই লেখাটা পড়ার সম্ভাবনা আছে – তাদের ভাবা দরকার প্রযুক্তিটা কাদের দখলে থাকা উচিত? যারা Software-গুলো তৈরী করছেন, সেই সকল মানুষ এবং জনগণের? নাকি কিছুসংখ্যক ভাগ্যবান লোকের দখলে? যারা প্রযুক্তিটাকে টাকা ছাপাবার মেশিন হিসেবে ব্যবহার করবে? ভাবনার দায়িত্ব আমাদের সকলের।

২

জীবনবিজ্ঞান পড়তে কোনোকালেই ভালো লাগতো না। বরাবরই বায়োলজিকে সাবজেক্ট হিসেবে এড়িয়ে এসেছি। কিন্তু কম্পিউটার ইঞ্জিনিয়ার হওয়ার পরে দেখলাম, শেষে কিনা প্রযুক্তির এই দুর্নিবার গতি আসলে বায়োলোজিকেই অনুসরণ করছে! আমরা যেভাবে ভাবি, কাজ করি, সিদ্ধান্ত নিই, সেগুলোকেই একটা যন্ত্রকে দিয়ে করাতে চাইছি আমরা। আর তার উদ্দেশ্যেই হয়ে চলেছে কম্পিউটার সায়েন্সের বেশিরভাগ গবেষণা। এই গবেষণা এগোচ্ছে বেশ দারুন গতিতে সফলভাবেই। তবে এই সফলতা যে মানবজাতির ভালো কাজেই আসছে, তা নয়। সফলতার পরিণাম

হিসেবে আমরা পাচ্ছি বিপুল সংখ্যক মানুষের বেকারিত্ব এবং "termination of employment"। এই লেখার মূল উদ্দেশ্য, কম্পিউটার সায়েন্সের যে বিভাগটা এই আমূল পরিবর্তন ঘটাচ্ছে, সেই বিজ্ঞানটা কিভাবে আমাদের চারপাশের অর্থনীতিকে প্রভাবিত করছে, তার খোঁজ করা।

যেসব আবিষ্কারগুলো এ যাবৎকাল ধরে মানুষের সভ্যতার গতি-প্রকৃতি আমূল পাল্টে দিয়েছে, তাদের কয়েকটা হল – আগুনের আবিষ্কার, বিদ্যুৎ, পারমাণবিক বোমা। আর আগামী কয়েকবছরে যে আবিষ্কারটা সভ্যতার বেশ খানিকটা পরিবর্তন ঘটাতে চলেছে, তা হল: Machine Learning (মেশিন লার্নিং বা ML) এবং Artificial Intelligence (আর্টিফিসিয়াল ইন্টালিজেন্স বা AI).

প্রথমে বলা যাক, মেশিন লার্নিং ঠিক কি? খুব ছোট্ট কথায়, কম্পিউটারের কাছে সাধারণত যে বিপুল পরিমাণ তথ্য থাকে, তা থেকে কিছু আকর্ষণীয় বা গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে অথবা ফলাফলে আসার বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির নাম মেশিন লার্নিং। যদিও আমি এখানে চূড়ান্ত অ-বৈজ্ঞানিক একটা সংজ্ঞা দিলাম। যারা এ বিষয়ে বিশেষজ্ঞ তারা জানেন, এই মেশিন লার্নিং-এর পিছনে লুকিয়ে আছে খুব নিগূঢ় কিছু গাণিতিক থিওরি। কিন্তু যেহেতু এই লেখাটা বিজ্ঞান আর অর্থনীতির সম্পর্ককে ধরতে চাইছে, তাই এরকম একটাই সংজ্ঞাই আপাতত সঙ্গত মনে হল।

যাই হোক, এখন যে প্রশ্নটা মাথায় আসতে পারে, তা হল – কম্পিউটার তাহলে তার সঞ্চিত তথ্য থেকে কিভাবে কিছু দুর্দান্ত সিদ্ধান্ত বা কিছুটা অজানা তথ্যের সন্ধান দেওয়ার চেষ্টা করছে? প্রায় সেভাবেই, যেভাবে আপনি আপনার মস্তিষ্কে করে থাকেন। আপনার মাথায় যেমন আছে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক, যেটা বোঝার চেষ্টা করে, লাল সিগনাল জ্বলছে মানে আমাকে ট্রাফিকে দাঁড়াতে হবে, অথবা সেই জাতীয় কিছু সেরিব্রাল কাজ; ঠিক সেরকমই কম্পিউটার তৈরি করছে তার ভিতরে একটা নিউরাল নেটওয়ার্ক। আমরা যা যা জানি, যে যে বিষয়ে আমাদের কাছে তথ্য আছে – তা দিয়ে এরকম নিউরাল নেটওয়ার্ক তৈরি করা হয়েছে। বিভিন্ন নিউরাল নেটওয়ার্কের উদ্দেশ্য আলাদা হতে পারে। যেমন, কোনো নিউরাল নেটওয়ার্ক শুধুই চালক-বিহীন গাড়ি চালানোর কাজে লাগানো যেতে পারে। আবার কোনো নিউরাল নেটওয়ার্ক শুধুই দুর্দান্ত দাবা খেলার কাজে আসতে পারে। দাবার কথা বললাম, কারণ দাবা সবথেকে কঠিন খেলাগুলোর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সেই কঠিন খেলাতেও মানুষের থেকে বেশি পারদর্শী হয়ে একটি কম্পিউটার মানুষকে হারিয়ে দিচ্ছে। এখানে এটা বোঝা খুব জরুরি যে, এই নিউরাল নেটওয়ার্ক এইসব কিছু নির্দিষ্ট কাজ করার জন্য মানুষের থেকেও বেশি শক্তিশালী হয়ে উঠছে। কারণ মানুষের যে সব সীমাবদ্ধতা, যেমন খুব বেশি তথ্য মনে রাখতে না পারা বা ক্লান্ত হয়ে যাওয়া, এই সমস্যা কিন্তু কম্পিউটারের প্রায় নেই। ইতিমধ্যেই দাবার থেকে কঠিন প্রেডিকশানের খেলাগুলোতেও, যেমন পোকার বা চীনের গো নামক খেলাগুলোতে, বিশ্বের চ্যাম্পিয়নদের হারিয়ে দিয়েছে কম্পিউটারে বসে থাকা মেশিন লার্নিং সিস্টেম। এবার এই সিস্টেমকে জীবনের অন্য ক্ষেত্রের সমস্যা সমাধানে প্রয়োগের পালা।

কিন্তু তার আগে আর একটা প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হবে। এই যে মেশিন লার্নিং-এর সাহায্যে নতুন প্রযুক্তি আমাদের জীবনকে আরো সহজ করে দেওয়ার চেষ্টা করছে, সেটা কি খুব নতুন কিছু? মেশিন লার্নিং আর তাকে কাজে লাগিয়ে আমরা যে কৃত্তিম বুদ্ধিমত্তা গড়ে তুলছি যন্ত্রের ভিতরেই – তার সাহায্যে আমরা ঠিক কোন ধরণের কাজগুলোকে

আরো সহজে করে ফেলতে পারবো? সেই কাজগুলো, যেগুলোতে আমাদের বিশ্লেষণী ক্ষমতা লাগতো। মানে ধরুন, আমাদের কাছে আছে – প্রচুর রোগীর ব্যক্তিগত তথ্য ও তাদের যে রোগ হয়েছিল, তার প্রাথমিক symptom কিরকম ছিল, তার একটা ইতিহাস। সেই তথ্য শুধু দিয়ে দিতে হবে কোনো মেশিন লার্নিং সিস্টেমকে। এর পরে ওই সিস্টেম তার পারদর্শিতা দেখাতে শুরু করবে। সিস্টেমকে এর পরে শুধু বলতে হবে কোনো নতুন এক রোগীর প্রাথমিক symptom-গুলো। তাহলে সেই সিস্টেম বলে দিতে পারে, খুব সহজেই, কোনো নতুন রোগীর ঠিক কোন রোগটা হয়ে থাকতে পারে। এই কাজটা কোনো ডাক্তারও হয়তো বিশ্লেষণ করে করতে পারেন, কিন্তু একটা মেশিনেরও সেই ক্ষমতা জন্মাচ্ছে। এর মানে এই নয় যে, কাল থেকে আর ডাক্তারদের দরকার হবে না। ডাক্তাররা চিরকালই আমাদের সমাজে মূল্যবান, কিন্তু তাদের একটা অল্টারনেটিভ থাকছে। আরো বড় আকারে বললে, আমরা বিশ্লেষণী ক্ষমতার কাজগুলোকে হয়তো মেশিনের সাহায্যেই করতে শুরু করছি।

এতদিন যাবৎ আমরা মূলত কায়িক শ্রমের কাজগুলোকে মেশিনের মাধ্যমে করানোর চেষ্টা করছিলাম। ফোর্ডের গাড়ি কারখানাতে, গাড়ির বিভিন্ন যন্ত্রাংশ একটা কনভেয়ার বেল্টে পরের পর জুড়ে যাচ্ছে। একটা গাড়ি তৈরি করার জন্য, মানুষের সাহায্যের দরকার প্রায় হচ্ছেই না। এই দৃশ্য আমরা এতদিন দেখে আসছি। কিন্তু এবার, যে সব কাজে analytical ability লাগতো, সেগুলোতেও মানুষের থেকে দক্ষ বিকল্প আসা শুরু হয়েছে। এই পরিবর্তন এখনো খুবই শুরুর দিকে, কিন্তু একে বলা হচ্ছে Industrial Revolution 4.0। যেহেতু কম্পিউটার এখন নিজেই মানুষের থেকেও বেশি বুদ্ধিমান হয়ে যেতে চলেছে, তাই প্রযুক্তির উন্নতিতে এর পরের প্রগতিটা হয়তো খুব দ্রুত হবে। কিন্তু আমরা কি তৈরি এই পরিবর্তনটার জন্য? অর্থনৈতিক ভাবে?

এই পরিবর্তনটার অর্থনৈতিক দিকটা নিয়ে একটু গভীরে ভাবা যাক। যখন কায়িক আর বিশ্লেষণী ক্ষমতা দরকার, এমন কাজগুলো একটা কম্পিউটারই করতে পারবে, তাহলে মানুষের জন্য ঠিক কোন ধরনের কাজ পড়ে থাকবে? মূলত, তিন ধরণের। প্রথমত, কোনো শিল্পীর শৈল্পিক এবং স্বতন্ত্র কাজগুলো। যদিও কম্পিউটার এখনই নতুন ধরণের গান-বাজনা নিজেই তৈরী করতে পারছে, তবুও আমার মনে হয় শিল্পের জায়গাটা মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে যেমন ছিল, তেমনি ভবিষ্যতেও থেকে যাবে। কারণ শিল্পটা শুধুমাত্র তথ্যের ওপর ভিত্তি করে হয়না। তার জন্য সৃজনশীলতা লাগে, যেটা কোনো কৃত্তিম নিউরাল নেটওয়ার্ক আপাতত দিতে পারছে না। দ্বিতীয়ত, একজন রিসার্চারের নতুন উদ্ভাবনী কাজগুলো। মূলত আগের বলা কারণেই কম্পিউটার এখনো স্বতন্ত্রভাবে নতুন উদ্ভাবন করার ক্ষমতা ধরে না। এবং আগামী ৫০ বছরে সেরকম নতুন idea নিজে গড়ে তোলার ক্ষমতা অর্জন করা সম্ভব নয় বলেই মনে হয়। আর তৃতীয়ত এবং শেষ, কোনো সিদ্ধান্তকে সঠিক বলে অন্য মানুষকে convince করার কাজটা। মূলত MBA যারা করেন, যারা কোনো সংস্থার leader বা মানুষের psychology বা মনস্তত্ব নিয়ে যারা কারবার করেন, তাদের কাজটা আপাতত বেশ কয়েকবছর কম্পিউটারের পক্ষে করা অসম্ভব। কারণ কোনো রোবট বা মেশিন লার্নিং সিস্টেম মানুষের সাথে তর্কে জিততে পারেনা।

এই যে কতিপয় কাজ পড়ে থাকবে, তাতে অনেক মানুষ তো কাজ হারাবেন। তাহলে কি আমাদের সমাজ ভেঙে পড়বে? এতটা সহজে নয়, কারণ এই প্রযুক্তির আশীর্বাদেই আমরা পৌঁছবো আমাদের উৎপাদন ক্ষমতার শিখরে।

মেশিনরা এখনই এত সুদক্ষ যে আমাদের সারা পৃথিবীতে যা খাবার উৎপাদন হয়, তা দিয়ে পৃথিবীর সকলের অন্ন-সংস্থানে কোনো অসুবিধাই হওয়া উচিত নয়। অনেকেই হয়তো জানেন, যে অন্ন-সংস্থানের থেকেও মূল সমস্যাটা অন্ন-ভাগ করে দেওয়ার। আর মেশিন লার্নিং আমাদের এমন পর্যায়ে নিয়ে যাচ্ছে, যেখানে শুধু বর্তমান নয়, আমরা ভবিষ্যতের খাদ্য এবং অন্য সামগ্রী সংকুলানের নিশ্চয়তা দিতে শুরু করেছি। কিন্তু মুশকিল হয়ে যাচ্ছে, সেই একটাই জায়গায়। এই সমস্ত সিস্টেমের দখল থাকছে খুব কম কিছু মানুষের হাতে। ফলে বর্তমান বা ভবিষ্যতের যে নিশ্চয়তা আমাদের আয়ত্ত্বে আছে, তা আমরা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে পারছিনা। সুতরাং, প্রযুক্তির এই কুক্ষিগত হওয়ার প্রবণতাকে বন্ধ না করতে পারলে, আমরা কখনোই এর সুফলগুলো উপলব্ধি করতে পারবো না। মানুষ এখন যেমন বেশি সংখ্যক হারে কাজ হারাচ্ছেন, সেটাই বাড়তে থাকবে। অর্থ জমা হতে থাকবে মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের কাছেই, যেমনটা এখন হচ্ছে।

এবার চোখ ফেরানো যাক, আমাদের চারপাশের হালহকিকত নিয়ে। ভারতের ইনফরমেশান টেকনোলজির সেক্টরে গত প্রায় ১৫-২০ বছরে যে বিপুল জোয়ার এসেছিলো, তা হঠাৎই ধাক্কা খেয়েছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। Cognizant, Wipro, Infosys থেকে শুরু করে প্রায় সব বড় Services সেক্টরের কোম্পানিগুলো তাদের কর্মীদের ছেঁটে ফেলছেন। এবার ওপরে যে নতুন সিস্টেমের আবির্ভাবের কথা বললাম, সেটার কথা চিন্তা করুন। গত কয়েক বছরে ওই সিস্টেমের কোনো অস্তিত্ব ছিল না। কারণ এতো বিশাল পরিমান তথ্য রাখার এবং তাকে দ্রুত প্রসেস করবার মতো computing power আমাদের কাছে ছিল না। কিন্তু এখন যখন এসব সম্ভব হচ্ছে, তখন এই বিশাল সংখ্যক IT employee-দের কোম্পানিগুলোর দরকার হচ্ছে না। তারা নতুন সিস্টেমের সাহায্যে আরো সস্তায় নিজেদের কাজগুলো করে ফেলতে পারছেন। মানুষের সাহায্যের দরকার পড়ছে না, যেমন একসময় ফোর্ডের দরকার পড়েনি, তাদের গাড়ি তৈরী জন্য নতুন শ্রমিকের। সুতরাং, এটা বুঝতে হবে যে, এই মুছে-যাওয়া কাজগুলো কিন্তু আদৌ আর ফিরে আসা সম্ভব নয়। বরং আরো আরো বেশি হারে, এই IT-Services সেক্টরে কর্মীসংখ্যা কমতে চলেছে। কম্পিউটার নিজেই নিজেকে খুব দ্রুত গতিতে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। আশা করবো ফোর্ডের দরুন যে করুন দুর্দশা ডেট্রয়েটের হয়েছিল, তা ভারতে হবে না। ডেট্রয়েট যদিও এখন ঘুরে দাঁড়াতে চাইছে, কিন্তু ধুলোয় মিশে যাওয়া সেই ডেট্রয়েটের স্বাদ, ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশে খুবই তিক্তভাবে ধরা দিতে পারে।

তবে আমরা কি অন্ধকার কোনো ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যেতে চলেছি? এতো সম্ভাবনা সত্ত্বেও? সত্যিই, এই মুহূর্তে মেশিন লার্নিং এবং আর্টিফিশিয়াল ইন্টালিজেন্সকে মোকাবিলা করে', নতুন ধরণের কাজ তৈরী করার মতো কোনো সমাধান আমাদের সিস্টেমের কাছে কিন্তু নেই। সারা পৃথিবী জুড়ে সকলেই চাইছেন, নতুন কাজ সৃষ্টি করতে। কারণ নতুন কাজ ছাড়া মানুষ টাকা উপার্জন করতে পারবেন না। ফলে যে সব সামগ্রী উৎপাদন হচ্ছে, সেগুলো কেনবার লোকও পাওয়া যাবে না। এই অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বেরই সম্মুখীন আমরা, আবারো। এই দ্বন্দ্ব নতুন কিছু নয়, ১৯৩০, ১৯৭০, ২০০০, ২০০৮ – বারবারই এই দ্বন্দ্বের জন্যই পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ দুর্দশাগ্রস্থ হয়েছেন। কিন্তু প্রত্যেকবারই জোড়াতালি দিয়ে আমরা বেরিয়ে আসতে পেরেছি, কিন্তু সমস্যাটাকে সমূলে আঘাত করা হয়নি। এবারের সমস্যাটা আরো আলাদা কারণ এর আগে কোনোবারই মানুষের বুদ্ধিমত্তাকে কোনো চ্যালেঞ্জের সামনে পড়তে হয়নি। এই কারণেই এবারের এই সমস্যা এতো প্রলম্বিত, ২০০৮ সাল থেকে আমরা এখনো বেরিয়ে আসতে পারিনি।

আমরা যদি সামগ্রিকভাবে নতুন করে না ভাবতে পারি, যদি সমষ্টির কথা না ভাবতে পারি, তাহলে দুর্গতি আরো বাড়তে বাধ্য। সমষ্টিগতভাবে প্রযুক্তির নিয়ন্ত্রণ আমাদের হাতে রাখতে পারলে, তবেই প্রযুক্তির সুষম বন্টন সম্ভব হবে, নচেৎ নয়। তাই যদি পারেন, এই সার্ভিসেস সেক্টরের কবল থেকে যত দ্রুত সম্ভব বেরোনোর চেষ্টা করুন, নাহলে পরবর্তী পিঙ্ক স্লিপটি আপনার নামে আসতে চলেছে।

ক্ষত-কথা

অতিথি লেখক

নভেম্বর ২, ২০১৭

এই পর্বে লিখছেন শুভঙ্কর দাস। সফটওয়্যার এঞ্জিনিয়ার, বর্তমানে একটি বহুজাতিক সংস্থায় কর্মরত। লেখালিখি করতে এবং ঘুরে বেড়াতে ভালোবাসেন...

মরীচিকার ক্ষত, ক্ষতের মরীচিকা
বিষয়টি বেশ গোলমেলে,
গাছের পাতা খসার সন্ধিক্ষণের অনুভূতি, খানিক-
শুকিয়ে যাওয়া ক্ষত থেকে চর্মরি তোলার মত।

আমি, তুমি ও সক্কলে ক্ষত জমায়,
কুঁড়ে কুঁড়ে খাব ব'লে;
চুঁইয়ে পরা ক্ষত কখনও মহত্,
কখনও সৃষ্টিশীল।

কিছু, নিত্য প্রয়োজনীয়;
দিনের শেষে ক্লান্তির ঘুম,আমি সুখি।
বয়স্করা ভিড় করেন কোঁচকান ভুরুতে,
ফাটা ঠোঁটে, জ্বলে যাওয়া আঙ্গুলের বিস্ময়ে।

হঠাৎ ভাবনার উল্কা বৃষ্টিতে, কেউ কেউ রংমশাল।
ভাল লাগার গন্ধের আকস্মিক ঝাপটা; তুমি বেসামাল,

ভাবছ মরীচিকা, হাসছে ক্ষত,

অসহনীয়!

তবুও যত্নে রাখা ক্ষত আত্মহত্যা করেনা,

ধরা পরলে তুমিও অপরিচিত,

তোমার কোঁচকান ভুরুতে জমা হওয়া আমি

খুঁজি তোমার ফাটা ঠোঁটে, রক্তের ক্ষত।

ফেলুদার সাথে

অতনু

ডিসেম্বর ২২, ২০১৬

সম্ভবতঃ ৯৩ সাল। মা বলল রাজস্থান বেড়াতে যাবে। আমি বায়না ধরলাম আমাকেও নিতে হবে। তখন থ্রি বা ফোর এ পড়ি। অতএব সে বায়না না মেনে উপায় কি! উঠে পড়লাম ট্রেনে। সঙ্গে একটা পাতলা বই – *"জয়বাবা ফেলুনাথ"*। বইটা ট্রেনেই প্রায় শেষ করে ফেলেছিলাম। সেটা আসলে দাদার বই, ভাইফোঁটায় পাওয়া। সেই প্রথম ফেলুদার সঙ্গে মোলাকাত। তারপর দাদার ফেলুদাগুলো সব নিজের হেফাজতে নিয়ে নিলাম। আর প্রত্যেক বছর বইমেলা থেকে আর কিছু কিনি বা না কিনি ফেলুদা একটা কিনবই। আনেকগুলো অবশ্য কিনতে হয়নি। জন্মদিন, ভাইফোঁটা আরো নানা উপলক্ষ্যে ঠিক হাতে এসে গেছে। নাহ! ঢাউস ফেলুদা সমগ্র আমার নেই। ঐ হার্ডকভার পাতলা বইগুলোই আমার পছন্দ। আজও মাঝে মাঝে যখন এক এক টা বই র‍্যাক থেকে নিয়ে খুলি, হলুদ হয়ে যাওয়া পাতা, ন্যাপথলিনের গন্ধ আর উপহারের পৃষ্ঠায় লেখার সঙ্গে পাক দিয়ে ওঠে সেই উপুর হয়ে শুয়ে ফেলুদা পড়ার দুপুরগুলো, যখন চাকরির দায়িত্ব নেই, সংসারের সমস্যা নেই্ এমনকি পড়াশোনার চাপটাও উধাও হয়ে যায় ফেলুদার আঙুলের তুড়িতে।

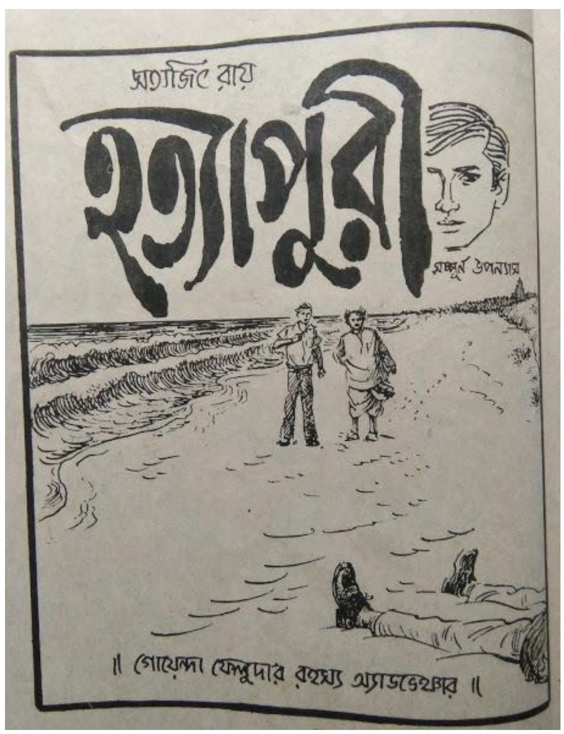

হবে নাই বা কেন! ফেলুদা-ই তো আমার শৈশবের হিরো, কৈশোরের বন্ধু, যৌবনের আইডল। হ্যাঁ কোন রাষ্ট্রনেতা বা অভিনেতা নয়, মনের মণিকোঠায় নায়ক বা আদর্শ যদি কেউ থেকে থাকে সে ছিল ঐ ফেলুদা। আর কে আছে যে স্রেফ মগজাস্ত্রের জোরে দুঁদে বদমাসদের ঘায়েল করতে পারে! ফেলুদার প্রতিভা নিয়ে সন্দেহ নেই, কিন্তু ওর

ভিলেনরাও কি কম প্রতিভাবান! লখনৌএর ইতিহাস গুলে খাওয়া বনবিহারী সরকার, ঘড়ি বিশেষজ্ঞ মহাদেব চৌধুরী, অভিনয় আর ছদ্মবেশ ধারণে তুখোড় বিশ্বনাথ মজুমদার, হিপনোটিজমে ওস্তাদ সুনীল তরফদার, ভ্রমণ কাহিনীর সংগ্রাহক অবিনাশ পাকড়াশি – এমন বিচিত্র সব প্রতিভার প্রতিপক্ষ পেতে যেকোন নায়ককে হেদিয়ে যেতে হবে। এই "ভিলেন"দের অনেকের কাছেই কিন্তু অপরাধের মুখ্য মোটিভেশন হল শখ, অর্থলালসা নয়। বনবিহারীবাবু আওড়ঙ্গজেবের আংটি উদ্ধারের জন্য স্পাই লাগিয়েছিলেন কি সেটা বেচে পয়সা কামাবেন বলে? মহাদেব চৌধুরী যে অষ্টাদশ শতকের পেরিগ্যাল রীপিটারের খোঁজে টমাস গডউইনের কবর খোঁড়াখুঁড়ি করেছিলেন তা কি ঘড়িটা পাচার করার জন্য? শম্ভূচরণ বোসের তিব্বত ভ্রমণের পাণ্ডুলিপি হস্তগত করার জন্য কালকা মেলের কামরায় মিস্টার পাকড়াশির বাক্স বদলের নাটকের পেছনে কি শুধুই ঐ বইটা ছাপিয়ে বড়লোক হওয়ার তাড়না ছিল? বরং শয়তানি বুদ্ধিতে এদের থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকা মগনলাল মেঘরাজ এই জায়গাতেই পিছিয়ে আছে। ঘোষালবাড়ির গণেশ চুরি করা বা কাঠমাণ্ডুতে জাল ওষুধের ব্যবসা কোন জায়গাতেই তাকে এক অশিক্ষিত বড়লোক ছাড়া অন্য কিছু ভাবা যায়না। লালমোহনবাবুর মত নিরীহ মানুষকে হেনস্তা করার মধ্যে দিয়েও তার মোটা দাগের শয়তানি চরিত্রটাই বেরিয়ে আসে।

এহেন বিচিত্র প্রতিভার অধিকারী ভিলেনদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে গেলে ফেলুদাকেও স্রেফ পিস্তল চালানো আর আঙুলের ছাপ বা সিগারেটের টুকরো বিশ্লেষণে কাজ জানলে তো চলবে না! গুরু শার্লক হোমসের মত সে বলতে পারে না, *"A fool takes in all the lumber of every sort that he come across, so that the knowledge which might be useful to him gets crowded out, or at best is jumbled up with a lot of other things ... You say that we go round the sun. If we went round the moon it would not make a pennyworth of difference to me or to my work."* বরং নানা ধরণের বিষয় নিয়ে তাকে পড়াশোনা করতে হয়। সে ক্রিমিনোলজি হোক কি ম্যাজিক, ক্রিকেট হোক কি রামায়ণ-মহাভারত, কোপার্নিকাসের সৌর তত্ত্ব হোক কি ইউরোপের রেঁনেশাস যুগের শিল্পকলা। এমনকি টেলিপ্যাথি, প্ল্যানচেটের মত বিষয়, যেগুলোর সত্যতা নিয়ে সন্দেহ রয়েছে, সে সংক্রান্ত বইও সে পড়ে সমান আগ্রহে। তার নিজের কথায়,

> *"আমি যেটা বিশ্বাস করি সেটা হল এই যে, প্রমাণ ছাড়া কোন জিনিস বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করা বোকামো। মনটা খোলা না রাখলে যে মানুষকে বোকা বনতে হয় তার প্রমাণ ইতিহাসে অজস্র আছে। এককালে লোকে পৃথিবীটা ফ্ল্যাট বলে মনে করত জানিস? আর ভাবত যে একটা জায়গায় গিয়ে পৃথিবীটা ফুরিয়ে গেছে, যার পর আর যাওয়া যায় না। কিন্তু ভূপর্যটক ম্যাগেলান যখন এক জায়গা থেকে রওনা হয়ে ভূপ্রদক্ষিণ করে আবার সেই জায়গাতেই ফিরে এলেন, তখন ফ্ল্যাটওয়ালারা সব মাথা চুলকোতে লাগলেন ..."*।

শুধু বই পড়ে জ্ঞান আহরণ নয়, ফেলুদা চষে বেড়িয়েছে গোটা ভারতবর্ষ। রহস্য সমাধানের তাগিদে ছুটে গেছে কাঠমাণ্ডু, হংকং, লণ্ডন। কিন্তু দিনের শেষে সে একজন মধ্যবিত্ত বাঙালী। গোয়েন্দা হিসেবে পসার জমিয়েও কাকার বাড়িতেই থেকে যায়। রজনী সেন রোডের ফ্ল্যাট ছেড়ে নিজের ফ্ল্যাটে যাওয়ার কথা চিন্তা করলেও কাকার এক ধমকেই ঠাণ্ডা হয়ে যায়। গাড়ি কেনা বা সেক্রেটারি রাখার প্রয়োজন বোধ করে না। বড়দের দেখলেই সিগারেট

পেছনে লুকিয়ে ফেলে। বাঙালীয়ানা ফেলুদার মজ্জায়, লালমোহনবাবু "ভূশণ্ডির মাঠ" এর নদু মল্লিকের চরিত্রে অভিনয় করেছেন শুনে অন্যমনস্ক হয়ে পড়ে। রাজশেখর নিয়োগীর খাওয়া দেখেই ধরে ফেলতে পারে সে বাংলার বাইরে মানুষ! ছাপোষা বইয়ের দোকানি সুধীর ধর থেকে ধনী ব্যবসায়ী দীননাথ লাহিড়ী – সবার সঙ্গেই একইরকমভাবে কথা বলে যামিনী রায়ের আঁকা ছবির সামনে রঙিণ মাছের অ্যাকুয়ারিয়ামের পাশে সোফায় বসে। সে নিজে সংসার করেনি বটে কিন্তু তোপসে আর লালমোহনবাবুর সঙ্গে আসমবয়সী বন্ধুত্বের টান কোন পরিবারের চেয়ে কম নয়। তোপসের মত ভাই আর লালমোহনবাবুর মত বন্ধু যে এজগতে সহজে মেলে না সেটা ফেলুদা ছাড়া কে-ই বা জানে!

তবে বাঙালী মধ্যবিত্তের সব বৈশিষ্ট্যই তার আছে তা নয়। সকালে সে ল্যাদ না খেয়ে যোগব্যায়াম করে, ভাট দিয়ে সময় নষ্ট করে না, পাংচুয়ালিটির পান থেকে চুন খসলে বিরক্ত হয়। মনে প্রাণে বাঙালী বলেই বাঙলার ঐতিহ্যকে যখন বাঙালীরাই ধ্বংস করতে থাকে তখন তার আক্ষেপের শেষ থাকে না। তোপসে কে বলেছিল,

> *"দিল্লী আগ্রার তুলনায় কলকাতা খোকা শহর হলেও এটাকে উড়িয়ে দেওয়া মোটেই ঠিক নয়। এখানে তাজমহল নেই, কুতুব মিনার নেই, যোধপুর-জয়শলমীরের মত কেল্লা নেই, বিশ্বনাথের গলি নেই – এসবই ঠিক। কিন্তু ভেবে দেখ তোপসে – একটা সাহেব মশা মাছি সাপ ব্যাঙ বন-বাদাড়ে ভরা মাঠের এক প্রান্তে গঙ্গার ধারে বসে ভাবল এখানে সে কুঠির পত্তন করবে, আর দেখতে দেখতে বনবাদাড় সাফ হয়ে গিয়ে সেখানে দালান উঠল, রাস্তা হল, রাস্তার ধারে লাইন করে গ্যাসের বাতি বসল, সেই রাস্তায় ঘোড়া ছুটল, পালকি ছুটল, আর একশো বছর যেতে না যেতে গড়ে উঠল এমন একটা শহর যার নাম হয়ে গেল সিটি অফ প্যালেসেজ। এখন সে শহরের কি ছিরি হয়েছে সেটা কথা নয়; আমি বলছি ইতিহাসের কথা। শহরের রাস্তার নাম পালটে এরা সেই ইতিহাসকে মুছে ফেলতে চাইছে ..."*।

শুধুমাত্র পাণ্ডিত্য আর মগজাস্ত্র নয়, নায়কের শিরদাঁড়াটাও গড়পরতা মানুষের চেয়ে শক্ত হবে, তার নৈতিক মূল্যবোধ স্ফটিকের মত স্বচ্ছ হবে এ প্রত্যাশাও অনুচিৎ নয়। ফেলুদাকে দেখেছি মগনলালের দেওয়া টাকার বাণ্ডিল ছুঁড়ে ফেলে জবাব দিতে *"বিনা পরিশ্রমে আমি পারিশ্রমিক নিই না মিস্টার মেঘরাজ!"* দেখেছি অর্থপ্রাপ্তির সম্ভাবনা নেই জেনেও একটা বাচ্ছা ছেলের জীবন বাঁচাতে নিজের খরচায় রাজস্থান ছুটতে। দেখেছি *"খুনির হাত থেকে উপহার নেওয়ার বাসনা নেই"* বলে অপরাধবিজ্ঞানের ওপর লোভনীয় বই ফেরৎ দিয়ে আসতে। "কৈলাসে কেলেঙ্কারি"তে সিধুজ্যাঠা তদন্তের খরচ দেওয়ার প্রস্তাব দিলে ফেলুদা ফুৎকারে উড়িয়ে দিয়ে বলেছিলঃ *"প্রস্তাবটা আপনার কাছ থেকে এসেছে ঠিকই, কিন্তু আমি যদি নিজে এ ব্যাপারে উৎসাহ বোধ না করতাম তাহলে এগোতাম না। ... দেশের মন্দিরের গা থেকে মূর্তি ভেঙে নিয়ে যারা বিদেশীদের বিক্রি করে, তাদের অপরাধের কোন ক্ষমা নেই।"* "গোরস্থানে সাবধান"এ ফেলুদার মক্কেল কে ছিল? অষ্টাদশ শতকে কবরের তলায় চলে যাওয়া টমাস গডউইন? কিসের আশায় পেরিগ্যাল রীপিটারকে বাঁচানোর জন্য ফেলুদা বনের মোষ থুরি গোরস্থানে মশা তাড়াতে গেছিল?

অবশ্য ক্রমশঃ বোঝা গেছে ফেলুদা কোন সুপারম্যান নয়, আমাদের মতই দোষগুণে মেশানো রক্তমাংসের মানুষ। যত ফেলুদার বয়স বাড়তে থাকে তার মগজাস্ত্রের ধার কমতে শুরু করে। ছিঁচকে অপরাধীদের বিরুদ্ধে মামুলি তদন্ত করে সাফল্য পায় বটে কিন্তু বনবিহারী সরকার বা মহাদেব চৌধুরীর মত প্রতিভাবান প্রতিদ্বন্দীদের আর দেখা মেলে না। *"জয়বাবা ফেলুনাথ"* বা *"যত কাণ্ড কাঠমাণ্ডুতে"* যে মগনলালকে ফাঁদে ফেলে নাস্তানাবুদ করেছিল ফেলুদা সেই মগনলালের ডেরা থেকে গোলাপি মুক্তো উদ্ধার করতে গিয়ে তাকে রাইভ্যাল গ্যাঙের আন্টিস্যোশালদের সাহায্য নিতে হয়। যে ফেলুদা *"গোঁসাইপুর সরগরম"*এ আত্মারামের আত্মা নামানোর জোচ্চুরি ফাঁস করে দিয়েছিল, সেই ফেলুদা *"ভূস্বর্গ ভয়ংকর"*এ ডাঃ মজুমদারের প্ল্যানচেটের বুজরুকি নিয়ে কিছুই বলে না। এমন কি নিজের ওপর দুবার হামলা কে চালিয়েছিল তাকেও ধরতে পারে না। তাই *"নয়ন রহস্য"*তে দেখি ফেলুদার গল্পের পাঠকরা দলে দলে চিঠি লিখে অভিযোগ করছে, *"ফেলু মিত্তিরের মামলা আর তেমন জমাটি হচ্ছে না, জটায়ু আর তেমন হাসাতে পারছেন না, তপেশের বিবরণ বিবর্ণ হয়ে আসছে..."।* আর এই চিঠির ধাক্কাতেই ফেলুদা ঠিক সাধারণ লোকের মতই লালমোহনবাবুর ভাষায় হতোদ্যম, বিষণ্ণ, বিমর্ষ, নিস্তেজ, নিস্প্রভ এমনকি মেদামারা হয়ে পড়ে। সবচেয়ে বেদনাদায়ক যেটা সেটা হল অফিসের বড়বাবুর মতই ফেলুদা এর দায়টা নিজের ঘাড় থেকে সরিয়ে ফেলতে চেয়ে বলে, তোপসে প্রকাশকদের চাপে বিভ্রান্ত হয়ে পড়াতেই না কি এই কাণ্ড!

ফেলুদার আর যে জিনিসটা খারাপ লাগে তা হল মেয়েদের সে একেবারে কাছে ঘেঁষতে দেয় না। তার বেশিরভাগ মক্কেল হয় বিপত্নীক, নয় অকৃতদার। স্রষ্টা যুক্তি দেবেন, ফেলুদার গল্পগুলো ছোটদের জন্য লেখা। এখানে প্রেম বা যৌনতাকে ঠাঁই দেওয়া যায় না। কিন্তু প্রেম বা যৌনতা ছাড়া কি নারীচরিত্র থাকতে পারে না? ফেলুদা মনকে খোলা রাখতে বলেছিল, কিন্তু তার স্রষ্টা কি মেয়েদের সম্পর্কে সমাজের টিপিকাল মানসিকতার ফাঁদেই পড়লেন না?

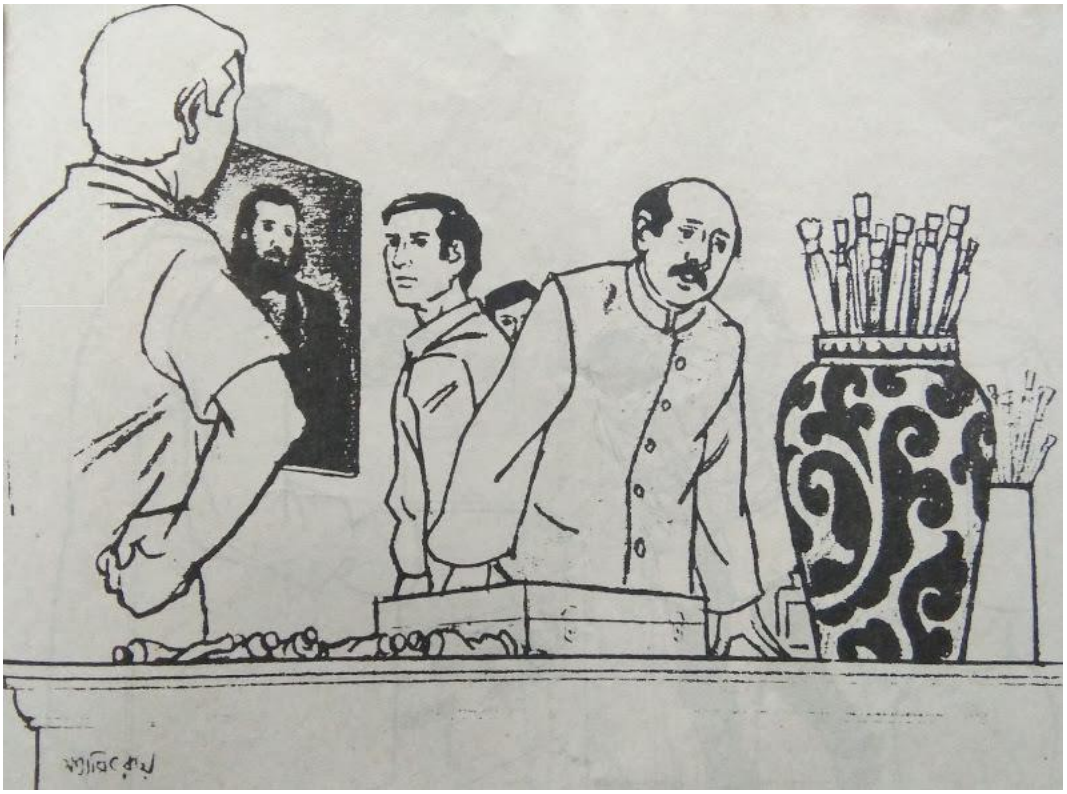

অবশ্য এইসবে ফেলুদার নায়কত্বে কালি পড়েনি। অনুসরণ তো মানুষকেই করা যায়, শয়তান বা ভগবান কে তো নয়! ফেলুদার সঙ্গে প্রথম মোলাকাৎ হয়েছিল *"সোনার কেল্লা"*র দেশে বেড়াতে গিয়ে। আর ফেলুদার সঙ্গে বেড়ানোর সম্পর্ক আলাদা করে বলার কিছু নেই। তোপসে শুনলে বলত টেলিপ্যাথি! যদিও তোপসেকে ও একবার বলেছিল, *"দেখিস ফেলুদার গল্প যেন ট্যুরিস্ট গাইডবুক না হয়ে যায়!"* তবু বেড়াতে যাওয়ার আগে সেখানকার পটভূমিতে ফেলুদার কোন গল্প থাকলে চোখ বুলিয়ে নিতে ভুলি না। ফেলুদা কে দেখেছি কোথাও যাওয়ার আগে সিধুজ্যাঠার কাছ থেকে সেই জায়গা সম্পর্কিত বইপত্র এনে পড়াশোনা করে নেয়। আমার কোন সিধুজ্যাঠা নেই, তবে গুগলজ্যাঠা আছে। তাই তার সাহায্যেই বেড়ানোর জায়গাটার ইতিহাস ভূগোল সম্পর্কে ঘাঁটাঘাঁটি করে নিই। *"বোম্বাইয়ের বোম্বেটে"* তে তোপসে বলেছিল, *"পায়ে হেঁটে ঘুরে না দেখলে নতুন শহর দেখা হয়না এটা আমরা তিনজনেই বিশ্বাস করি।"* সেই মুম্বাইতে হেঁটে বেড়াতে গিয়ে কি বিপত্তিতে পড়েছিলাম তা আগে একবার বলেছি। ফিরে আসি সেই রাজস্থান ভ্রমণের কথায়। আমরা যখন ফিরছি সেদিন কলকাতা থেকে পূর্ণগ্রাস সূর্যগ্রহণ দেখা গিয়েছিল। আমরা অবশ্য দেখেছিলাম ট্রেনের জানলা দিয়ে। সোনার কেল্লাতেই ফেলুদা বলছিল না, *"সৌরজগতের গ্রহগুলোই আবার সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে এলিপটিক কার্ভে!"* এভাবে প্রদক্ষিণ করতে করতে যখন সূর্য আর পৃথিবীর ঠিক মাঝখানে চাঁদ একই সরলরেখায় চলে আসে তখনই তো সূর্যগ্রহণ হয়। ... *" এখানেও জিওমেট্রি ... সমস্ত জীবনটাই জিওমেট্রি!"*

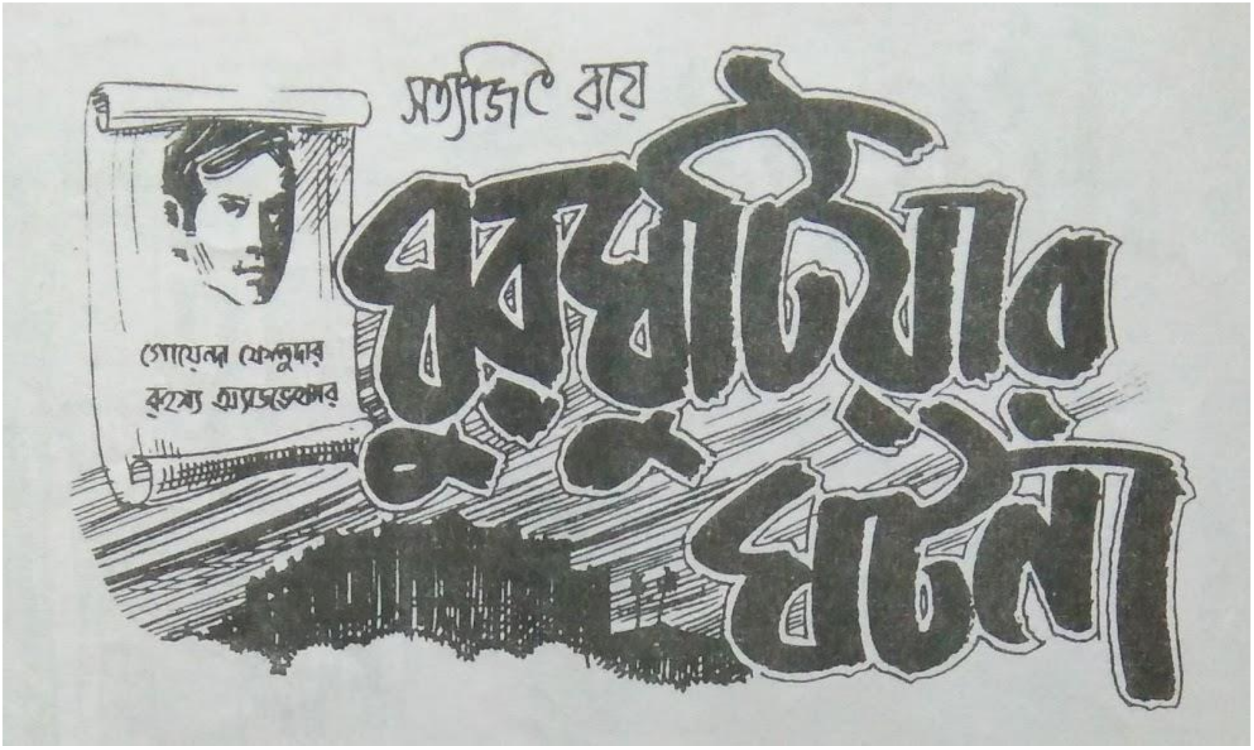

ছবি সৌজন্যেঃ "ফেলুদা ইলাস্ট্রেশন অ্যালবাম", সন্দেশ, অগ্রহায়ণ ১৪০২ – অগ্রহায়ণ ১৪০৩।

চারদিকে গোল উঠেছে শুনছি, ফেলুদার নাকি ৫০ বছর পূর্ণ হল। কথাটায় একটু ভুল আছে। ফেলুদার প্রথম অ্যাডভেঞ্চার "ফেলুদার গোয়েন্দাগিরি" ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছিল সন্দেশে, ১৩৭২ সালের অগ্রহায়ণ, পৌষ ও মাঘ সংখ্যায়। অর্থাৎ ১৯৬৫ সালের ডিসেম্বর এবং ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি আর ফেব্রুয়ারি সংখ্যায়। সেই হিসেবে এবছর ফেলুদা ৫১ পূর্ণ করে ৫২য় পা দিল। কিন্তু তাতে কী? "যাহা বাহান্ন তাহাই যদি তিপ্পান্ন হয়" তবে "যাহা একান্ন তাহা পঞ্চাশ হবে না কেন?"

রসগোল্লা

সুব্রত চৌধুরী

সেপ্টেম্বর ২১, ২০১৭

বাবা মার কথা না শুনে একটা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলে তপা সারাজীবন পস্তাচ্ছে। ছোটবেলা থেকে বাপমায়ের বাধ্য থাকার পর মাধ্যামিক এর বাধ্য মেয়ে বিগড়ে গেলো বারো ক্লাসে গিয়ে। কাঠ বাঙাল বামুনের মেয়ে কিনা প্রেমে পড়লো রাজার, যে একে ঘটি তায় কায়েতসন্তান। সে প্রেমের পরিনতি কয়েকবছর পরে বাড়ি থেকে পালিয়ে বিয়েতে। তারপরই তপা প্রতিদিন অনুভব করতে থাকলো কি ভুলই না করেছে।

কায়েত শাশুড়ি তো বামুনের মেয়ের প্রণাম নিয়ে নতুন করে কোনও পাপ করতে রাজি ছিলেন না। আগে কি ছিলেন ওনারা তপা জানে না, কিন্তু বাঙাল বউ ঘরে আসার পর শ্বশুর বাড়ির সবাই তাদের চরম বাঙাল বিদ্বেষ দেখাতে থাকল। ওদের মতে, নদিয়া পেরলেই পৃথিবীর সীমানা, ওপারে ভিনগ্রহের জীবের বাস। বাঙালরা নাকি কি এক অদ্ভুত ভাষায় কথা বলে, যা মনুষ্যজাতির বোধগম্য নয়।ওনারা ইলিশ মাছ খান না, ওই কাঁটাময় জিনিষ নাকি ভদ্রলোকে খায় না। ওনারা চিংড়ির ভক্ত। পরে আত্মীয়দের কাছে জেনেছিল শাশুড়ি মা নাকি চরম ইলিশ ভক্ত ছিলেন, বাঙাল বউ আসার পর নিজেকে বদলেছেন। চিংড়ির মালাইকারির ভক্ত তপাও চিংড়ি বর্জন করল।

অবস্থা চরমে উঠত মোহনবাগান ইস্টবেঙ্গল খেলার দিনে। শ্বশুরবাড়ির কল্যাণে তপা জানলো যে ইংরেজদেরকে দেশ থেকে তাড়িয়েছিল মোহনবাগান ক্লাব। ওনারাও জানলেন যে মোহনবাগানের কাজ হল ইস্টবেঙ্গলের কাছে পাঁচ গোল খাওয়া। এভাবেই কাটছিল দিন। তপা রাজার একমাত্র ছেলে যে নিজেকে কখনো বাঘ কখনো বাটি বলত, সে বড় হতে থাকল। ছেলেকে ঘিরে দুজনেরই খুব আশা। তপা ঠিক করে রেখেছিলো ছেলের জন্য বাঙাল বৌ আনবেই। সে আশায় ছাই দিলো আমেরিকাবাসি পুত্র। ঘোষণা করলো সে বিয়ে করতে চায় এক পাঞ্জাবিতনয়াকে। রাজা তপা দুজনেরই ছেলেকে বোঝানোর চেষ্টায় কোনও খামতি দিল না। কিন্তু ভবী ভুলল না। তপা- রাজা দুজনেই গজগজ করতে থাকলো, আজকালকার ছেলেমেয়েরা বাপমায়ের কথা শোনে না। তবে তপা এই ভেবে শান্তি পেল যে পাঞ্জাবিরাও তো এক অর্থে বাঙাল, ওরা পাকিস্তান থেকে বেড়া টপকে এসেছে। কাজেই বউমা তার দলেই হবে। পাঞ্জাবি বাঙাল আর আসল বাঙাল এক হয়ে এই ঘটি সাম্রাজ্যের পতন ঘটাবে। ইলিশ মাছ এবার এই বাড়ীতে ঢুকবেই।

ছেলের বিয়ে দিতে পৌঁছল ওরা মোহালিতে। নিজেরা কি মতে বিয়ে করেছিল, তা নিজেরাই জানে না। কিন্তু ছেলের বিয়েতে বাঙালীয়ানা দেখাতেই হবে, তাই তপা অনেক ভেবেচিন্তে শাঁখা আর লজ্জাবস্ত্র এনেছিল। বিয়ের আগের দিন বেয়াইয়ের গলা জড়িয়ে তপা খুব নাচ নাচলো। পাঞ্জাবি আর রাবিন্দ্রীক ঘরানার মিশ্রনে এক অদ্ভুত নৃত্যশৈলি তৈরী হল। রাজাও কম গেল না। মদের সবকটা ব্র্যান্ড পেটে যাওয়ার পর জিতেন্দ্র আর বচ্চন দুজনে একজোটে তার পায়ে ভর করল।

বিয়ের দিন সকালে ব্যাগ খুলে দেখা গেল শাঁখা হয়েছে তিন টুকরো, রাজা গজগজ করতে থাকলো এই বাঙালরা নিজের দেশটাকেই ভেঙেছে, শাঁখা কি করে গোটা থাকে! এরপর চিন্তা এই পাঞ্জাবে শাঁখা পাওয়া যাবে কোথায়। মেয়ের বাড়ীর কাছ থেকে গাড়ী নিয়ে বেরোল রাজা। সংগে তার মাসতুতো ভাই। রাস্তায় এক শাঁখাশাড়ী পরিহিতাকে দেখে মাসতুতো ভাইয়ের জিজ্ঞাসা, দিদি শাঁখার দোকান কোথায় পাব। মহিলা প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও বললেন, আমি তো কলকাতা থেকে কিনে আনি। এখানে পাবেন না। তবে কালীবাড়ী গিয়ে খোঁজ নিন। কালাবাড়ীর সন্ধানও তিনিই দিলেন। কালীবাড়ীর পুরোহিতকে সমস্যার কথা বলতে তিনি বললেন, এখানে পাবেন না। তবে লোকে পুজো দিতে এসে শাঁখাও দিয়ে যায়, তাই না হয় আপনাদের দিচ্ছি। বিয়ের আগে মঙ্গলঘটএ ডাবের অভাবে চণ্ডীগড় গোল্ডেন আপেল দেওয়া হল।

লজ্জাবস্ত্রও আনা হয়েছিল, কিন্তু সেটা দিয়ে যে কি করা হয় তা দুজনেই জানতো না। আবার সেই মাসতুতো ভাই সহায়, কোনো বউদিকে ফোন করে জেনে নিল কখন কি করতে হয়। যাই হোক লজ্জাবস্ত্র আর শাঁখার বাঙালীয়ানা বাদ দিলে বিয়েতে সবই হল পাঞ্জাবিমতে। কনের সাজ দেখে তো নতুন শ্বশুড় শাশুড়ীর চক্ষু চড়কগাছ, কয়েককিলো ওজনের লেহংগা চোলি পরিহিতাকে বধু মানতে কিছুটা বাধছিলো। রাজা তাকে বলল, মা আমাদের ওখানে গিয়ে শাড়ী পরতে হবে। জলদি জবাব, হ্যাঁ বাবা, আমার জন্য দেবদাস শাড়ী রাখবেন, আমার খুব শখ। দেবদাসকে মদ্যপ জমিদারপুত্র হিসেবেই জানত রাজা, সে যে শাড়ীর ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসাডার হল কবে কবে থেকে তা তার বোধের বাইরে। তখন হবু বৌমা বোঝালো, কাহানি সিনেমায় বিদ্যা বালান যে শাড়ীতে অসুরনিধন করেছিল, ওই শাড়ী চাই।

তপা ভয়েভয়ে পাত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, মা মাছ খাও তো। সপ্রতিভ উত্তর, হ্যাঁ, শিঙারা মছলি তার খুব প্রিয়। শিঙারা চায়ের সাথে খায়, তাই জানতো তপা, সেটা মছলির পর্যায়ে এলো কি করে তা বোধগম্য হচ্ছিল না তার। কিন্তু মাছ খায় শুনে বুকে বল এল; বলল, তোমাকে আমি মাছের রাজা ইলিশ খাওয়াব। ভুলে যাবে অন্য সব মাছ। ইলিশ আমাদের জাতীয় মাছ।

হবু বউমা বলে উঠল, জাতীয় পশু জানি, জাতীয় ফুল জানি, জাতীয় মাছের কথা তো শুনি নি।

- শুনবে কি করে মা, সব ওই ঘটিদের চক্রান্ত। হতবম্ভ হয়ে শাশুড়ীর দিকে তাকাল বৌমা।

ছেলে বৌ নিয়ে বাড়ী ফিরল তপা-রাজা। বিয়ের ভোজ চুকলো, লোকজন বিদায় হল। ক'দিন পর ছেলে তার বৌ নিয়ে আমেরিকা ফেরত যাবে। সকালবেলায় রাজা বাজার থেকে নিয়ে এল পেল্লায় মাপের গলদা চিংড়ি। এদিকে তপার পেয়ারের মাছওলাও দিয়ে গেছে পদ্মার ইলিশ। চিংড়ি দেখেই বৌমা আঁতকে উঠলো, ও তো জলের পোকা। আমি খাব না। তপা যারপরনাই খুশী। এই তো সাচ্চা বাঙাল, হোক না পাঞ্জাবের।

গোটা ইলিশ দেখে বৌমার তীব্র আপত্তি, ওই রকম চোখওয়ালা মাছ ও খাবে না। তপা প্রাইমারীর বাচ্চাদের মত করে তাকে বোঝাল যে শিঙাড়া মাছেরও চোখ থাকে। কেটে বাদ দিলেই হল। নতুন শাশুড়ীর কথা ফেলতে পারল না সে, খেতে রাজী হল।

দুপুরে খেতে বসে নতুন বৌয়ের চক্ষু চড়কগাছ। ভাতের থালায় সাজানো ইলিশের চারপদ। শুধু বলল, ইতনা মচ্ছি? শাশুড়ীর নির্দেশে একটা ভাজা ইলিশে দিল কামড়। তারপরই বিদ্যা বালানের মত শাড়ী পরিহিতা বৌমা শেফালি জরিওলার স্টাইলে নেচে উঠলো, কাঁটা লাগা।

রাজা চেঁচিয়ে উঠলো, বলেছিলাম উল্টোপাল্টা জিনিষ না খাওয়াতে। তাড়াতাড়ি শুকনো ভাত আর জল খাইয়ে কাঁটামুক্তি তো হল, কিন্তু পাঞ্জাবি বৌমা আর ভাতের থালার দিকে এগোলো না। শাশুড়ীর হাজার আশ্বাসেও তার ভয়মুক্তি হল না।

টেবিলে রাখা ছিল গোটাপাঁচেক রসগোল্লা। ক্ষুধার্ত বৌমা সেগুলোকে আক্রমন করলো। শ্বশুড়শাশুড়ীর লুব্ধ ক্ষুব্ধ দৃষ্টির সামনে সেগুলো শেষ করে বিনা শব্দে ঘোষনা করল, ইলিশ কি চিংড়ি নয় বাঙালীর প্রতীক রসগোল্লা। বাঙালীয়ানা বলতে সারাদেশে ওটাই বোঝে।

হালখাতা

হযবরল

এপ্রিল ১৬, ২০১৭

আমাদের দেশ বিবিধ বৈচিত্রের আঁতুরঘর। প্রকৃতি যেন স্রষ্টার কাছ থেকে 'যত চাও তত' স্কিমে রসদ ও সময় পেয়ে নিরন্তর গবেষণা করে চলেছে এই দেশের মানুষ নামক জন্তুটাকে নিয়ে। আমাদের দেশের নানা প্রান্তে নতুন মানুষ দেখলে পরেই প্রথমেই তার পরিচয় নিয়ে নানা রকম প্রশ্ন করা হয়ে থাকে। মানে ব্যাপারটা বোঝা যে 'দেখি তুই কত বিচিত্র?' এই যেরকম উত্তর ভারতে পোশাক চেহারা দেখে ধর্ম না বুঝতে পারলে ধর্ম নিয়ে প্রশ্ন করা হয়।আবার ধর্ম যদি হিন্দু হয় তাহলে জাত গোত্র জানতে চাওয়া হয়। মুসলমান হলে জানতে চাওয়া হয় সে শিয়া না সুন্নি, আহমাদি না বোরা ? ওদিকে দক্ষিণ ভারতে আবার প্রথমেই ভাষা যাচাই করা হয়, দাক্ষিণাত্যের চারটে মূল ভাষার সাথে আপনার ভাষা কমন না পড়লেই আপনি নর্থ ইন্ডিয়ান। ব্যাস আপনার প্রাথমিক পরিচয় চিরজীবনের জন্য এস্টাব্লিশড হয়ে গেলো। আমরা বাঙালি আবার সংকীর্ণ ভাবে ধর্ম, ভাষা, জাত নিয়ে মাথা ঘামাই না কেননা সেই বিশ্বামিত্রের আমল থেকেই বৃহৎ আকারে কে খোট্টা, কে পাইয়া , কে মেরো, কে উড়ে সব ঠিক করে রেখে দিয়েছি। তবে অন্য এক নতুন মাতৃভাষীকে দেখলে হয়তো একটা চিরাচরিত কৌতূহল জাগে – এই শর্মা কি পূর্ব নাকি পশ্চিম বঙ্গীয়? চলতি কথায় মালটা ঘটি না বাঙাল? সেটা আবার সোজাসুজি প্রশ্ন করে জানাটা যদি একান্তই দৃষ্টিকটু লাগে তো তা জেনে নেবার আরো অনেক সফিস্টিকেটেড উপায়ও আছে। এই যেরকম সুযোগ বুঝে আলটপকা জিজ্ঞেস করা," কি দাদা এবার ডার্বিতে কি হবে? কি মনে হচ্ছে হুম?" কিংবা "মাংসটা ঝোল ঝোল রাখবো নাকি একটু মাখা মাখা?" আমি যদিও বরাবর এই সূক্ষ্ম ভেদাভেদ সম্বন্ধে একটু গোদাভাবে আকাট গোছের ছিলাম তাই ছোটবেলায় বাঙাল আইডেন্টিটি সম্বন্ধে ভাবতে গেলে দাদু দিদার মুখ মনে পড়ার আগে ভানু বন্দোপাধ্যায়ের চেহারা চোপার কথাই মনে পড়তো বেশি। আমার বাবার দিকে বলতে গেলে প্রায় এদেশীয় তাই মাতুলাক্রমের প্রভাবে আমিও হলাম গিয়ে হাফ বাঙাল যাদেরকে বেশিরভাগ সময় বাটি বলা হয়ে থাকে।

তা আমার আইডেন্টিটির নামকরণ বাটি না হয়ে হাফ বাঙাল হওয়ার পেছনে প্রফুল্ল সাহা নামক এক একাত্তরের পরে দেশ ছাড়া উদ্বাস্তু প্রৌঢ়ের পরোক্ষ অবদান রয়েছে। ভানু বন্দোপাধ্যায় যদি বাঙাল হন তাহইলে প্রফুল্ল সাহা হইলো গিয়া এক্কেরে কাইঠ বাঙাল। মুখ দেখে কোনো সন্দেহ জাগলেও সেটা খুললে পরেই তার কোনো অবকাশ থাকতোনা। তার ফোকলা দাঁতের মাঝ থেকে বিচ্ছুরিত শব্দপুঞ্জগুলো তার আইডেন্টিটিকে আরো পোক্ত করে তুলতো আর কি!! প্রফুল্ল সাহা ওপারে কি ছিল জানিনা তবে এপারে আসার পর এ দেশের ভাষায় তার আইডেন্টিটি হয়ে গেলো 'রিফিউজি'। সে ও তার পরিবার কিছুদিন খালপাড়ের জবরদখল কলোনীতে বাকি সবার সাথে একত্রে অনেক কষ্টে সৃষ্টে প্রথম ক'মাস কাটায়। তারপর কামকাজ না জোটাতে পেরে বৌয়ের সঞ্চিত কিছু সোনাদানা বিক্রি করে আমাদের পাড়ায় কাঠা দুয়েক জমি কিনে একটা দু-কামরার দরমার বাড়ি তোলে। ও ক্রমশ সামনে উঠোনে একটা চৌকি পেতে তাতে নানারকম বাক্স কৌটো সাজিয়ে সে তার রকমারি ভান্ডারের ব্যবসা শুরু করে। সাধারণ মুদি-দোকান বা

দশকর্মা ভাণ্ডারে যা যা কম চাহিদা বা লো মার্জিন কিংবা স্থানাভাবে জন্য রাখা হতো না সেইসব বস্তু বহাল তবিয়তে সাহাবাবুর দোকানে মজুদ থাকতো। এই যেরকম ইঁদুর মারার কল, হ্যারিকেনের চিমনি, স্টোভের ফিতে, টন সুতো, রিঠার বিচি, ধুঁধুলের ছোবড়া, গুলি লজেন্স ইত্যাদি। সাহাবাবুর বৌ ঘরের ভেটো থেকে প্রায় বেরোতেন না বললেই চলে। সে সারাদিন তাদের অসম মাটির মেঝেতে ঘটঘট করে সেলাই মেশিন চালিয়ে ব্লাউস সায়া ইত্যাদি তৈরী করে দোকানে দোকানে সাপ্লাই দিতো। আর মেয়েটা তো আরেক ট্রাজেডি। ক্লাস এইট অব্দি পড়ে তারপর কেন জানি পাগল হয়ে গেছিলো। সারাদিন ঘরের ভেতরে বসে সায়া ব্লাউসের কাপড়গুলো ছিঁড়তো আর মা বকা দিলে মিনিট পাঁচেক ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে কুঁজো থেকে এক গ্লাস জল উপচিয়ে খেয়ে তারপর খবর কাগজ কাটতে বসে যেত। সাহাবাবু মেয়েকে কোনোদিন কিছু বলতোনা, খুব বায়না করলে লম্বা ফিতের গোছা এগিয়ে দিয়ে বলতো, “মা’র কামের জিনিস হাত দিস না, নে এইগুলান ধইরা মাইপ্যা কাঁচি দিয়া কাইট্যা থো।”

সন্ধেবেলায় এমনিতে তার দোকান ফাঁকাই থাকতো কেননা ইলেকট্রিসিটি না থাকার দরুন অর্ধেক জিনিস সে খুঁজে পেতো না আর পেলেও সেটা তার প্রচ্ছন্ন কুসংস্কারের জন্যে বেচতে চাইতো না। রাত বাড়লে সে একটা কুপি জ্বালিয়ে ট্রান্সিস্টর ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে নানা রকম স্টেশন বিশেষ করে রেডিও বাংলাদেশ ধরতো ও ঘাড় বেকিয়ে, ভ্রু কুঁচকে সেই ফ্রিকোয়েন্সির অস্পষ্ট সম্প্রসারণের সারমর্ম বোঝার চেষ্টা করতো। দিনের বেলায় লোকের আনাগোনা থাকলেও সাহাবাবুর দোকানে ক্রেতার চেয়ে এক বিজাতীয় ভাষায় অন্য এক দেশের নানা কিস্সা-কাহিনী শুনতে আসা শ্রোতার ভিড় থাকতো বেশি। ধার বাকিতে জিনিস নেবার ফিকিরে অনেকেই তার ‘দ্যাশে এই ছ্যালো, সেই ছ্যালো....’ ধৈর্য্য ধরে মাথা নেড়ে নেড়ে শুনতো। আর তার ব্যক্তিগত ফেভারিট হিসেবে ওপারের থেকে কি ভাবে সে প্রাণ বাঁচিয়ে বৌ মেয়েকে নিয়ে পালিয়ে এলো সেই আবেগমথিত বিস্তারিত বিবরণ সে সময় অসময় প্রচুর লোককে শুনিয়েছেন। আশ্চর্যভাবে সেই কাহিনীর এতো গুলো ভার্শন ছিল যে কোনটা অরিজিনাল আর কোনটা পাইরেটেড তা ঠাওর করা মুশকিল। কোনোবার সে জলপথে এদেশে আসেন তো কোনোবার বার অমাবস্যার রাতে কাঁটাতার পেরিয়ে।আবার হাতে সময় থাকলে হয়তো ভারতে তার এন্ট্রি হতো আসাম কিংবা ত্রিপুরা দিয়ে। কোনোবার সামনে পড়ে যেত রাজাকার বাহিনী তো কখনও খানসেনা। তবে গল্পের শেষে তার ছেলেকে না বাঁচাতে পারা ও মেয়েকে কোলে নিয়ে বিশ মাইল পথ হাঁটার ঘটনা গুলো কিন্তু আদ্যোপান্ত সত্যি ছিল। তাই শুরু ও মধ্যভাগে যতই অমিল থাকুক না কেন শেষভাগ শুনে অনেকেরই চোখে জল চলে আসতো। গল্পের মাঝে যখন সাহাবাবু স্ট্রাগল পর্যায় চলছে তখন হুট্ করে পাড়ার কোনো ডেপো ছোঁড়া আবার সাহাবাবুকে যদি ইয়ার্কি মেরে বলে বসত যে, “কাকা, অত ঝামেলা না করে তুমি বর্মা পালিয়ে গিয়ে ওখান থেকে সোজা প্লেনে করে এখানে উড়ে আসলেই তো পারতে!!” তখন বুড়ো খেপে গিয়ে, “দ্যাখো নাই তো সেই দিন!! অন্যের দুঃখ নিয়ে মস্করা করো না? ফাজিল কথাকার, যাও নিজের কামে লাগো গিয়া...” বলে সব্বাইকে দোকান থেকে তাড়িয়ে দিতো।

ফিরি সেই আমার হাফ বাঙাল নামের পেছনে প্রফুল্ল সাহার পরোক্ষ অবদানের গল্পে। ছোটবেলায় নববর্ষে এমনিতে বাবার ছুটি থাকতোনা। তাই বিকেল বিকেল আমাকে চেনা পরিচিত দোকানে পাঠানো হতো নতুন ক্যালেন্ডার ও মিষ্টির প্যাকেট কালেক্ট করে নিয়ে আসতে। পাড়ার ছোট বড় সব দোকানই ধুয়ে-মুছে ঝাড়পোছ করা হতো। কৌটোকাটি পাল্টে বাইরে দু একটা হাই পাওয়ারের লাইটও লাগানো হতো। মোটের ওপর গরমের শুরুতে গোটা

ব্যাপারটা একটু উৎসব উৎসব ঠেকতো। মুদির দোকান, মিষ্টির দোকান, সোনার দোকান ছিল আমাদের প্রাইমারি টার্গেট। প্যাকেট পেলেই তা খুলে নিজের প্রিয় আইটেমটা উদরস্থ করে বাড়িতে বাকিটা জমা দেওয়াই ছিল আমাদের অলিখিত রেওয়াজ। প্রথমবার শিখেছিলাম যে পুরোনো বছরের সব হিসাব-কিতাব খতম করে নতুন হিসাবের খাতা খোলা হয় এই দিন। লাল মলাটে মোড়া স্বস্তিকা চিহ্ন অংকিত নতুন খাতাকে হিসেবের নতুন দলিল হিসেবে চালু করাটাকেই বলে হালখাতা। জানলাম নতুন কিছু ব্যবসা শুরু করার থাকলে এই দিনটাকেই শুভ সময় হিসেবে বেছে নেওয়া হয়। নতুন দোকান মানে আবার মিষ্টির বাক্স নয়!! সেখানে মালিক পায়জামা পাঞ্জাবি ও মালকিন ঝকমকে শাড়ী পরে করজোড়ে হাসিমুখে সব্বাইকে রীতিমতো কাটলেট, কেক, প্যাস্ট্রি ও কফি-কোল্ড ডিংক্স খেতে আমন্ত্রণ জানায়। আবার অনেক দোকান বিশেষ করে স্যাঁকড়ার দোকানের মোটা হিসেবে মেটাতে আরো ক'দিন সময় লাগে বলে তাদের হালখাতা সেদিন নাও হতে পারে। তাই যারা বছরের প্রথম দিনটা হিসেব মিটিয়ে উঠতে পারেননা অথবা নতুন কিছু শুরু করা হয়ে ওঠেনা তাদের জন্য অক্ষয় তৃতীয়া হিসেবে পরে আরো একটা অপসন রয়ে যায়। তা আমার শৈশবের কোনো এক নববর্ষ কালক্রমে রবিবারে পড়েছিল। স্কুল ছিল না তাই বিকেলে ঘুমোচ্ছিলাম। রবিবার মানে বাবারও ছুটি তাই আমার বদলে বাবা চেনা দোকান গুলোতে গিয়ে ওই বছরের আমার কোটার কালেকশন গুলো প্রক্সি হিসেবে তুলে ফেললো। ঘুম ভাঙতেই বুঝলাম সালের প্রথম দিনেই সালানা সব্বোনাশ হয়ে গেছে।পাড়ার অন্যান্য বন্ধুরা যখন লাড্ডু অমৃতি চেটে চুষে খাচ্ছে আমার ভাঁড়ার তখন ফক্কা। মা সবকটা প্যাকেট মিটসেফে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দিয়েছে!! পড়ি কি মরি হয়ে ছুটলাম যদি কোনো নতুন দোকান খোলে, তাহলে অন্তত কেক কোল্ড্রিংকস জুটলেও জুটতে পারে। নাঃ একটা শাড়ীর দোকান খুলেছে বটে তবে তাদের খাওয়ানোর পালা প্রায় শেষ। শুধু এঁটো প্লেট আর ফাঁকা কাঁচের বোতল পড়ে আছে এক পাশে।

নিজের ক্যালাসপনাকে দুষতে দুষতে যখন পাগলা দাশুর মতো নিজের মনে বিড়বিড় করতে করতে বাড়ি ফিরছি হটাৎ দেখি প্রফুল্ল সাহার দোকানের সামনে মোড়ায় দুজন বসে আছে। সামনের দিকে বাঁশের খুঁটিতে একটা ঝকঝকে নতুন হ্যাজাক লণ্ঠন টাঙানো ও কৌটোকাটি গুলো একটু ভদ্র সভ্য লাগছে। থমকে দাঁড়াতেই প্রফুল্ল সাহা হাতছানি দিয়ে ডাকলো , “আসো আসো, এদিকে আসো।” কাছে গেলাম ও যেতেই দেখলাম কৌটো গুলো পুরোনোই তবে সবকটার ঢাকনা সাহাবাবু পাল্টে নতুন করে দিয়েছে। আমাকে এটা সেটা জিজ্ঞেস করার পর বললো, “তাহইলে হইলো গিয়া তোমার বাপের দিক দিয়া তুমি এদেশীয় ও মায়ের সাইড দিয়া আবার ফুল বাঙাল। মানে এক কথায় ব্যাপারটা খাড়াইলো গিয়া যে তুমি হাফ বাঙাল!!” আসে পাশের দুই জন হা হা করে হেসে উঠলো। একটা ঠোঙায় দুটো কদমা ও কয়েকটা বাতাসা ও ফিনফিনে কাগজের দু ফুট বাই এক ফিটের একটা বাংলা ক্যালেন্ডার হাতে ধরিয়ে সে বললো, “অর্থাভাবে বেশি কিসু করা হয় নাই তাই সামান্য কিসু লইয়া আয়োজন করসি আরকি, ঘরে গিয়া মার হাতে দিবা আর কইবা ব্লাউস সায়া বানাইতে হইলে যেন আমার সাথে যোগাযোগ করে, যাও।” ক্যালেন্ডারটা খুলে দেখলাম নিচে লেখা ইস্ট বেঙ্গল ভ্যারাইটি স্টোর্স ও তারও নিচে আরো খুদে হরফে লেখা হরেক প্রকার রকমারি দ্রব্য বিক্রেতা আর শেষ লাইনে সবথেকে বড় হরফে লেখা আছে প্রঃ শ্রী প্রফুল্ল চন্দ্র সাহা। এই রাস্তা দিয়ে রোজ স্কুল যাই আসি কিন্ত আজকেই প্রথম খেয়াল করলাম যে সাহাবাবুর দোকানের মাথায় যে টিনের সাইনবোর্ডটা ত্যারছা ভাবে লটকে আছে তাতেও হলুদের ওপর কালো অক্ষরে ওই একই জিনিস লেখা।

বিশেষ ধন্যবাদ

শর্মিলা ব্যানার্জি

কাজী ফয়জল নাসের

ধন্যবাদ

অতনু

হস্তিমূর্খ

যদুবাবু

প্রচ্ছদ

শাক্যমুনি

(ফটো :সুচিন্ত্য মল্লিক, আলপনা: বিধান বিশ্বাস)

সম্পাদনা

প্রত্যয়